পরভৃতিকা

সীতা দেবী

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

চতুর্থ সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও,
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পাঁচ টাকা

ভূমিকা

'পরভৃতিকা' উপন্যাসটি লিখিত হয় ১৩৩৪ সালে, প্রথম প্রকাশিত হয় বোধ হয় ১৩৩৭ সালে। ইহা মনে রাখিলে বইটি বুঝিবার সুবিধা হইবে।

- লেখিকা

পরভৃতিকা

১

"ভবানী, ও ভবানী !"

"কি গো ? কেন ডাকছ ?" বলিতে বলিতে ভবানী আহ্বানকারিণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বেলা দশটা হইবে। শীতকালের রোদ খোলা জানালার পথে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। এই মধুর উত্তাপটুকু উপভোগ করিবার জন্যই যেন একটি যুবতী জানালার পাশে ইজি-চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়াছে। তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই, সম্প্রতি কোনো পীড়া হইতে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মুখও শুষ্ক, বেশভূষারও তেমন পারিপাট্য নাই, অথচ ঘরখানির সজ্জা, ও যে-প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় মধ্যে তাহার স্থান, সেটিকে দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই গৃহের অধিবাসীদের আর যাহারই অভাব থাকুক, অর্থের অভাব নাই।

ঘরখানি যুবতীর শয়নকক্ষ। তাহার এক দিকে মেহগনির প্রকাণ্ড জোড়াখাট, অন্য দিকে আয়না-লাগানো একটি বড় আলমারী। দুখানি ইজিচেয়ার দুটি জানালার পাশে, ঘরের মাঝখানে কারুকার্য্যে ভরা একটি জয়পুরী পিতলের টেবিল ও গুটিদুই ছোট চেয়ার। তাহার উপর কোনো এক ব্যক্তির প্রাতরাশের অধিকাংশই এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

ভবানী যুবতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি ভানু, কেন ডাক্‌ছ ?"

যুবতী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "কেন ডাক্‌ছি, তা কি একলাখ বার বলতে হবে ? কোনও 'তার' কি চিঠি-পত্র এল ?"

ভবানী স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু তাহার লম্বা-চওড়া চেহারা, বলিষ্ঠ গঠন ও রুক্ষ মুখ দেখিলে মনে হয় পুরুষকেই কেহ স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ভানুমতীর কথায় তাহার মুখেও একটুখানি বিষাদের ছায়া পড়িয়া ক্ষণকালের মত মুখখানাকে একটু কোমল করিয়া তুলিল। সে বলিল, "কই, এসেছে ব'লে ত শুনিনি। আচ্ছা, তুমি ওঠ, মুখ হাত ধুয়ে, কাপড়-চোপড়গুলো ছাড়। কিচ্ছু ত খাওনি দেখছি, যেমন যা রেখে গিয়েছি, তেমনিই প'ড়ে আছে। ওমা, দুধটা সুদ্ধ খাওনি? গরম ক'রে এনে দেব? নিজের শরীর বোঝ না বাছা, যা খুসি তাই কর! এমন করলে চলে কখনও? নাও, ওঠ, মুখ ধোও, আমি কাপড় নিয়ে আসি। কাত্তিকে ডেকে দিচ্ছি, দুধটা গরম ক'রে আনুক।"

ভানুমতী একেবারে রাগের আতিশয্যে কাঁদিয়াই ফেলিল। অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুই বেরো ঘর থেকে, পোড়ারমুখি! আমি মরছি নিজের জ্বালায় জ'লে, উনি এসেছেন এখন আমায় মুখ ধোয়াতে, দুধ খাওয়াতে! যা তুই।"

ভবানীও একটু রাগিয়া বলিল, "তা ত বটেই, দাসী-বাঁদী মানুষ আমরা, ভাল কথা বল্‌লেও মন্দ হয়। শাশুড়ী কি বড় ননদ থাক্‌লে কেমন কথা শুনতে না তাই দেখ্‌তাম। এই শরীর, এখন অযত্ন করা চলে কখনও? আর এমন ক'রে দিনরাত না খেয়ে না দেয়ে যে কান্নাকাটি করছ, এতে স্বামীর অকল্যাণ হয় না? ওঠ, লক্ষ্মী দিদি আমার, মুখ-হাত ধোও, আমি বাইরে দারোয়ানের কাছে গিয়ে আবার খোঁজ নিয়ে আস্‌ছি।"

ভানুমতী উঠিবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া বলিল, "তুই যা, আগে খোঁজ নিয়ে আয়, তারপর আমি উঠ্‌ব।" তাহার দুই গাল বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

ভবানী অগত্যা বাহির হইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "বলিহারি যাই জামাইয়ের আক্কেলকে! এদিকে ত, এত আদরের ঘটা, বউ যেন মাথার মণি। আর এই যে আট দিন বাড়ীছাড়া হয়েছিস,

মেয়েটাকে একটা খবর দিতে নেই গা? ছি, ছি, ছি! একেবারে শরীর পাত করতে বসেছে সে। বুড়ো বাপ প'ড়ে অসুখে ধুঁকছে, তার কথাও কি একবার ভাবতে নেই?"

"কি ভবানী, জ্ঞানদার কোনও খবর-টবর এলো?" বলিতে বলিতে ইংরেজী পোষাকপরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কই আর এল, ডাক্তার-বাবু? আবার চলেছি দেউড়ীতে, দারোয়ানের কাছে খবর নিতে।"

ডাক্তার নিজের মাথার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "তাই ত, মহা মুস্কিল দেখছি। ছেলেটা বড় নির্ব্বোধের কাজ করছে। প্রমদা-বাবুর এই অবস্থা, তার উপর এমন ক'রে ভাবাচ্ছে। এর পর বুড়োকে টিকিয়ে রাখা শক্ত হবে।"

ভবানী মুখ নাড়িয়া বলিল, "আর ভাক্তর কথাও একবার ভেবে দেখুন দিখি। তাকে না পারছি নাওয়াতে, না পারছি খাওয়াতে, খালি ব'সে চোখের জল ফেলছে। এমন করলে মানুষের শরীর টেঁকে?"

"আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল দেখছি" বলিতে বলিতে ডাক্তার কর্ত্তা প্রমদারঞ্জনের শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রমদারঞ্জন পশ্চিমবঙ্গের একজন ধনবান্ জমিদার। তাহাদের বংশমর্য্যাদা ও ধনের খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত কালের প্রভাব এড়াইয়া অনেকটাই টিকিয়া আছে। এককালে ধার্ম্মিক পরিবার বলিয়াও তাঁহাদের নাম ছিল। কিন্তু প্রমদারঞ্জন যৌবনে লুকাইয়া মদমাংস খাইয়া, ও আনুষঙ্গিক নানা অনাচার করিয়া সে-খ্যাতি অনেকটাই দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুত্র জ্ঞানদারঞ্জনের ও-সকল উপসর্গ না থাকিলেও তাহার উগ্র সাহেবিয়ানাকে সকলেই হিন্দুর ছেলের পক্ষে ঘোরতর অনাচার বলিয়া গণ্য করে। সে মদ না খাইলেও মাংস ও চুরুটের প্রতি ভক্তি তাহার অসাধারণ। পারত-পক্ষে ধুতি সে পরে না, এবং স্ত্রী ভানুমতীর পায়ে চটিজুতার অভাব দেখিলে,

তাহার সঙ্গে মহা ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। ভানুমতী হিন্দু ঘরের মেয়ে হইলেও, স্বামীর পাল্লায় পড়িয়া নব্য ধরণে কাপড় পরিতে ও চুল বাঁধিতে, জুতা মোজা পরিতে, এবং চলনসই রকম ইংরেজী বলিতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাতে বাড়ীতে ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছিল, এমন কি প্রমদারঞ্জনের বিধবা ভগিনী ত লজ্জায় ঘৃণায় আকুল হইয়া কাশীই চলিয়া যাইতে চাহিলেন। কোনো রকমে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাঁহাকে দেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে রাধা-গোবিন্দজীর পূজার তদারক করিয়া, আশ্রিতা আত্মীয়া ও অনাত্মীয়াদের উপর প্রভুত্ব করিয়া এবং পরচর্চ্চা করিয়া তাঁহার দিন এক রকম ভালই কাটিতেছে। এদিকে পিসীমার সমস্তদিনব্যাপী আর্ত্তনাদ ও তিরস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জ্ঞানদারঞ্জন এবং ভানুমতীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রমদারঞ্জনের বিশেষ কিছু লাভ বা লোকসান হইল না। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা আসিয়া পড়াতে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অধিকাংশ অনাচার ছাড়িতে হইয়াছিল, কাজেই ভগিনী কাছে থাকিলেও তাঁহার কোনো আপত্তি ছিল না। তবে একদিকে পুত্রের অবিশ্রান্ত নালিশ ও অন্যদিকে ভগিনীর অবিশ্রান্ত বিলাপের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তাঁহারও একটু আরাম বোধ যে না হইল তাহা নহে।

জ্ঞানদারঞ্জন কয়েক দিন হইল এক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছে। আমোদ-প্রমোদে চিরকালই তার অত্যন্ত রুচি, তাহার স্রোতে ডুবিয়াই বোধ-হয় সে বাড়ীতে একটা খবরও দেয় নাই। এদিকে বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী পত্নী ত ভাবনায় চিন্তায় পাগল হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ফিরিবার সময় জ্ঞানদারা সকলে জল-পথে ফিরিতেও পারে এমন একটা কথা ছিল, তাহারই জন্য ভানুমতীর ভাবনা হইয়াছে অধিক।

ভানুমতী সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে হইলেও ধনে মানে তাহার শ্বশুরও পিতৃকুলে অনেকটাই তফাৎ ছিল। রূপের জোরেই সে প্রমদারঞ্জনের একমাত্র সন্তানের ঘর আলো করিতে আসিয়াছিল। প্রমদারঞ্জনের

পত্নীর গুণের অভাব না থাকিলেও রূপের অভাব যথেষ্টই ছিল, এবং তাহার জন্য তাঁহার নিজের মনে খেদের সীমা ছিল না। পুত্রের যাহাতে এই ভোগ ভুগিতে না হয়, তাহার জন্য তিনি অনেক দেখিয়া-শুনিয়া বৌ আনিয়াছিলেন। বাংলাদেশ খুঁজিয়া মনের মত পাত্রী মিলিল না বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানেও চর পাঠাইয়াছিলেন। ভানুমতীর পিতা রাজপুতনায় স্ত্রীপুত্র লইয়া বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছিলেন। মেয়ের বিবাহ কি প্রকারে হইবে, এ ভাবনা তাঁহাদের নিতান্ত কম ছিল না। ধনে, মানে, কুলে, শীলে এমন অপ্রত্যাশিত রকম পাত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা ত আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিবাহ স্থির হইতে, এবং হইয়া যাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

ভানুমতী এক রকম চিরকালের মতই পিতৃগৃহ ছাড়িয়া আসিল। সঙ্গে আসিল তাহার রাজপুত দাসী ভবানী।

ভবানী জাতিতে রাজপুত হইলেও বাঙালীর সংসারে বহুকাল কাজ করার দরুন বাঙালীরই মত বাংলা কথা বলিতে পারিত। তবে তাহার ধরণধারণ একটু কাঠখোট্টা গোছের থাকিয়া গিয়াছিল। তাই বাড়ীর সকলে তাহাকে "রণচণ্ডী, মদ্দা ভগবতী" বলিয়া ক্ষেপাইত। ভানুমতী নিজেও ঠিক বাঙালী মেয়ের মত নম্র বা লাজুক ছিল না, কিন্তু এই কারণেই জ্ঞানদারঞ্জনের তাহাকে বিশেষরকম ভাল লাগিয়া গেল। বাবা তাহার জন্য একটি ছিঁচকাঁদুনে গোমূর্খ খুকী ধরিয়া আনিবেন এই ভয়টা তাহার অত্যন্তই ছিল, এখন ভানুমতীকে পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। স্ত্রীর ভিতর আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার যা অভাব ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় সে তাহা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাড়ী হইতে যেটুকু বাধা পাইল, তাহার বিরুদ্ধেও প্রবলভাবে বিদ্রোহ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারই জয় হইল।

এই সকল কারণে ভানুমতী শীঘ্রই স্বামীর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিল। বাড়ীর অন্য-সকলে সামনে পিছনে তাহার নিন্দা করিত বলিয়া আর কাহারও কাছে সে বড় একটা ঘেঁষিত না। স্বামী ছিল তাহার

একমাত্র সম্বল। যতক্ষণ বাধ্য হইয়া তাহাকে স্বামী হইতে দূরে থাকিতে হইত, তাহার একটা মিনিটও যেন কাটিতে চাহিত না। বই পড়িয়া, শেলাই লইয়া বসিয়া, গোছানো ঘর দশবার করিয়া গোছাইয়াও সে অস্থির হইয়া উঠিত। আর কিছু না পাইলে ভবানীর সঙ্গে অকারণ ঝগড়া করিত, এবং জ্ঞানদার ভিতর-বাড়িতে আসিবার সময় পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হইয়া যাইতে না যাইতে বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিত। ভবানী এই ছেলে-মানুষের ছেলেমানুষী দেখিয়া মনে মনে হাসিত, ভাবিত, "দু'দিন যাক, ছেলে-পিলের মা হলে, এসব পাগলামী নিজের থেকেই যাবে।"

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ভানুমতীর বিবাহ হইয়াছিল প্রায় পনেরো বৎসর বয়সে, এখন তাহার বয়স কুড়ি। রূপ-যৌবনে তাহার সারা দেহ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু কোল শূন্যই থাকিয়া গেল।

কর্ত্তা প্রমদরঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর চাকর দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা লইয়া ক্ষোভের সীমা ছিল না। বংশের একমাত্র দুলাল জ্ঞানদা, তাহার ঘর যদি শিশুমুখের হাসিতে আলো না হইয়া উঠে তাহা হইলে এই বিশাল পুরীর আঁধার ঘুচিবে কেমন করিয়া? শেষে কি কর্ত্তার ভাইপো লক্ষ্মীছাড়া মাতাল উদয়টাই আসিয়া সব জুড়িয়া বসিবে নাকি?

ডাক্তার রমেন্দ্রবাবু কর্ত্তার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন বোধ করছেন?"

প্রমদারঞ্জন তখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠেন নাই। একখানি খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন, "ভাল আর আছি কই? ছেলেটা বড় ভাবিয়ে তুলল। এইমাত্র প্রিপেড টেলিগ্রাম করলাম বোসেদের বাড়ী।"

রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের রকমই হয়েছে ঐ। আমোদ হলেই হল। কোথায় বুড়ো বাপ-খুড়ো খবরের জন্য হাঁপিয়ে মরছে, সে-কথা তাদের মনে থাকলে ত।"

প্রমদাবাবু বলিলেন, "শুধু বুড়ো বাপ ত বাড়ী জুড়ে নেই, তার স্ত্রীও ত রয়েছে? তাকেও ত একটা খবর দিতে পারত! সে বেটী ত শুনছি একেবারে মরতে বসেছে ভাবনায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "হুঁ, বৌমার শরীর কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না শুনছিলাম। ছেলেপিলে হবে নাকি?"

কর্তা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি জানি, সেরকম ত কিছু শুনিনি। অদৃষ্টে সে সুখ কি আছে যে নাতির মুখ দেখে মরব? এত বড় বংশ জ্ঞানদার সঙ্গেই শেষ হবে নাকি কে জানে? উদয় হতভাগা এসে এ বাড়ীতে তার বারো ভূত নিয়ে রাজত্ব করছে জানলে আমার আত্মা ত শান্তি পাবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "এরই মধ্যে হাল ছাড়ছেন? কি বা আপনার ছেলে-বৌয়ের বয়েস? কপালে জোর থাকে ত এখনও অনেক নাতি নাতনী দেখে যেতে পারবেন।"

প্রমদারঞ্জন বলিলেন, "ঘর ভরার আশা করি না হে ভায়া, এখন একটি দেখে যেতে পারলেই আমার ঢের হয়।"

রমেন্দ্রবাবু উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তা দেখবেন বই কি, নিশ্চয় দেখবেন। আচ্ছা, আসি আজ, মিকশ্চারটা ঠিকমত খাচ্ছেন ত? এখনো গুটি-পাঁচ কর্তার বাড়ী ঢুঁ মেরে যেতে হবে।" ডাক্তার চলিয়া গেলেন এবং কর্তা আবার খবরের কাগজ পাঠে মন দিলেন। একজন হিন্দুস্থানী চাকর ঘরের সব দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া ঘর ঝাঁট দিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

ভবানী বাহির হইয়া যাইতেই ভাগ্যবতী উঠিয়া অস্থির ভাবে ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। জ্ঞানদার অন্যায় ব্যবহারের কথা যত তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই রাগে তাহার বুকের ভিতরটা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অশ্রু যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতে লাগিল। কি করিয়াছে সে, যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার? কায়মনোবাক্যে স্বামীকে তুষ্ট করিবার কোনো চেষ্টার সে ত্রুটি করে নাই। তিনি যখন যেভাবে চলিতে

বলিয়াছেন সে তাহাই চলিয়াছে, আত্মীয়বন্ধু সকলের ঠাট্টা বিদ্রুপ সব অগ্রাহ্য করিয়া। পিতামাতা সাগ্রহে বারবার আহ্বান করা সত্ত্বেও, সে একদিনের জন্যও বাপের বাড়ী যাইতে চাহে নাই। এত করিয়াও সে কি স্বামীর কাছে এমনই অবহেলার জিনিষ থাকিয়া গেল যে দু'দিন চোখের আড়াল হইতেই তিনি তাহাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? না, এ ব্যবহার একেবারে অসহ্য। এর শোধ সে তুলিবেই, যেমন করিয়া হোক।

কিন্তু তাঁহার যদি কোনো বিপদ্ হইয়া থাকে? এই চিন্তা মনে আসিবামাত্র ভানুমতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। হায়রে, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে তাহার মত হতভাগিনী আর থাকিবে কে? অমন স্বামী কি কাহারও কখনও হয়? এমন করিয়া স্ত্রীকে আর কে ভালবাসে? জমিদার বংশের শত অনাচার কদাচারের স্রোত তাহাকে ত কিছুমাত্রও স্পর্শ করে নাই, তাহার চরিত্র হীরকের মতই উজ্জ্বল নির্ম্মল থাকিয়া গেছে। আজ কি শুধু ধনের মানের জন্য ভানুমতী সকল আত্মীয়-আত্মীয়ার হিংসার পাত্রী? তাহার অসাধারণ স্বামীসৌভাগ্যই যে তাহাকে নারীকুলের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। তাহার সন্তান হইল না বলিয়া পরের কাছে সে কত না কথা শুনিয়াছে, কিন্তু স্বামী ত তাহার এ ত্রুটি কোনো দিন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেন নাই, হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন।

ভবানী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "না বাছা, কোনো খবর এখনও আসেনি। তবে কর্ত্তা 'তার' করেছেন জবাবের টাকা দিয়ে, আজ বেলা বারোটা একটার মধ্যে ঠিক খবর আসবে। নাও, এখন হ'ল ত? মুখ হাতগুলো ধোও এরপর। চাবিটা দাও, কাপড় জামা বার ক'রে দি।"

চাবির রিংটা ভবানীর গায়ে ছুড়িয়া দিয়া ভানুমতী বলিল, "ছাই হ'ল। কি খবর যে আস্‌বে তা মা দুর্গাই জানেন। নে, কি বার কর্‌বি কর্‌।"

ভবানী আল্‌মারী খুলিয়া একটি লেশ বসানো সেমিজ, একটি নীল ভায়েলা ফ্লানেলের জ্যাকেট এবং একখানি লাল পাড়ের ঢাকাই শাড়ী

বাহির করিল। ক্রমাগত কান্নাকাটি করিয়া এবং ভবানীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভানুমতী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে আর কাপড় ছাড়িতে বেশী আপত্তি করিল না। ফিরিয়া আসিয়া ইজি চেয়ারে বসিতেই ভবানী চিরুণী লইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে সুরু করিল। আর-একজন বৃদ্ধা ঝি আসিয়া সকালের পরিত্যক্ত খাবারগুলি উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং খানিক পরে গরম লুচি, তরকারী, সন্দেশ, এবং এক বাটী গরম দুধ রাখিয়া গেল। চুল বাঁধা শেষ হইতেই, ভবানী পিতলের টেবিলটি ভানুমতীর সামনে টানিয়া আনিল, এবং যতক্ষণ সে কিছু না খাইল তাহাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিল না।

খাওয়া শেষ করিয়া, ভবানীকে বিদায় দিয়া ভানুমতী আবার ঘরের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এমন এক ইঞ্চি স্থান নাই, যেখানে তাহার স্বামীর কোনো না কোনো চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। ঘরের ভিতর জ্ঞানদার ছবিই ঝুলিতেছে কম করিয়া বারো-চোদ্দখানা। তাহার পর তাহার বই, তাহার কাপড়, তাহার জামা, জুতা, ছড়ি, তামাকের পাইপ, ঘরময়। সবাই যেন মূক দৃষ্টিতে ভানুমতীর দিকে চাহিয়া আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে এ গৃহের অধীশ্বর কোথায়? সে সজল চোখে জিনিসগুলি একে একে স্পর্শ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটা ছবির উপর তাহার চোখ পড়িল। ইহা তাহাদের বিবাহের বৎসরে তোলা। তখনও ভানুমতী ভাল করিয়া নব্য প্রথায় চুল বাঁধিতে কাপড় পরিতে শিখে নাই। ছবি তুলিবার আগে জ্ঞানদা তাহাকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছিল, মনে করিয়া ভানুমতীর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মধুর সলাজ হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক হানিয়া গেল।

বাহির হইতে কে একজন গলা খাঁকরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরেই নাকি, বৌঠাকরুণ?"

ভানুমতী পর্দ্দার ফাঁকে উঁকি মারিয়া দেখিল উদয় দাঁড়াইয়া আছে। অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলিয়া এ-বাড়ীর কেহই উদয়কে দেখিতে পারিত না।

জ্ঞানদা বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে বারণ করিয়া দিয়াছিল, সে যেন উদয়কে কোনো প্রকার আত্মীয়তা করিতে প্রশ্রয় না দেয়, এমন কি সম্ভব হইলে তাহার সহিত কথা পর্য্যন্ত যেন না বলে। কিন্তু যতই উপেক্ষা-অনাদর লাভ করুক, উদয় সহজে দমিবার ছেলে নয়। ভানুমতীর সহিত আত্মীয়তা করিবার প্রবল চেষ্টা সে একদিনও ত্যাগ করে নাই। তবে ভানুমতী অসুস্থ থাকায় তাহার চেষ্টায় যে কিছু লাভ হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

বিরক্তিতে ভানুমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। এ হতভাগার কি একদিনও বাদ যাইতে নাই? উত্তর দিবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় কাত্তি ঝি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছোট দাদাবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, বৌরাণীমা; আপনার খোঁজ কচ্ছেন।"

ভানুমতী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বল্‌গে যা যে তাঁর শরীর বড় খারাপ, শুয়ে আছেন।"

এই দাসীটি কোনো অজ্ঞাত কারণে উদয়ের কিঞ্চিৎ বশীভূত ছিল। সে তখনই বিদায় না হইয়া বলিল, "কি দরকারী কথা আছে বল্লেন।"

ভানুমতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "তার দরকারী কথা শুনবার আমার দরকার নেই। আমি এখন উঠতে পারব না।"

কাত্তিকে আর কষ্ট করিয়া খবরটা উদয়কে দিতে হইল না। সে দরজার খুব কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, ভানুমতীর কথা বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইল। পর্দার কাছে আসিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ, কথাটা আপনার জানা দরকার, তাই আপনাকে বল্‌তে এলাম। শুধু শুধু আপনাকে রাগাবার আমার কোন ইচ্ছা নেই।"

ভানুমতী এবার আর না উঠিয়া পারিল না। মাথায় কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "কি কথা বলুন।"

উদয় মুখখানাকে যথাসাধ্য কাতর করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "দাদার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ীর অমরও বোসদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিল, আপনার মনে আছে বোধ হয়?"

ভানুমতীর ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, তাহার মনেই আছে।

উদয় বলিল, "আজ সকালে ঘুরতে ঘুরতে এমনি একটু তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, শুনলাম অমরের চিঠি এসেছে। দাদার কোনো খবর আছে কি না জিগ্‌গেস করাতে তারা বল্‌লে, ভাল খবর নয়।"

ভানুমতীর পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দরজার কপাট ধরিয়া কোনোমতে নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে সে?"

"বিয়ের দু'তিন দিন পরে ওরা সবাই মিলে শিকারে যায়। সেখানে কেমন ক'রে জানি না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, দাদার অবস্থা বোধ হয় বিশেষ সুবিধার নয়। এখনি এবাড়ীর থেকে কারো ওখানে যাওয়া উচিত। আমার হাতে একটা পয়সাও নেই, তা না হলে সকালের ট্রেনেই আমি চ'লে যেতাম।"

ভানুমতী টলিতে টলিতে ঘরের ভিতর গিয়া খাটের উপর অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় লুটাইয়া পড়িল। সে যেন ভাল করিয়া উদয়ের কথা বুঝিতেই পারে নাই। কাহার মুখে খবর পাইয়া ভবানী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিল। উদয় তখনও পর্দ্দার ওপাশে দাঁড়াইয়া। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সে বলিল, "কর্ত্তা-মশায়ের ঘরে গিয়ে তাকে খবর দিন। এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে?"

কর্ত্তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইবার ইচ্ছা যে উদয়ের খুব ছিল তাহা নহে। তবে ভানুমতীর অবস্থা দেখিয়া সে বুঝিল যে, এখানে দাঁড়াইয়াও খুব বেশী কিছু লাভ নাই। অগত্যা আস্তে আস্তে সে সরিয়া গেল। প্রমদারঞ্জনের কাছে নিজে না গিয়া একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া, তাহার মারফতে আপনার বক্তব্য পাঠাইল। কিছুক্ষণ পরে গোটাতিন-চার দশটাকার নোট পকেটে ভরিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরেই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব আসিয়া পড়িল। বজ্রাহতের মত সারাবাড়ী যেন নীরব নিস্পন্দ হইয়া গেল। জ্ঞানদা মারা গিয়াছে।

প্রমদারঞ্জনের ঘরের দিকে ভয়ে আর কেহ পা বাড়াইল না। কেবল ডাক্তার রমেন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ঘরের দরজায় কাঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। দরজা বন্ধই রহিল, ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত গাঢ় কণ্ঠে প্রমদারঞ্জন বলিলেন, "ডাক্তার, মৃত্যু যাদের স্বাভাবিক, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা আর কোরো না। আমরা মরণকে তার ন্যায্য পাওনার থেকে বঞ্চিত করি ব'লে সে এমনি ক'রেই আমাদের ওপর শোধ তোলে। আমার ছাব্বিশ বছরের ছেলে আমারই পাপে গেল।"

ভানুমতীর সেদিন জ্ঞানই হইল না। ভবানী হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত তাহাকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া রহিল, কাহাকেও আর তাহার কাছে আসিতে দিল না। নিজেও সারাদিন সে জলস্পর্শ করিল না।

সন্ধ্যার সময় উদয় আসিয়া একবার করুণাবিগলিতকণ্ঠে ভানুমতীর খবর জিজ্ঞাসা করিল। কাতি তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। ভবানী দাঁতে দাঁতছ ঘসিয়া বিড় বিড় করিয়া বলিল, "বড় ফুর্তিই হয়েছে মনে। কিন্তু হতভাগা, তোর সব আশাতেই ছাই পড়্‌বে, এই আমি ব'লে রাখ্‌লাম।"

উদয় বাহির হইয়া যাইতে যাইতে আপন মনেই বলিল, "যাক্, টাকা চল্লিশটা আর বুড়ো এখন ফিরে চাইবে না।"

২

দশ বারোটা দিন কোনো রকমে কাটিয়া গেল। জমিদার-বাড়ীর উপর শোকের কৃষ্ণ ছায়া গাঢ় হইয়া রহিল, তবু মানুষের স্বাভাবিক-ধর্ম্ম-বশে সকলেই এক-এক করিয়া জীবনকে আবার এই নূতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চাকর-ঝিগুলি এতদিন মনিবদের শোকের আওতায় একেবারে মুসড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহারাও অল্পে অল্পে কোলাহল সুরু করিল। বাকি রহিল কেবল ভবানী। তাহাকে আর হাসি-

গল্পে যোগ দিতে ডাকিবার সাহস কাহারও হইল না। কাতি মুখ ঘুরাইয়া অন্য দাসীদের কাছে বলিল, "ন্যাকাপানা দেখ, সোয়ামী মরেছে যেন ওরই! অমন যে যার-পর নেই বাপ, সেও সাম্‌লে উঠেছে, আর ঐ বুড়ী মাগীর রকম দেখ। বৌরাণীকে যেন ভূতের মত পেয়ে বসেছে। না দেয় বেরুতে, না দেয় কারো সঙ্গে কথা কইতে। বিধবা কি কেউ হয় না? এই ত আমরা রয়েছি। যে গিয়েছে তার জন্যে নিজে ম'রে আর কি হ'বে? খাও, দাও, আপনার জান বাঁচাও, এই ত বুঝি বাপু!"

প্রমদারঞ্জন ভিতরে ভিতরে কতটা সাম্‌লাইয়াছিলেন বলা যায় না, তবে বাহিরের চালচলন তাঁহাব আবার প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কথা-বার্ত্তা আর আগের মত বলিতেন না। ভানুমতীর অর্দ্ধ-অচেতন ভাবটা এখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। ভবানী তাহাকে শিশুর মত করিয়া আগ্‌লাইয়া রাখিত। নাওয়ানো, খাওয়ানো সবই আপন হাতে করিত। সে স্বভাবতঃই স্বল্পভাষিণী ছিল, এখন আর একেবারেই কথা বলিত না। কেবল উদয়কে দেখিলে তাহার মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিত, আপন মনে চাপা গলায় সে অভিশাপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিত।

বেলা দশটা বাজে। ভানুমতীকে স্নান করাইয়া, তাহার জলযোগের সব আয়োজন করিতে ভবানী ঘরের বাহির হইতেছে, এমন সময় কর্ত্তার খাস চাকর কুবের আসিয়া খবর দিল যে, কর্ত্তাবাবু একবার তাহাকে ডাকিতেছেন।

কর্ত্তার ঘরে বিশেষ কখনও তাহার ডাক পড়ে না। কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া ভবানী বলিল, "সেখানে আর কে কে আছেন?"

কুবের বলিল, "ডাক্তার-বাবু, নায়েব-বাবু, আর ছোট দাদা-বাবু।"

মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছেন জান কিছু?"

কুবের বলিল, সে খবর তাহার জানা নাই। দুধ, ফল, মিষ্টি গোছাইবার ভার আর-একজনের উপর দিয়া ভবানী আস্তে আস্তে কর্ত্তার ঘরের দিকে

চলিল। কি প্রয়োজনে যে তাহার ডাক পড়িতে পারে, তাহার মনের মধ্যে কেবল তাহারই জল্পনা চলিতে লাগিল।

প্রমদারঞ্জন খাট ছাড়িয়া একখানা বড় ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিলেন। ডাক্তার ও নায়েব তাঁহার দুই পাশে বসিয়াছিলেন, এবং উদয় ছিল কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া। জ্যাঠা-মহাশয়ের সাম্‌নে বসিবার সাহস তাহার কোনো-কালেই হইত না, প্রয়োজন দেখিলেই যেন দৌড় মারা চলে, এমন ভঙ্গী করিয়া সে সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া থাকিত।

ভবানী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। হাতের ইসারায় তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে বলিয়া উদয় আরো একটু সরিয়া গেল। প্রমদারঞ্জন একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া ছিলেন, সেই বিষয়েই বোধ হয় ডাক্তার এবং নায়েবের সঙ্গে তাঁহার কোনো পরামর্শ হইতেছিল। ভবানীকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এই যে ভবানী! বৌমার শরীর আজ কেমন?"

ভবানী মৃদু গলায় বলিল, "অল্পে অল্পে সাম্‌লে উঠছে, বাবু। কাল রাত্রে বেশ ঘুমিয়েছে। এ ক'দিন ত চোখে পাতায় এক করে নি।"

প্রমদারঞ্জন চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "বৌমার বাবা কল্‌কাতায় এসেছেন। তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে চান। বৌমার কি মত জানা দরকার। এখানে থাক্‌তে চান, যেমন আদরে চিরদিন ছিলেন তাই থাকবেন; বাপের কাছে থাকতে চান আমি কোনো আপত্তি কর্‌ব না। তাঁর শরীর যদি বেশী খারাপ না থাকে, তাঁকে একবার জিগ্‌গেস ক'রে এসো। আমার চিঠির জবাব পেলেই বেয়াই মশায় ওখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌বেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কিন্তু একেবারে পাঠিয়ে দেওয়া আমি ঠিক মনে করি না। ছেলের অবর্ত্তমানে এখন তাঁরই ছেলের সব কাজ কর্‌তে হবে। কর্ত্তব্য ব'লে ত একটা জিনিষ আছে। আপনাকে দেখা-শোনাই তাঁর জীবনের অবলম্বন হওয়া উচিত এখন।"

জমিদারবাবু বলিলেন, "ওকথা আর বোলো না, আমি কবে আছি কবে নেই। আমার ভাবনা ভাবতে ভগবান্ আছেন। ওর অল্প বয়স, এমন

ভয়ানক আঘাতটা পেল, এখন যা নিয়ে মনকে ভোলাতে পারে, তাকে তাই দেওয়া উচিত। বাপের বাড়ী থাকা আর এখানে থাকা এখন ওর একই কথা। ওখানে থাকলেও টাকাকড়ির কোনো অভাব তাঁর হবে না, জ্ঞানদার জন্যে যে মাসহারা বরাদ্দ ছিল, তা বৌমাই পাবেন আজীবন।"

নায়েব মশায় জমিদারীতে কাজ করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মাঝে মাঝে একটু মন খুলিয়া কথা বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বিধবা ভানুমতীকে মাসিক দেড় হাজার টাকা দিবার প্রস্তাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অত টাকা, ছেলেমানুষ তিনি, তাঁর হাতে দেওয়া কি ঠিক হবে? বারোভূতে লুটে খাবে শেষে। আমাদের দেশে মেয়েছেলের আর খরচ কি বলুন? বিশেষ ক'রে বিধবা মানুষের? দেড়শ দু'শ টাকা হ'লেই ভেসে যাবে। দান-ধ্যান করা বই আর তাদের খরচ কি?"

ভবানীর কাণ ছিল প্রমদারঞ্জনের ও তাঁহার সঙ্গীদের কথার দিকে, কিন্তু চোখ ছিল উদয়ের মুখের উপর। অতগুলি টাকা মাস-মাস হাতছাড়া হইবে এই প্রস্তাব শুনিয়াই যেন উদয়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। যদিও প্রমদারঞ্জন এখনও মরেন নাই এবং উদয়ের সুখের কাঁটা ভানুমতীও এখনও বাঁচিয়া, তবু সে নিজেকে জমিদার বলিয়া এক রকম ধরিয়াই লইয়াছিল। সুতরাং তাহার টাকা এমন ভাবে অপব্যয় করার প্রস্তাবে তাহার মুখ যে বিকৃত হইয়া উঠিবে সে আর বিচিত্র কি?

ভবানী অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক হইলেও মানব-চরিত্রে জ্ঞান তাহার অল্প ছিল না। বিশেষ করিয়া উদয় সম্বন্ধে তাহার কখনও ভুল হইত না। উদয়ের মনের কথা সে এক রকম আঁচ করিয়াই লইল এবং ক্রূর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া প্রমদারঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দিদিমণি ত যেতেই চাইবেন, কিন্তু এখন তাঁকে এত নাড়ানাড়ি করা কি ঠিক হবে? এই গাড়ী থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে ষ্টীমার, এত-সব কি সইবে?"

প্রমদারঞ্জন উত্তর দিবার আগেই ডাক্তার বলিলেন, "তাতে বেশী কিছু অনিষ্ট হবে না। শরীর দুর্ব্বল, তা ফার্ষ্ট-ক্লাশে যাবেন এখন, লোকের ভীড় পোহাতে হবে না।"

ভবানী গলা নীচু করিয়া বলিল, "তাঁর শরীরের কথা বলছি না ডাক্তারবাবু, কিন্তু বংশের দুলাল রয়েছেন তাঁর পেটে, তাঁর কথা ভাবতে হবে, এখনও এত টানাটানি করবার মত হয় নি।"

ডাক্তার ও নায়েব আনন্দের আতিশয্যে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াই পড়িলেন। প্রমদারঞ্জন অতটা আনন্দ কিছু প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার হাত হইতে বেহাইয়ের চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। উদয়ের মুখ প্রায় অমাবস্যার আকাশের মত হইয়া উঠিল, তবুও সে ঘর ছাড়িল না, দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রমদারঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, এ খবর ত আগে শুনি নি?"

ভবানী লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "এতদিন ঠিক ক'রে ধরতে পারিনি বাবু, তাই বলতে সাহস করি নি; এখন আর কোন সন্দেহ নেই।"

ডাক্তার বলিলেন; "তাহ'লে এখন তাকে পাঠানোর কোন কল্পনাই করা চলে না, অন্তত আর দুটো মাস যাবার আগে। যাক্, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে এত গভীর শোকের মধ্যেও এইটুকু সান্ত্বনা তিনি আপনার জন্যে রেখেছিলেন। ছেলে যদি হয় তাহ'লে সে-ই আপনার ছেলের অভাব পুরণ করবে।'

কর্ত্তা কথা বলিলেন, না, কিন্তু তাঁহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। নায়েবমশায় কয়েকখানা কাগজপত্র গুছাইয়া কর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন, ডাক্তার আবার চেয়ার টানিয়া লইয়া জাঁকাইয়া বসিলেন। উদয়ের সন্ধানে চোখ ফিরাইয়া ভবানী দেখিল সে কখন নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "তোর বাড়া-ভাতে যে ছাই দিতে পারলাম হতভাগা, এর জন্যে হরির লুট দেব চার আনার।"

ভানুমতীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া ভবানী দেখিল, সে তখনও খায় নাই। দাসী তাহার জন্য দুধ মিষ্টি প্রভৃতি লইয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে। ভবানীর মনটা অনেক কাল পরে একটু ভাল ছিল, সে সদয় কণ্ঠেই বলিল, "ও মা, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্ মুখী? যা, যা, আমি খাওয়াচ্ছি দিদিমণিকে।"

মোক্ষদা হাঁফ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ভানুমতীর ঘরে আজকাল ভবানী ছাড়া আর কেহ বড় আসিতে সাহস করিত না। তাহার পাথরের মত মুখ আর নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকাইলেই যেন তাহাদের বুকের রক্ত জল হইয়া আসিত। কাঁদ, কাট, মাথা কোট, এ সব তাহাদের অভ্যাস ছিল, সে-রকম কিছু দেখিলে পাশে বসিয়া নিজেরাও খানিক হাঁউমাউ করিয়া চীৎকার করা চলে, কিন্তু এমন-ধারা কাণ্ড তাহারা দেখে নাই। অমন ইন্দ্রতুল্য স্বামী যে মরিল, তাহার জন্য দশটা দিন কাঁদিতেও পারিল না গা? এ কেমন মেয়ে-মানুষ? ঐ বুড়ী মাগীই কিছু পরামর্শ দিয়া থাকিবে বোধ হয়, এক দণ্ড ত বৌরাণীর ঘব ছাড়িয়া নড়ে না। তাহাকে কোনো প্রশ্ন করিবার সাহস কাহারও ছিল না। যা স্বভাব, কি জানি যদি দু' ঘা লাগাইয়াই দেয়? তাহার সঙ্গে জোরে পারিবারও কাহারও সম্ভাবনা ছিল না।

ভবানীর অনুরোধে ভানুমতী আস্তে আস্তে খাইতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিনের মধ্যেই সে আরো অনেকখানি রোগা হইয়া গিয়াছে। শোকের আগুন তাহাকে ভিতরে ভিতরে পোড়াইতেছিল বলিয়াই যেন তাহার মুখের রং অনেকটা ছাইয়ের মত হইয়া আসিয়াছে, চোখ অর্থশূন্য জ্যোতিঃহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তাহার পরিধানে সেমিজের উপর একখানা সরু কালো-পাড়ের ধুতি, হাতে দু'গাছি বালা। একেবারে বিধবার বেশ পরাইতে ভবানী প্রাণ ধরিয়া পারে নাই। অবশ্য এ লইয়াও সমালোচনার অন্ত ছিল না। বিধবা মানুষের আবার এত গহনা পরা, খাটে শোওয়া কেন? কপাল যখন পুড়িলই, সেই মত থাকিলেই হয়?

ভবানী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কল্‌কাতার থেকে আমাদের বাবু চিঠি দিয়েছেন, কর্ত্তা আমায় ডেকে বল্‌লেন। তোমায় নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আমি বলি, এখন তোমার এত নাড়ানাড়ি না করাই ভাল। মাস-ছুই পরে গিয়ে একবার দিন-কতকের মত থেকে এসো।"

ভানুমতী হঠাৎ খাওয়া ছাড়িয়া সরিয়া বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না ভবানী, আমি এখনি যাব, আমায় নিয়ে চল্। এখানে আর দু'দিন থাক্‌লে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার কিছু হবে না; তুই কর্ত্তা-মশায়কে ব'লে আয়, আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে।"

ভবানী বলিল, "ছি, দিদি, এমন অবুঝের মত কাজ করে না। সন্তান রয়েছে পেটে, সেই তোমার আশা ভরসা সব। তার ভাল-মন্দ তুমি মা হয়ে দেখবে না?"

ভানুমতী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরে অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আমার অদৃষ্টে কি কিছু ভাল টিঁকবে, ভবানী? তা না হলে এই দশা হল আমার কুড়ি বছর যেতে না-যেতে? আমার মা, ঠাকুমা সবাই বুড়ো বয়েসে পাকা চুলে সিঁদুর প'রে গেছে রে!"

ভবানী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। "সকলের অদৃষ্ট সমান হয় না দিদি, যা কপালে ছিল ঘট্‌ল, কি কর্‌বে বল? মানুষের হাত ত নেই? এখন যেটুকু আশা ভগবান্ দিচ্ছেন, তাইতেই বুক বেঁধে থাক। দেখ, কর্ত্তা-মশায় সুদ্ধ আজ খবর শুনে কত বল পেয়েছেন। তাঁরও ত কম যায়নি! এখন শ্বশুরের বংশ যাতে বজায় থাকে, তাই কেবল ভাব। নিজের কোনো অযত্ন ক'রো না।" ভানুমতী আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল। সে আর খাইবে না দেখিয়া ভবানী পরিত্যক্ত খাবারের পাত্র উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া ঘরের সব আস্‌বাব পালকের ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া, ঘর ঝাঁট দিবার জোগাড় করিতে লাগিল।

ভানুমতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, ঠাকুরপো ছিল সেখানে, যখন তুই কর্ত্তামশায়কে খবর দিলি ?"

ভবানী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "ছিল না আবার? ক'দিন থেকে হতভাগা কি বাড়ীছাড়া হয়েছে? ঠিক যেন যক্ষির ধন আগলে বেড়াচ্ছে। তেম্‌নি হয়েছে মুখের মতন জুতো! কখন্ যে সুট্ ক'রে পালাল দেখতেও পেলাম না।"

ভানুমতীর পাংশু মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "আমার স্বামীকে ঐ খেল, সারাক্ষণ চোখ দিয়ে দিয়ে। তা না হ'লে অমন মানুষ বেঘোরে মারা যায়? এখন ছেলে খাবার চেষ্টায় লাগছে। কিন্তু আমায় না খেয়ে পার্‌ছে না, তা ব'লে রাখলাম দেখিস।"

উত্তেজনায় তাহার সারা শরীর কাঁপিতেছে দেখিয়া ভবানী আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া খাটে শোওয়াইয়া দিল।

৩

রাজধানীতে সবে বসন্তের হাওয়া দিতে সুরু করিয়াছে। খাঁটি সহরের মধ্যে অবশ্য ঋতু-রাজের আবির্ভাবের চিহ্ন বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু ভবানীপুর, বালিগঞ্জ প্রভৃতির মাঠ, ঘাট, পথের ধারের গাছে পাতায় তাঁহার রঙীন উত্তরীয় ক্ষণে ক্ষণে বাতাসে ঝিলিক্ হানিয়া যাইতেছে। শীতকালের সন্ধ্যার অসহনীয় ধোঁয়ার যবনিকা খানিকটা অন্ততঃ সরিয়া যাওয়াতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখন তবু নিঃশ্বাস লইয়া প্রাণ একটু জুড়ায়; নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আধ সের করিয়া কয়লার গুঁড়া ত ফুস্‌ফুসের ভিতর টানিয়া লইতে হয় না?

বাড়ীখানি মাঝারি গোছের। ভবানীপুরের নিরালা এক পথের উপরেই। রাস্তার ওপারে একসার কৃষ্ণচূড়া ও বলরামচূড়া গাছ, তাহাতে

রঙের আগুন ধরিয়া গিয়াছে। অল্পদূরে ছোট একটি পুকুর, কয়েকটা হাঁস তাহার জলে খুব ব্যস্তভাবে ডুব মারিয়া মারিয়া কিসের যেন সন্ধান করিতেছে। পথটায় পথিকের সংখ্যা বিশেষ অধিক নয়। গাড়ী বা মোটর অনেক পরে পরে এক-একখানা চোখে পড়ে।

বাড়ীর ছাদের উপর দুইটি যুবতী দাঁড়াইয়া। একটির বয়স বছর বাইশ-তেইশ হইবে, সীমন্তে চওড়া সিন্দূরের রেখা, গৌরবর্ণ কপালেও মস্তবড় একটি সিন্দুরের টীপ, পরিধানে একখানি পেঁয়াজী রঙের শাড়ী ও সেই রঙেরই একটি লেস্‌ভূষিত সেমিজ। চুল বেশ পরিপাটী করিয়া বাঁধা। গায়ে গহনা বেশী নাই।

আর একটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা ভানুমতী। কয়েকদিন হইল সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। শরীর তাহার আগের চেয়ে কিছু সারিয়াছে; মুখ চোখ কিন্তু আগেরই মত বিষণ্ণ, শ্রীহীন। অন্য যুবতীটি তাহার বড় বোন, কলিকাতাতেই ইহার বিবাহ হইয়াছে। অভাগিনী ভগিনীর আগমন-সংবাদে, কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া মাসখানিকের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া সেও বাপের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সঙ্গে আসিয়াছে তাহার একমাত্র শিশুকন্যা দুর্গা। তাহার আর্ত্তনাদে ব্যতিব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ সে বোনের কাছে আসিতে পারে নাই; এখন চাকরের সঙ্গে তাহাকে বেড়াইতে পাঠাইয়া সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বোনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভানুমতীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া শোভাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্‌ছিস্ ভাই?"

ভানুমতী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি আর ভাব্‌ব, মেজদি? আমার ত ভাল কথা ভাব্‌বার কিছু নেই! নিজের অদৃষ্টের ভাবনা ছাড়া আমার আর ভাবনা কি?"

শোভাবতী বলিল, "অত মন খারাপ ক'রে থাকিস্ না বোন্; ওতে পেটের ছেলের অনিষ্ট হয়। তোর যা হবার তা হয়েছে, এখন ছেলের

যাতে কোনো দিক্ দিয়ে খারাপ কিছু না হয়, তা তোকে দেখ্‌তে হবে। এমন কি, সেদিন যে খ্রীষ্টানী ধাত্রী মাগীর উপর অত রাগ কর্‌লি মাছ খেতে বলেছিল ব'লে, আমার মনে হয়, দরকার হ'লে তোর তাও খাওয়া উচিত।"

ভানুমতী ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ছি, ছি, কি বলিস্, মেজদি? কলকাতায় থেকে থেকে তুইও খ্রীষ্টান হ'য়ে গেছিস্ দেখ্‌ছি। আমি বিধবা, এমন অনাচার কর্‌লে আমার স্বর্গগত স্বামীর অপমান করা হবে না?"

শোভাবতী বলিল, "তা যা বলিস্ ভাই, অত আচারের খুঁতখুঁতি আমার নেই। যাদের ভালমন্দ আমাদের কাছে সবার বাড়া, তাদের জন্যে অনাচার করতেও আমি পেছুই না। অনাচার বড় না মানুষ বড়? এই ত সেবার ওঁর অসুখের সময় ডাক্তারে মুর্‌গী জুস্ ক'রে দিতে বললে; শাশুড়ী ত শুনে ঝাঁটা নিয়ে মার্‌তে এলেন। আমি লুকিয়ে কলের ঘরে ষ্টোভ জেলে ক'রে দিলুম। তাতে কি আমার খুব বেশী পাপ হয়েছে? আর হয়ে থাকে ত হয়েছে।"

ভানুমতী বলিল, "তুই স্বামীর জন্যে করেছিস্, তিনি খুসী হয়েছেন, এই তোর ঢের। হিন্দুর মেয়ের কাছে স্বামীর চেয়ে বড় ত আর কিছুই নেই! কিন্তু আমি যদি এখন মাছ-মাংস খাই, আমার স্বামীর আত্মা কি তাতে অসন্তুষ্ট হবে না?"

শোভাবতী বলিল, "কে বল্‌লে তোকে যে অসন্তুষ্ট হবে। সে কি চায় না যে তার বংশের একমাত্র দুলাল সুস্থ সবল হয়ে জন্মাক। তুই নিজের ঠিক-মত যত্ন না কর্‌লে ছেলে সুস্থ হবে না। মায়ের দুধ না পেলে তার গায়ে বল হবে কোথা থেকে? এসব ত ভেবে দেখতে হয়? না শুধু আচার নিয়ে থাক্‌বি, তারপর যা হয় হবে? শেষে কি দেখ্‌তে চাস্ যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল উদয়টাই জ্ঞানদার ঘরদোর দখল ক'রে বসেছে, আর দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে?"

ভানুমতীর দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি বেঁচে থাক্‌তে তা হ'তে দেব না। আর কেউ না জানুক, আমি জানি যে আমার স্বামীর মরার মূলে ঐ হতভাগা। সে যেন তাকে মারবার জন্যে ব্রত নিয়েছিল। রাত্রিদিন কেবল তাঁর অনিষ্টচিন্তা করেছে এক মনে, ওঁকে দেখলে সে যে কি ক'রে তাকাত, সে যদি দেখ্‌তে! ওঁর যা কিছু সবের ওপর মুখ-পোড়ার লোভ। তোকে বল্‌ব কি দিদি, আমারই বল্‌তে মুখে আস্‌ছে না, আমার উপর কুদৃষ্টি দিতেও সে ছাড়েনি। উনি আমাকে বারণই ক'রে দিয়েছিলেন একলা ওর সাম্‌নে যেতে।"

ভবানী তাদের পিছনে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্ আছেন দিদি, ভগবান্ আছেন। কার সাধ্য নিজে ঠিক থাক্‌লে সতীলক্ষ্মীর কোনো অনিষ্ট করে? এই নখে ক'রে তার গলা ছিঁড়ে ফেল্‌তুম না?"

শোভাবতী বলিল, "এখন ভালয় ভালয় ছেলেটি হয়ে যায় তবেই বাঁচি। শাশুড়ীকে অনেক ব'লে ক'য়ে ত রেখেছি, দেখি সে-সময় আস্‌তে দেয় কিনা। মা নেই আমাদের, বড় বোন না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে? অবিশ্যি ভবানী ত রয়েইছে; সে মায়ের চেয়ে কম কিছু করবে না। তবু আমি এলে তোর মনটা একটু ভাল থাকৃত। প্রথমবার মানুষ ভয়েই আধমরা হয়ে থাকে।"

ভবানী বলিল, "কিছু ভেবো না বাছা; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ ভানুর যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না। বাবু বল্‌ছিলেন খ্রীষ্টানী নার্স আন্‌বেন। আমি মুখের উপরই ব'লে দিলাম, 'কেন আমি কি কোন নার্সের চেয়ে কাজ কম জানি?' এই যে তোমরা এতগুলি ভাই বোন হ'লে জয়পুরে, ক'টা খ্রীষ্টানী এসেছিল তোমার মায়ের জন্যে।"

ভানুমতী বলিল, "সে কথা ঠিক ভাই, মেজদি। ভবানী যতটা প্রাণের টানে করবে, এমন কোনো মাইনে করা নার্স করবে না। তার উপর সব নার্সের ভাই, কাজ ভাল না। বড় যন্ত্রণাও দেয় এক-একটা। সেদিন ভাদুড়ীদের সেজ বৌ বল্‌লে এক নার্সের কাহিনী—"

এমন সময় দুর্গা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া জোটাতে শোভাবতী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। ভবানীরও নীচে কাজ ছিল, সে নামিয়া গেল। ছাদের উপর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল একাকিনী ভানুমতী।

দিনের বেলাটা তাহার এক রকম করিয়া কাটিয়া যাইত। শোভাবতী ও ভবানীর অবিশ্রাম চেষ্টায় সে একলা বসিয়া ভাবিবার বড় একটা অবসর পাইত না। নিতান্ত কার্য্যগতিকে শোভাবতীকে সরিয়া যাইতে হইলেও সে দুর্গাকে বোনের ঘাড়ে ফেলিয়া যাইত। মেয়েটি এমনই লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ অবতার যে তাহাকে সাম্‌লাইতে গিয়া তাহার মাসীর প্রায় নিজেরই নাম ভুলিয়া যাইবার অবস্থা হইত, তা সে-অবস্থায় চিন্তা করিবে কি। পাড়ার মেয়েরাও মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিত। কাজেই দিনের বেলাটা সঙ্গিনীর অভাব ভানুমতী'র প্রায়ই হইত না। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরটাও যেন আঁধারে ভরিয়া উঠিত। তাহার বিগত জীবনের সুখের স্মৃতি সার বাঁধিয়া তাহার চোখের সামনে ছায়া-চিত্রের মত নাচিতে আরম্ভ করিত। কাঁদিতেও তাহার ইচ্ছা হইত না। শোক যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিত, ইচ্ছা করিত কোনো রকমে এই আশাহীন দুর্ব্বহ জীবনকে শেষ করিয়া দেয়। বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার আর লাভ কি? সে যতটা পাইয়া হারাইল, এমন জগতে কয়টা মেয়ের অদৃষ্টে ঘটে? পাইবার যোগ্যতা তাহার কিছুই ছিল না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের চার মেয়ের এক মেয়ে সে; পিতা টাকাকড়ি কিছু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার পিছনে ঢালিয়া দিতে পারেন নাই। তবু ত সে রাজরাণী হইয়া শ্বশুরগৃহে পা দিয়াছিল! তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসায় বুক ফাটে নাই এমন মানুষ সেদিন কয়টা ছিল?

এই কথা মনে আসিলেই সর্ব্ব প্রথম তাহার মনে আসিত উদয়ের মুখ। এই লোকটি যেন তাহার অদৃষ্টাকাশে ধূমকেতুর মতই উদিত হইয়াছিল। তাহাকে দিয়া প্রমদারঞ্জনের বংশের কাহারও কোনো ভাল কোনো দিন হয় নাই, এবং হইবেও যে না, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। জ্ঞানদার

প্রতি তীব্র ঈর্ষ্যা তাহার প্রতি-কথায় কাজে এমনভাবে ফুটিয়া উঠিত যে, নিতান্ত জড়বুদ্ধিরও তাহা চোখে লাগিত। ভানুমতীর বিবাহের সময় অবশ্য ঘরের ছেলের দাবীতে সে অবাধে উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহার মনে যে কোনো কল্যাণ-ইচ্ছা নাই তাহা নববধূর নূতন চোখেও ধরা পড়িয়াছিল। তাহার পর ত সে স্বামীর কাছে সব কথা শুনিলই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য-অনিষ্টকামী এই দেবরটির প্রতি ভানুমতীর একটা তীব্র বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল।

উদয় একটু মুস্কিলেই পড়িয়াছিল। আগে জ্যাঠা-মহাশয়ের বাড়ীতে তাহার বিশেষ গতিবিধি ছিল না, তাহাকে কেহ যে ভাল চোখে দেখে না সেটা তাহার বিশেষরূপে জানা ছিল বলিয়াই। কিন্তু ভানুমতীর অপূর্ব সুন্দর মুখের যে একটা আকর্ষণ ছিল, সেটা এড়াইয়া চলিবার ক্ষমতা তাহার অসংযত মনের ছিল না। সুতরাং কারণে অকারণে সে যখন তখন আসিয়া জুটিত, এবং ভানুমতীর ঘরের সামনে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করিত। ভানুমতী অবশ্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিত না; এমন কি ঘর হইতে বাহিরও হইত না; তবু পরদার ফাঁকে যদি তাহাকে দুচারবার দেখা যায় তাহাতেই উদয় কৃতার্থ হইয়া যাইত। জ্ঞানদা ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে উদয়কে কিছু বলিতে পারিত না; কিন্তু রাগটা একেবারে হজমও করিতে পারিত না। তাহার ঝাঁঝ একটু-আধটু ভানুমতীকেই পোহাইতে হইত। ইহা লইয়া দু-চারিটি খণ্ডযুদ্ধও হইয়া যায়। সন্ধি করিতে অবশ্য বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু ভানুমতীর মনে উদয়ের প্রতি যে-গভীর ঘৃণা আর ক্রোধ জমা হইতেছিল, তাহার পরিচয় পাইলে উদয়ের উৎসাহ সম্ভবতঃ অনেক পরিমাণেই কমিয়া যাইত। ভানুমতী নিজের ইচ্ছায় এবং স্বামীর নিষেধে, কোনোদিনই উদয়ের সঙ্গে নিতান্ত বাধ্য না হইলে কথা বলিত না; বলিলেও দুই-চারিটার বেশী নয়; কাজেই উদয়ের গতিবিধি একই রকম চলিতেছিল।

ভবানী আসিয়া খবর দিল, "ওগো ভানু, শুন্‌ছ? তোমার গুণের দেওর যে তোমার খোঁজ নিতে কল্‌কাতা অবধি ধাওয়া ক'রে এসেছেন?"

ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, ভানুমতীও সেই রকম চমকিয়া উঠিল। এ কি তাহার চিন্তাই শেষে মূর্তি গ্রহণ করিয়া আসিল নাকি?

ভবানীর দিকে ফিরয়া সে বলিল, "বাবাকে বল্‌গে না, আমায় ব'লে কি হবে? হতভাগা এখানে এল কি কর্‌তে?"

ভবানী নাক সিঁট্‌কাইয়া বলিল, "কেন তা কি জানি? বাবুও তাকে মহা আদর ক'রে বসিয়ে কথাবার্তা কইছেন, সে ত একবার তোমাকেও দেখে যেতে চায়; কর্তামশায় নাকি তাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন।"

"বলেছেন না ছাই," বলিয়া ভানুমতী সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। মাথায় কাপড় ছিল না, সেটা বেশ দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিল।

নীচে ভানুমতীর পিতার শয়ন-কক্ষে বসিয়া উদয় তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিল। তাহাকে উত্তমরূপে জলযোগও করানো হইয়াছে যে, তাহার চিহ্ন ঘরে ঢুকিয়াই ভানুমতী পাইল। পিতার অতি-ভদ্রতায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। ইহাকে এত আদর দেখাইবার কি প্রয়োজন ছিল? শোভাবতীই সম্ভবতঃ জলখাবার গোছাইয়া দিয়াছে। তাহার সহিত খুব একপালা ঝগড়া করিবে বলিয়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল।

ভানুমতীকে দেখিয়া উদয় মহা ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গভীর ভক্তিভরে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল। পাছে সে পা ছুঁইয়া ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সাত হাত পিছাইয়া গিয়া ভানুমতী বলিল, "থাক্ থাক্, আপনি বসুন।"

উদয় বসিল। বসিয়া বলিল, "আপনার শরীর ত বিশেষ ভাল দেখছি না, বৌঠান। জ্যাঠামশায় ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, বল্‌লেন, চিঠিতে ত ঠিক খবর কিছু পাওয়া যায় না, উদয়। তুমি নিজে গিয়ে মাকে একবার দে'খে এসো।"

ভানুমতী মনে মনে বলিল, "জ্যাঠামশায় পাঠিয়েছেন না, তোমার মুণ্ডু।" মুখে বলিল, "না, আমার শরীর আগের চেয়ে ঢের ভাল আছে; শ্বশুরমশায়কে বল্‌বেন।"

ভানুমতীর পিতা মহেশবাবু বেহাইয়ের বদান্যতায় একেবারে গলিয়া গিয়া বলিলেন, "তা ত তিনি পাঠাবেনই বাবা; তিনি যেমন মানুষ, তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন। তাঁর ঘরে মেয়ে দিয়ে কি আমি কম অভয় পেয়েছিলুম? নিতান্ত বিধাতার বিধান। তা মায়ের আমার শরীর নিতান্ত খারাপ যাচ্ছে না ত। মোটের ওপর আগের চেয়ে ভালই আছে। তবে চেহারা আর ভাল কি দেখবে বল? তোমরা ওকে কি দেখেছ আর এখন কি দেখ্‌ছ।" এই বলিয়া তিনি ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ভানুমতীকে অতি উত্তমরূপে দেখিয়া লইয়া উদয় বলিল, "বসুন না বৌঠান, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" মহেশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওঁকে ডাক্তার-টাক্তার দেখান হয়েছে ত? প্রথমবার অনেক রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"

মহেশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, তেমন ভাল ডাক্তার ত দেখান হয়নি? পাড়াতেই একজন লেডী ডাক্তার আছেন, অনেককাল কাজ ক'রে তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই একদিন এসে দে'খে গেছেন। তাঁকেই ডাকব মনে করেছিলাম। তা তুমি যদি বল ত—"

উদয় মহা ব্যস্ত হইবার ভান করিয়া বলিল, "না, না, ও সব লেডী ডাক্তার-ফাক্তারের কর্ম্ম নয়। ওরা জানেই বা কি? ভাল দে'খে স্পেশালিষ্ট আন্‌তে হবে; ট্রেন্‌ড্‌ নার্স আনতে হবে। এখন থেকে সব ঠিক করা দরকার। আমার জানা বেশ ভাল লোক আছে, আপনি অনুমতি দেন ত আমি আজই গিয়ে সব ঠিক কর্‌তে পারি।"

মহেশবাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন, বলিলেন, "বেশ ত বাবা, তা হ'লে ত আমি বেঁচে যাই। গিন্নি নেই, কি ক'রে যে কি হবে ভগবান্‌ই

জানেন। তবু ভাল ডাক্তার, নার্স্ থাকলে অনেকটা ভরসা। তোমার জানা যদি ভাল বিচক্ষণ লোক থাকেন, তুমি তাঁদেরই ঠিক কর।"

উদয়ের আত্মীয়তা এবং পিতার ভদ্রতার আতিশয্যে ভানুমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এ হতভাগাকে কোথায় ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করা হইবে, না তাহাকে লইয়া যত ঘরের কথা! বুড়ো হইলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না যে বলে, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়। নিজের নিযুক্ত ডাক্তার ও নার্স্ যে উদয় কি মতলবে আনিতে চাহিতেছে, তাহাই বা কে জানে? কোনো শুভ ইচ্ছা কি তাহার মনে থাকা কখনও সম্ভব? যদিও উদয়ের সাম্নে বেশী কথা বলিবার তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দায়ে পড়িয়া সে বলিয়াই ফেলিল, "সে কি বাবা? মিসেস্ মিত্তিরকে কথা দিয়ে রাখা হয়েছে; এখন অন্য ডাক্তার কি ক'রে ঠিক করবেন? তাঁকে না জানিয়ে কিছুই করা চলে না।"

উদয় মুখ গম্ভীর করিল। মহেশবাবু টাকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "ও! তাই ত, তাই ত! আমার মনে ছিল না। এখন ত আর কাউকে বলা চলে না।"

পাছে তাহার আসন্ন মাতৃত্বের আলোচনা আরো বেশী উদয়ের সাম্নে হয়, এই ভয়ে ভানুমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়াই উদয়কে কোনো বিদায়-সম্ভাষণ করিল না। বাবা তাহার সহিত যত-খুসি আত্মীয়তা করুন, কিন্তু ভানুমতীকে সে ভুলাইতে পারিবে, একথা যেন স্বপ্নেও মনে না করে।

বাহিরে আসিয়াই সে ভবানীর খোঁজ করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। শোভাবতীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া দেখিল, সে পাশের বাড়ীর এক বৌএর সঙ্গে দিব্য জমাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। অগত্যা সে আবার ছাদেই ফিরিয়া গেল; উত্তেজনায় তাহার তখনও পা কাঁপিতেছিল, ছাদেরই এককোণে সে বসিয়া পড়িল, অনেকক্ষণ একলাই বসিয়া রহিল।

শোভাবতী তাহার খোঁজে আসিয়া বলিল, "ওমা, একলাটি অন্ধকারে কি কর্‌ছিস্ ব'সে ?"

ভানুমতী বলিল, "করব আর কি ? তোমরা যা ঘটা ক'রে অতিথি-সৎকার আরম্ভ করেছ, আমার ত দে'খে দুই চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেছে !"

শোভাবতী তাহার কথার ঝাঁঝে হাসিয়া বলিল, "তা যাই বলিস্, কুটুম ত ? একটু আদর-আপ্যায়ন না কর্‌লে তোর শ্বশুরই বা ভাব্‌বেন কি ? তিনিই পাঠিয়েছেন যখন ?"

ভানুমতী বলিল, "কক্ষনো তিনি পাঠান নি। ও মুখপোড়া মিছে কথা বল্‌ছে। তিনি আর ওকে চেনেন না ?"

ভবানী সিঁড়ি হইতে ডাকিয়া বলিল, "ওগো, শোভা, তোমার মেয়ে কেঁদে-কেটে অনর্থ কর্‌ছে, বাছা ! সে আর কারো হাতে খাবে না, ঘরময় ভাত ছিটচ্ছে।"

"আঃ, কি লক্ষ্মী মেয়েই হয়েছে আমার !" বলিয়া শোভাবতী নামিয়া গেল। ভবানী আসিয়া ভানুমতীর কাছে বসিল।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? তোকে খুঁজে খুঁজে ত হয়রান হয়ে গেলুম।"

ভবানী বলিল, "গিয়েছিলুম একটু নিজের কাজে। তোমার গুণধর দেওর কোথায় এসে উঠেছে, কি কর্‌তে এসেছে, সব খোঁজ নিয়ে এলুম।"

ভানুমতী বলিল, "আচ্ছা মেয়ে তুই বাপু। পুলিশে কাজ নিলেই পারিস্। অত খোঁজ কোথায় কার কাছে পেলি ?"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "আমরা রাজপুতের মেয়ে বাছা, বাঙালীর ভাত খাচ্ছি ব'লেই কি আর ঘরের কোণের বৌ হয়ে থাক্‌তে পারি ? দরকার হলে আমরা দশটা মরদকে মেরে শুইয়ে দিতে পারি।"

ভানুমতী বলিল, "কি খবর আন্‌লি তাই বল্ না !"

ভবানী বলিল, "রোস, এখনই কি আর সব জান্‌তে পেরেছি ? সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম, ছোঁড়া বেরিয়ে কোন্‌দিকে যায়, দেখবার জন্যে।

দেখ্‌লুম বেরিয়ে গাড়ীটাড়ী নিলে না, পায়ে হেঁটেই চল্‌ল। কাছেই কোথাও থাকে বুঝ্‌লুম। পেছন-পেছন খানিক দূর গেলুম, আন্দাজই করেছিলুম তোমার পিসশাশুড়ীর ওখানে উঠেছে। সঙ্গে হতভাগা নবাও এসেছে দেখ্‌লুম। যেমন গুণের মনিব, তার তেম্‌নি গুণের চাকর। আমায় দে'খে জিগগেস্ করলে, 'কিগো দিদি, ভাল আছ? এদিকে কোথায় চলেছ?' আমি বল্‌লুম, এই 'যাচ্ছি দু-পয়সার পান আন্‌তে। তোরা কবে এলি, কতদিন থাক্‌বি?' বল্‌লে, 'এসেছি ত কাল সবে, এখনও অনেকদিন থাকব, ছোটবাবু জরুরী কাজে এসেছেন।' ভাবলুম, দাঁড়াও, বুড়ী পিসী-ঠাক্‌রুণের সঙ্গে কোনগতিকে ভাব করতে হচ্ছে, তা না হলে হরদম এখানে যাওয়া আসা চল্‌বে কি ক'রে! ছোটবাবুর জরুরী কাজের খবর নিতে হবে ত?"

ভানুমতী উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আমি গোড়ার থেকেই জানি, লক্ষ্মীছাড়া মিছে কথা বল্‌ছে। শ্বশুরমহাশয় আমায় দেখতে পাঠিয়েছেন না আরো কিছু! নিজের কোন্ কুমৎলবে এসেছে কে জানে? বাবার কাছে এসে সে কি ঘটা আত্মীয়তার! সে নাকি ভাল ডাক্তার ঠিক ক'রে দেবে, নার্স্ ঠিক ক'রে দেবে। বাবাও যেমন মানুষ চেনেন না!"

ভবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দেখ বাছা, ভাল চাও ত ওসবের ধার দিয়ে যেয়ো না। তোমার একটা ভালমন্দ ঘটিয়ে দিতে পারলে ও ছোঁড়া ত এখন রাজার রাজত্বি পাবে। তারই চেষ্টায় আছে, ওকে কিছুতেই কোনো-কিছুর মধ্যে হাত দিতে দিও না। কোথা থেকে ডাক্তার আন্‌বে কে জানে? ঘুষ খেয়ে ডাক্তারেই কত জায়গায় কেলেঙ্কারী করেছে, তার ঠিকানা আছে? মেজদিদি আসে ভাল, নাহয় এই বুড়ী আর ধাই মিলে তোমার সব কাজ ক'রে দেব। দেখো এখন, একবিন্দু অযত্ন হবে না। আশা-ভরসা সব তোমার এই সন্তানের ওপর, কত সাবধানে এখন চল্‌তে হবে! দাঁড়াও না, দুদিনের মধ্যে সব খবর আমি নিচ্ছি। পিসী ঠাক্‌রুণ বোকা-সোকা মানুষ আছেন, তাঁর পেট থেকে কথা বার করতে বেশী দেরী হবে না।"

ভানুমতী বলিল, "তিনি আর কি জানেন, বুড়ো মানুষ। তাঁকে কি আর কিছু বলেছে?"

"অল্পস্বল্প কিছু ত জান্‌বে? বাকিটা আমি আঁচ ক'রে নিতে পার্‌ব।"

ভানুমতী বলিল, "দেখ্‌, তোকে আগের থেকে ব'লে রাখছি। তখন ত আমি থাক্‌ব শুয়ে প'ড়ে, যদি ঠাকুরপো ছেলে দেখতে আসে, কি কোলে নিতে চায়, কখনও দিবি না। তাতে যে যা ভাববার ভাব্‌বে। ওর চোখে বিষ আছে। অত বড় জলজ্যান্ত মানুষটাকে খেল।"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "ন্যাও বাছা, তুমি আর আমাকে শেখাতে এসো না। আমি তোমার চেয়ে মানুষ কম চিনি নাকি? যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা কর্‌তে আমি জানি। চল এখন নীচে, সন্ধ্যাটা ছাদে থাকা ভাল না।"

৪

দুপুর বেলা খাইয়া-দাইয়া উদয় বলিল, "ও পিসিমা, আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি; ফিরতে হয়ত রাত হবে। আমার জন্যে ব'সে থেকো না। ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দিও; নবা রাত্রে আমায় বেড়ে দেবে এখন।"

পিসিমা বৃদ্ধা হইয়াছেন, চোখেও ভাল দেখেন না, কানেও কিছু কম শোনেন। তিনি তখন হাঁড়ি, শিশি, বোতল প্রভৃতিতে মজুদ আচার চাট্‌নী প্রভৃতি বাহির করিয়া রোদে দিতে ব্যস্ত ছিলেন; উদয়ের কথায় উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি বল্‌লি, রাত্রে নবা ভাত রাঁধ্‌বে? কেন, আমি কি মন্দ রাঁধি তার চেয়ে? আজ মাছের ঝালটা কেমন স্বাদ হয়েছিল! বুড়ো এক থাল ভাত খেল শুধু তাই দিয়ে।"

উদয় হাসিয়া বলিল, "কি আপদ্‌! নবা রাঁধ্‌লেই হয়েছে আর কি! তা নয় গো, তা নয়," বলিয়া পিসীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার

করিয়া বলিল, "বল্‌ছি কি, যে, আমার আজ ফির্‌তে রাত হবে, ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো। নবা বেড়ে দেবে, তুমি আর আমার জন্যে ব'সে থেকো না।"

পিসীমা এবার শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "ও, তাই বল্‌। আচ্ছা তা রেখে দেব এখন। হ্যাঁরে, কাল যে বৌমাকে দেখতে গেলি, কেমন দে'খে এলি? সেই আস্‌বার পর একদিন গিয়েছিলুম, তারপর কাজের ধান্দায় আর যেতে পারিনি। শরীর কেমন আছে?"

উদয় বলিল, "বিশেষ ভাল ত কিছু দেখলুম না। আগের চেয়ে রোগা ঠেক্‌ল, রংও আগের চেয়ে ময়লা হয়ে গিয়েছে মনে হল।"

পিসীমা বলিলেন, "ও মা, তাই নাকি? তাহলে ত বেটা ছেলে হবে। আমার ভুবন যে বছর হল, সে বছর আমার রং কি হল, ঠিক যেন হাঁড়ির কালি। শরীর কেমন হল, ঠিক যেন সল্‌তেটি। আর ক্ষীরোর বেলা, এই মোটা হলুম! রং হল হর্ত্তেলের মত—"

পিসীমার রূপ-বর্ণনায় বাধা দিয়া উদয় বলিল, "হাঁ, ওতে নাকি কিছু বোঝা যায়, পিসীমা। আমি বলছি দেখো মেয়ে হবে!"

পিসীমার বড় ছেলে ভুবন ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে তাহার কথার শেষাংশটুকু শুনিতে পাইল। হাসিয়া বলিল, "তুমি ত তা বলবেই, মেয়ে হলে তোমার ত পোয়াবারো হে!"

উদয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "হাঁ, তুমিও যেমন। আমি কেবল সেই ভাবনাই ভাবছি আর কি? পরের টাকায় আমার অত লোভ নেই। এক, পেলে সবই পেতুম ত আলাদা কথা ছিল। ওসব ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই।"

ভুবন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "না, তা কি আর আছ? ছ'লাখ টাকা অমনি সহজ কথা কি না? তুমি যে কত বড় শুকদেব গোস্বামী তা ত আর আমার জানতে বাকী নেই। সারাক্ষণ বোধ হয় জপ করছ মনে মনে, বৌঠানের যেন মেয়ে হয়, বৌঠানের যেন মেয়ে হয়।"

উদয় বলিল, "তুমি মস্ত বড় thought reader হয়ে উঠেছ যে হে! আর কি জপ করছি, তাও জেনে ফেলেছ নাকি? তা হলে ত ভয়ের কথা!"

ভুবন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কি, কোনো চন্দ্রমুখীর মধুর নাম নাকি?"

উদয় বলিল, "হ্যাঁ, সেই নামটি যেটি তুমিও সব-চেয়ে জপ কর। আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম, ঢের কাজ প'ড়ে আছে।"

পিসীমা ইহাদের ঠাট্টা-তামাসা কিছুই শুনিতে পান নাই। নিজের শিশি-বোতল লইয়াই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, "ও বড় বৌমা, এখানে এসে একটু বসো না মা। বুড়ী মানুষ সব কাজ কি আমি একলাই করব, আর তোমরা পটের বিবি হয়ে ব'সে থাকবে? এই সকালের রান্নাটা ত একলাই প্রায় সারলুম।"

ঘোমটা-দেওয়া একটি বৌ তাড়াতাড়ি পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "এইখানটায় বসো বাছা, দেখো যেন চড়াইয়ে কি কাকে মুখ-টুক না দেয় আচারে। আমি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই গিয়ে?"

শাশুড়ী গড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বৌ প্রথমে বারান্দায় শানের উপরেই বসিয়া পড়িল। তারপর এধার ওধার চাহিয়া নিজের শয়নকক্ষ হইতে একটি ফুল-লতা-পাতা-চিত্রিত মাদুর বাহির করিয়া আনিয়া বিছাইল; একখানি বাংলা উপন্যাস আনিতেও ভুলিল না। তাহার পর আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া উপন্যাস-পাঠে মন দিল। মাথার কাপড়টা তাহার দেখিতে দেখিতে কখন খসিয়া পড়িয়া গেল।

এটি পিসীমার বড় ছেলে ভুবনের বৌ। মেজ ছেলে কাননেরও বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বৌ এখনও ঘর করিতে আসে নাই। বড় বৌএর নাম বিজনবালা, মুখখানি মন্দ নয়, চোখ দুটি বেশ বড় বড়, তবে নাকটি কিছু চাপা। রংটাও নিতান্ত বাঙালীর ঘরে যেমন হইয়া থাকে তাই। বাপের বাড়ীর লোকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শ্বশুরবাড়ীর লোকে বলে কালো।

উপন্যাস পড়া সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, এমন সময় কে একজন পিছন হইতে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। এ হাতের স্পর্শ ভুল করিবার নয়। বিজন ধড়মড় করিয়া উপন্যাস ফেলিয়া দিয়া, প্রাণপণে তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আঃ, কি কর তার ঠিক নেই ; এখন যদি মা বেরিয়ে আসেন ?"

ভুবন তাহার চোখ ছাড়িয়া দিয়া পাশে বসিয়া পড়িল। উপন্যাসখানা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "ওরে বাপরে! 'মাধবীকঙ্কণ'? তার চেয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারত নিয়ে পড় না? এর চেয়ে আধুনিক কিছু জোটাতে পারলে না ?"

বৌ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "আধুনিক বইয়েতে তোমাদের বাড়ী ছেয়ে রয়েছে কিনা! আজ সকালে ঠাকুরপোর ঘরে এইখানা দেখলুম, তাই নিয়ে এলুম। তা না হলে এখানে ত ছাপার অক্ষরের নামও দেখবার জো নেই।"

ভুবন কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল, "অ্যাঁ, উদয়ের ঘরে গিয়েছিলে কেন? এরই মধ্যে খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। তাই সে আমার মুখের উপর ব'লে গেল যে, রাত্রিদিন তোমার নাম জপ করে।"

বিজনবালা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "থাক্, থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। উদয়ের ঘরে যাইনি গো, গিয়েছিলুম তোমার সহোদর ভ্রাতা কাননের ঘরে। আর উদয় ঠাকুরপো যা আমার নাম জপ করে তা আমার জানাই আছে। অমন অপ্সরীর মতন বৌঠান ঘরের কাছে থাকতে আমার মত কাল-পেঁচার নাম জপ করতে যাবে কেন ?"

ভুবন তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "আহা, তোমার বড় আফশোষ হচ্ছে, না? বেচারা বৌঠান, সবাই মিলে কেবল তাকে হিংসাই করছে।"

বিজনবালা মুখ ছাড়াইয়া বলিল, "হিংসে আমি কিসের দুঃখে করতে যাব শুনি? তার রূপ আছে, তারই আছে। তুমি যদি অবিশ্যি তোমার

গুণধর মামাতো ভাইটির মত তার রূপের ধ্যান করতে বসতে ত আলাদা কথা ছিল। সত্যি, ঠাকুরপোর রকমসকম বুঝি না কিছু। এদিকে ত হিংসেয় বাঁচে না বেচারীর ছেলে হচ্ছে ব'লে, পারেন ত নখে ক'রে ছেঁড়েন। ওদিকে আবার টানও আছে বৌঠানের ওপর।"

ভুবন বলিল, "কি করে বল! মুস্কিলেই প'ড়ে গেছে। অতবড় জমিদারী হাতে আসতে-আসতে ফসকে গেল, এ কি কম আফশোষের কথা তার মত মানুষের কাছে? টাকার জন্যে ও নিজের বাপের গলায় ছুরী দিতে পারে, ভাইয়ের স্ত্রী ত চুলোয় যাক্। এখনও আশায় আশায় আছে যে জমিদারী গেলেও, নগদ ছয় লাখ তার হাতে আসতে পারে, যদি বৌঠান দয়া ক'রে ছেলের জন্ম না দিয়ে মেয়ের জন্ম দেন।"

বিজনবালা কৌতূহলে চোখ বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গো, মেয়ে হ'লে সে টাকা পাবে না?"

ভুবন বলিল, "না, সে এক মস্ত ইতিহাস, জান না? টাকাটা ছিল বড় মামার জ্যাঠামহাশয়ের। বুড়ো জমিদারীর ভার ছোট ভাইয়ের ওপর দিয়ে পাটের না কিসের ব্যবসা কর্‌ত। একেবারে টাকায় লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুড়োর ছেলে ছিল না, থাক্‌বার মধ্যে এক মেয়ে। সেই যে বিন্দুবাসিনী মাসী, মা এখনও যাঁর অত গল্প করেন। মেয়ের খুব ঘটা ক'রে বিয়ে দিয়েছিল বুড়ো, ঘর বর সব ভালরকম দে'খে। গহনাই দিয়েছিল মেয়েকে পঞ্চাশ হাজার টাকার; নগদে আর জিনিষ-পত্রে আরো পঞ্চাশ হাজার। জামাইটা ছিল পাজী, কিছুদিন পরেই জানা গেল যে, জুয়া খে'লে, মদ খেয়ে নগদ টাকা সবই সে খুইয়েছে; এখন গহনাগুলি নিয়ে বিক্রী করবার জন্যে স্ত্রীকে মারধর সুরু করেছে। বুড়ো গেল বিষম চ'টে, মেয়েকে নিয়ে আস্‌তে সেইদিনই লোক গিয়ে উপস্থিত। বড়মানুষ বেহাইকে চটাতে মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী সাহস কর্‌লে না; দিলে পাঠিয়ে। মেয়ের গায়ে তখনও কালো কালো দাগ, স্বামীর ছড়ির চিহ্ন। সেইদিন উকিল ডাকা হল, উইল হল। মেয়ের নামে কিছুই দিল না বুড়ো; নগদ টাকা যা ছিল সব

লিখে দিল বড়মামার নামে। মাসীর ছেলেপিলে হয়নি, হবারও সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই জমিদারী ত মামাদের হাতে এমনিই ফিরে এল। কিন্তু উইলে ব্যবস্থা রইল, বংশে কোথাও ছেলে থাক্‌তে মেয়েতে ও টাকা পাবে না। এখন বৌঠানের ছেলে হ'লে অবশ্য উদয় ভায়ার অদৃষ্টে জুটবে কাঁচকলা, তাদের নিজেদের অংশের জমিদারী ত বাপ-বেটায় মিলে দিব্যি ফুঁকে দিয়েছেন; এখন সংসার চালানই ভার। মেয়ে হলে ত নবাব হয়ে যাবে।"

বিজনবালা বলিল, "এইজন্যে সারাক্ষণ কেবল কর্‌ছে 'বৌঠানের মেয়ে হবে, বৌঠানের মেয়ে হবে'। ছেলে হলে বোধ হয় মাথা কুটে মর্‌বে।"

ভুবন বলিল, "পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে হলে বোধ হয় সাধু-সন্ন্যাসীকে টাকা দিয়ে যাগ-যজ্ঞ লাগিয়ে দিত, যদিই তারা ছেলেটাকে মেয়ে ক'রে দিতে পারে।"

স্বামীস্ত্রীতে তাহারা বারান্দার যে অংশে বসিয়া কথা বলিতেছিল তাহা সদর দরজার পাশেই। দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ ছিল না, ভেজান ছিল মাত্র। অনেকক্ষণ ধরিয়াই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তা সে ভাল করিয়া শুনিতে না পাইলেও, যা দুচার কথা শুনিতে পাইতেছিল তাহাতেই উত্তেজনায় তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিতেছিল। স্ত্রীলোকটি যে ভবানী তাহা বোধহয় না বলিয়া দিলেও চলে। সে পিসীমার সহিত আলাপ জমাইবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর ভিতর ঢুকিবার আগেই গলার স্বর কানে আসাতে, বাহিরে দাঁড়াইয়া গেল।

কিন্তু ভাল করিয়া ত সব কথা জানা দর্‌কার? এখান হইতে তা শুনিবার সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা সদর দরজার কড়াটা বেশ জোরে জোরে নাড়িয়া সে ডাকিয়া বলিল, "কে আছ গো? দোরটা একটু খুলে দিয়ে যাও।"

ভুবন একহাতে স্ত্রীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলে মাথা দিয়া, লম্বা হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া ছিল। কিছু দূরে মাতার

শয়নকক্ষ হইতে গভীর নাসিকাধ্বনির শব্দ তাহাদের জানাইয়া দিতেছিল যে, এখন ওদিক্ হইতে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই। হঠাৎ ভবানীর ডাকে ব্যস্ত হইয়া ভুবন একলাফে উঠিয়াই পড়িল, বৌও ঘোম্‌টাটা অত্যন্ত দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিয়া একাগ্র মনোযোগ সহকারে আচার চাট্‌নি হইতে মাছি তাড়াইতে বসিয়া গেল।

ভুবন দরজাটা টানিয়া খুলিয়া দিতেই ভবানী ভিতরে ঢুকিয়া আসিল। বিজনবালাকে দেখিয়া বলিল, "কি গো বৌমা, তোমার শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ঘুমিয়েছেন নাকি ?"

স্বামী উপস্থিত থাকাতে বিজনবালা কথার উত্তর না দিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, তাহার পূজনীয়া শাশুড়ী-ঠাকুরাণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বটে। ভবানী তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, "অন্য সময় ত ফুরসৎ পাই না। ভাবলুম এখন কাজকর্ম্ম নেই, একটু পিসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এক পাড়ায়ই থাকি, কিন্তু দেখাশোনা ত হয় না !"

ভবানীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভুবন সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। দুপুর বেলাটা ঘুমাইবারও জো নাই, তাহা হইলে শাশুড়ী উঠিয়া বকিয়া ভূত ছাড়াইবেন, সুতরাং জাগিয়াই যখন থাকিতে হইবে, এবং সব-চেয়ে প্রিয় সঙ্গীটিও অবস্থাগতিকে পলাতক, তখন গল্প করিবার একজন লোক পাইয়া বিজনবালা খুসীই হইল। মাথার কাপড় একটু খাটো করিয়া দিয়া বলিল, "হাঁ, মা একটু শুয়েছেন। তা তুমি বোসো না! তিনি উঠবেন এই একটু পরেই। দিদি কেমন আছেন ?"

ভবানী বলিল, "এখন ত মোটের ওপর ভালই। সবাই বলাকওয়াতে এখন দুধ ঘি ফলটল ভাল ক'রে খাচ্ছে। যা চেহারা হয়ে গিয়েছিল! এখন তবু গায়ে কিছু সেরেছে।"

বিজনবালা হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি ? তবে যে ওবাড়ীর ঠাকুরপো দে'খে এসে বল্‌লে চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে ? মা শুনে বল্‌লেন, তাহলে ঠিক ছেলে হবে। ঠাকুরপো বললে, না মেয়ে হবে।"

ভবানীর শুনিয়াই রাগে গা জ্বলিয়া গেল। সে বলিল, "ছোটবাবু সে কথা বল্‌বেই মা, যার স্বার্থ যেদিকে।"

বৌ বলিল, "ওমা, সবাই এ খবর জানে দেখছি, এক আমিই জান্‌তুম না। আজই শুন্‌লুম।"

ভবানীরও এ খবর ভালভাবে কিছু জানা ছিল না। সে কথা বাহির করার ইচ্ছায় বলিল, "ভাল ক'রে আর কি জানি মা? এম্‌নি খানিক খানিক জানি। তা ছোটবাবু নগদ টাকা যখন অত পাচ্ছে, তখন আর আমার বাছাকে অত হিংসে করে কেন? এমনিই ত পোড়াকপালীর যা অদৃষ্ট!" সে বাহির হইতে ছয় লাখ কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল। তাই আন্দাজে একটা ঢিল মারিয়া দিল।

বিজনবালা বলিল, "টাকা পাচ্ছে কিরকম? এখনি কি ঠিক হয়ে গেছে নাকি? মেয়ে হয় যদি দিদির, তবেই পাবে, ছেলে হলে ত আধপয়সাও পাবে না; তাই না কল্‌কাতায় এসে জুটেছে? দেশে বোধহয় আর টিক্‌তে পার্‌ল না! দিদির আর কত দেরি?"

ভবানী বলিল, "দেরি আর কি? মাস-দেড় বড় জোর হবে!"

বিজনবালা বলিল, "ঠাকুরপো তার আগে বোধহয় আর এখান থেকে নড়ছে না। যদি শ্বশুর-বাড়ী যায়, দিন-কয়েকের জন্যে মাঝে।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, বৌ ঘরে আনতে চায় না কেন, সোমত্ত বয়সের ছেলে? অতদিন যে ভাসুর শ্বশুর-বাড়ী কাটিয়ে এলুম তা দুবারের বেশী ত ছোটবাবুর বৌয়ের মুখ দেখিনি। চিরকালটা বাপের বাড়ীই থাক্‌বে নাকি বৌ?"

বিজন বলিল, "কে জানে বাছা, ঠাকুরপোর মতিগতি বুঝি না। বৌ দেখতে ভাল না ব'লে নাকি মনে ধরে না। এমন কথাও ত ভদ্দরলোকের ঘরে শুনিনি। বাঙালী গেরস্ত-ঘরের মেয়ে কি আবার পরীর মত দেখতে হয়? দিদির মত চেহারা কালেভদ্রে এক-আধটা দেখা যায়। এই ত আমরাও আছি কালো, তাই ব'লে কি আর আমাদের নিয়ে ঘর কর্‌ছে না?"

ভবানী বলিল, "কিসে আর কিসে, ধানে আর তুঁষে। তোমার সোয়ামী আর ঐ ছোটবাবু, এ কি এক কথা হ'ল? তোমাদের আপন লোক মা, তোমাদের কাছে বল্‌তে নেই, কিন্তু ছোটবাবুর রকমসকম ভাল না।"

বিজনবালা বলিল, "সে কথা সত্যি, ঝি। আমরা বৌ মানুষ, আমাদের ত আর বল্‌বার নেই কিছু, কিন্তু ওর চাল-চলন আমার কাছেও ভাল ঠেকে না।"

ভবানী বলিল, "ভাল হলে ত ভাল ঠেক্‌বে, মা? জামাই যতদিন বেঁচে ছিল, ভানুকে ওর সামনে সুদ্ধ যেতে মানা ক'রে দিয়েছিল। তা তোমার শাশুড়ী ত এখনও উঠলেন না দেখছি। আমি তবে এখন উঠি বাছা, তোমার আবার কাজ-কর্ম্ম আছে।"

বিজন বলিল, "না না বোসো, কাজ আর কি? ও-বেলার মাছ-তরকারি আজ ঢের আছে, দুটো আলুভাতে ভাত সেদ্ধ ক'রে নেওয়া বই ত নয়?"

ভবানী বলিল, "ওমা, সে বুড়ী রাঁধুনী মাগী পালিয়েছে বুঝি? নিজেদেরই এখন রাঁধতে হচ্ছে?"

বিজনবালা বলিল, "পালিয়েছে কি আজ? এখন আমিই হাঁড়ি ঠেল্‌ছি। কিছু বললে মা বলেন, আমার কি জমিদারী আছে না লাখ লাখ টাকা আছে, যে দশটা চাকর রাখব? তোমার বাপকে ব'লো রাঁধুনী রেখে দিতে।"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "সত্যি মা, তোমাদের দেশে মেয়েছেলের বড় খোয়ার। ছেলেও বাপ-মায়ের সন্তান যতখানি, মেয়েও তাই; কিন্তু মেয়ের অদৃষ্টে কিছুই জোটে না, তা লাখপতির মেয়েই হোক না কেন? তা না হলে তুমিই কি আর দশটা রাঁধুনী রাখতে পারতে না? তোমার ভাইরা রাখছে না?"

বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় প্রীত হইয়া বিজনবালা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "রাখছে না আবার? যেমন পোড়া দেশে জন্মেছি। তা দিদির

মেয়ে হ'লেও তার ভাবনা নেই! জমিদারী ত পাবে, টাকা না-হয় নাই গেল ?"

ভবানী বলিল, "এটাও অন্যায়, না বাছা? মেয়ে ব'লে লাখ লাখ টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে? ভগবান্ করুন যেন ছেলেই হয়! না, আমি উঠি, বেলা গেল।"

ভবানী উঠিয়াই পড়িল। বিজনবালা আচারের হাঁড়িকুড়ি তুলিয়া ভাঁড়ারে লইয়া চলিল।

৫

ভবানীর ফিরিতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। পিসীমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে ঠিক করিল ভানুমতীর সন্ধ্যার জলযোগের ফল মিষ্টি প্রভৃতি কিনিয়াই লইয়া যাইবে, কারণ বাড়ী গিয়া ফের আসিতে হইলে একেবারেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। অতএব বাড়ীর দিকে না গিয়া সে সোজা দোকানের দিকে চলিল।

বাড়ী ফিরিতেই ভানুমতী বলিল, "বাপ রে বাপ, গল্প পেলে আর তুই কিছু চাস্ না। আমাকে আজ খেতেও দিবি না নাকি ?"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "দিচ্ছি গো দিচ্ছি, তবু ভাল যে খাবার কথাটা মনে আছে। এমনিতে ত দশবার বললে একবার খেতে চাও না, আজ একটু দেরি হয়েছে কিনা, তাই।"

ভবানী তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার খাবার ঠিক করিয়া আনিল। ভানুমতী খাইতে বসিলে তাহার কাছে বসিয়া পিসীমার বাড়ী কি কি দেখিয়া এবং শুনিয়া আসিল, তাহারই বর্ণনা আরম্ভ করিল।

সব শুনিয়া ভানুমতী বলিল, "ওমা, তুই এ টাকার কথা জানতিস না? আমি কবে শুনেছি।"

ভবানী বলিল, "তোমরা না বললে আর জানব কোথা থেকে বাছা। ভগবান্ করুন, এখন ভালয় ভালয় একটি বেটা-ছেলে হয়ে যায় তাহলেই সব দিক্ রক্ষা হয়।"

ভানুমতী বলিল, "বেটা ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেই কি আর? তবে ছেলে হলে শ্বশুরের, স্বামীর বংশ থাকবে, মেয়ে হলে সেটা থাকবে না, এই যা।"

ভবানী রাগিয়া বলিল, "তোমার এক কথা! কেন, মেয়ে হলে ক্ষতিটা কম কি? ছয় লাখ টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে সেটা বুঝি কিছু না? আর যে চিরকাল তোমার দুষমনি করল, সেই চোখের সামনে ব'সে দুহাতে তোমার হক্কের ধন ওড়াবে, তা দেখতে পারবে?"

ভবানীর রাগে হাসিয়া ভানুমতী বলিল, "বাবাঃ, তোরা রাজপুতরা বড় হিংসুটে কিন্তু। যাকে দেখতে পারিস না, তার নামেই জ্ব'লে যাস। এইজন্যেই ইতিহাসে তোদের কথা এত লিখেছে।"

ভবানী বলিল, "তা বাছা, আমরা গরম দেশের মানুষ, আমাদের মেজাজ গরম। যে দুষমনি করে, আমরাও তার দুষমনিই করি; আর যে ভাল করে, দরকার হলে তার জন্যে জান্‌ও দিতে পারি। তোমার ঐ লক্ষ্মীছাড়া দেওর যদি টাকা পায়, তা হলে আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাবে। ভগবান্ কখনো এমন অন্যায় হতে দেবেন না।"

ভানুমতী বলিল, "ও কথা বলিস না রে! ভগবানের ন্যায়-অন্যায় মানুষে বোঝে না। তা না হলে আমার দেবতার মত স্বামী চ'লে গেল।" সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

ভবানী নীচে নামিয়া গেল, যদিই রান্নাঘরের দিকে কোনো কাজ থাকে। সে দুই দণ্ড বসিয়া থাকিতে পারিত না, নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ হইয়া গেলে অন্যের কাজ কাড়িয়া লইয়া করিতে বসিত। এইজন্য বাড়ীর অন্য ঝি-চাকরেরা তাহাকে বেশ খানিকটা খাতির করিয়া চলিত, যদিও তাহার চড়া মেজাজ এবং কট্‌কটে কথার জন্য আড়ালে সবাই তাহার নিন্দা করিতেও

ছাড়িত না। শোভার মেয়ে দুর্গার কল্যাণে এই ক'দিন অবশ্য তাহার সময় কাটাইবার উপায়ের বিশেষ অভাব ছিল না।

নীচে গিয়া ভবানী দেখিল, রান্নাঘরের কাজ একরকম হইয়াই গিয়াছে, দুর্গাও নিতান্ত লক্ষ্মী মেয়ের মতন মায়ের পাশে বসিয়া ইন্‌জিন গাড়ী লইয়া খেলিতেছে। তাহাকে লইয়া এখনই যে পাগলের মত দিক্‌বিদিকে ছুটাছুটি করিতে হইবে, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অগত্যা ভবানী ঘর হইতে একরাশ কাপড়, সূতা ও ছুঁচ কাঁচি প্রভৃতি বাহির করিয়া অনিল, এবং রান্নাঘরের দরজার কাছে বসিয়া একখানা অর্দ্ধসমাপ্ত ছোট কাঁথা লইয়া দ্রুতগতিতে সেলাই করিতে স্নুরু করিল।

শোভাবতী বলিল, "বুড়ো হয়েছিস্ কে বল্‌বে? চোখের ত দিব্যি তেজ আছে। রাত্রেই সেলাই কর্‌ছিস্? আমি ত পারি না।"

ভবানী বলিল, "আমি নামেই বুড়ী বাছা। বয়সই হয়েছে, শরীরের ত ক্ষয় হয়নি? সেই চোদ্দ বছর বয়সে রাঁড় হয়েছি, স্বামীর ঘরও কর্‌তে হয়নি, ছেলেপিলে মানুষও কর্‌তে হয়নি। কাজেই গতরে শক্তি আছে।"

বাহিরের দরজার কড়াটা সজোরে বাজিয়া উঠিল। ভবানী সেলাই ফেলিয়া সেইদিকে চলিল। দরজা খুলিয়াই দেখিল, উদয় দাঁড়াইয়া। সঙ্গে তাহার আর একটি কে ভদ্রলোক, ভবানী তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

অভ্যাগতদ্বয়কে ভিতরে আহ্বান করিবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া ভবানী বলিল, "কাকে চান?"

উদয় জিজ্ঞাসা করিল, "মহেশবাবু বাড়ী নেই?"

ভবানী বলিল, "বাবু এখনও বেড়িয়ে ফেরেন নি।"

উদয় বলিল, "আচ্ছা, তা, বৌঠানকে খবর দাও। এলাম যখন, একটু দেখা ক'রে যাই।"

ভবানী অম্লানবদনে বলিল, "ও মা, ভানুও ত বাড়ী নেই! মেজ দিদিমণির সঙ্গে আজ তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে একটু ঘুরে আস্‌তে গেছে।"

উদয় চৌকাঠের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভবানীর অভ্যর্থনার আতিশয্যে অগত্যা আবার বাহির হইয়া গেল। ভবানী দরজাটা ভেজাইয়া দিল। খিল লাগাইয়া আসিবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় শুনিল উদয় তাহার সঙ্গীটিকে বলিতেছে, "বৌঠানরূপ গোলাপ ফুলটির চারপাশে এই যে কাঁটার বেড়াটি, একে পার হওয়া শক্ত। ইচ্ছা করে এক থাপ্পড় দিতে, কি মুরুব্বিআনা চাল !"

বন্ধু বলিল, "হ্যাঁ, রূপসী কৈকেয়ীর সঙ্গে বাপের বাড়ীর ঝি কুঁজী মন্থরা ত থাক্‌বেই। বেটীর চেহারা দেখনা, যেন ফৌজের সেপাই। কে বল্‌বে মেয়েমানুষ ? তোমায় বোধহয় তুলে আছাড় দিতে পারে।"

ভবানী দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান্‌ দিন দেন ত দেখিয়ে দেব যে সত্যিই তুলে আছাড় দিতে পারি। নচ্ছার, হতভাগা ছোঁড়া, মুখের ওপর বল্‌তে সাহস হয় না ? দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আমাকে শোনান হ'ল ! তোর বাড়াভাতে ছাই না দিই ত আমি রাজপুতের বেটী নয়।"

সে ফিরিয়া আসিয়া আবার সেলাই লইয়া বসিল। সময় আর বেশী নাই, অথচ কাজ প্রায় সবই পড়িয়া আছে। ভানুমতী নিজে কিছুই করে না ; তাহার যা মনের অবস্থা, তাহাকে জোর করিয়া কিছু বলাও চলে না। শোভাবতী দুদিনের জন্য আসিয়াছে, তাহার উপর দুর্গা তাহাকে সারাক্ষণই এত ব্যস্ত করিয়া রাখে যে, তাহার দ্বারা আর কিছু হইবার জো-টি নাই। ভানুমতীর মা থাকিলে কথা ছিল না, তিনি না থাকাতে মায়ের সব কর্ত্তব্যই প্রায় ভবানীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এ ভার লইয়াছে, সুতরাং ইহা লইয়া কাহারও সহিত ঝগড়া চলে না।

কাঁথাখানা প্রায় শেষ করিয়া তবে ভবানী উঠিল। ভানুমতীকে খাওয়াইতে হইবে, তাহার বিছানা করিতে হইবে। কর্ত্তার খাওয়ারও সব ব্যবস্থা সে না করিয়া দিলে চলিবে না। রাঁধুনীটা নূতন, সে গুছাইয়া কোনো কাজ করিতে জানে না। ভবানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে

বলিল, "বুড়ী মরলে এদের কি হবে কে জানে? ভানু ত কুটো ভেঙে দুখান করতে পারে না, সে করবে ছেলে মানুষ! তার ওপর রাজ্যের যত দুষ্‌মণ তার পেছনে। যাক্‌, যতদিন আমি আছি কোনো বেটার সাধ্যি নেই তার চুলের আগা ছোঁয়। তার একখানা হাড়ও আস্ত রাখব না আমি।" উদয়ের উদ্দেশ্যে যতরকম গালাগালি তাহার জানা ছিল, সব ক'টা বর্ষণ করিতে করিতে সে আপনার কাজে চলিয়া গেল।

দিনগুলা একটার পর একটা, প্রায় একই ভাবে কাটিয়া চলিল। ভানুমতী শুইয়া, বসিয়া, বোনের সঙ্গে গল্প করিয়া, দুর্গাকে লইয়া খেলিয়া কোনোরকমে সময় কাটায়। ভবানী দিনরাত কাজে ব্যস্ত, সুবিধা পাইলেই পিসীমার বাড়ী গিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর সঙ্গে চীৎকার করিয়া খানিক গল্প করিয়া আসে। তিনি অনবসর থাকিলে বিজনের সঙ্গেই গল্প করে। বুড়ীর কাছে উদয়ের প্রশংসা করে আর বৌয়ের কাছে প্রাণ খুলিয়া তাহার নিন্দা করে। তবে এমন সময় দেখিয়া যায়, যাহাতে উদয়ের সামনে না পড়িতে হয়। উদয় সেই যে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভবানীকে গাল দিয়া বিদায় হইয়াছিল, তাহার পর আর মহেশবাবুর বাড়ীর ছায়া মাড়ায় নাই। মহেশবাবুর প্রতি তাহার বিরাগ বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু ভবানী এখন খোলাখুলিভাবে শত্রুপক্ষে দাঁড়ানোতে, তাহার যে আর গিয়াও কোনো লাভ নাই তাহা সে বুঝিয়াই লইয়াছিল। মাঝে-মাঝে আপশোষ করিয়া ভাবিত, "ধুত্তোর, রাগের মাথায় সেদিন বুড়ী বেটীকে না চটালেই পারতাম।"

আর এক জায়গায় ভবানীকে প্রায়ই দেখা যাইত, কিন্তু তাহার খবর সে ভানুমতী বা শোভাবতীকে দিত না। লেডী ডাক্তার মিসেস্ মিত্র সন্ধ্যার পর বড়-একটা আর কাজে বাহির হইতেন না। তাঁহার বয়সও হইয়া পড়িয়াছিল কিছু বেশী, টাকা-কড়িরও বেশী-কিছু অভাব ছিল না। কাজেই সহজে নিজের আরামের ব্যাঘাত তিনি ঘটিতে দিতেন না। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িতেন, দাসী বসন্ত

তাঁহার গা হাত-পা টিপিয়া দিত। বসন্তকুমারী ছাড়াও বাড়ীতে আর-একটি ঝি ছিল, সে রান্নাঘরের কাজ করিত। বাহিরের কাজ তিনি কোচম্যান সহিসের দ্বারাই করাইয়া লইতেন, বাড়ীতে চাকর রাখা পছন্দ করিতেন না।

বসন্ত এবং মিসেস্ মিত্র দুইজনের সঙ্গেই ভবানী খুব ভাব জমাইয়া লইয়াছিল। তাহার নানারকম গল্প এবং আদবকায়দাদুরস্ত কথায় লেডী-ডাক্তার খুসী ছিলেন। বসন্ত খুসী ছিল অন্য কারণে। মনিবটি কিছু কড়া এবং হিসাবী হওয়াতে, তাহারা পান দোক্তা, সুগন্ধি তেল, সাবান, প্রভৃতির খরচ চালানো মাঝে-মাঝে মুস্কিল হইয়া উঠিত। ভবানীর বদান্যতায় আজকাল তাহার কপাল ফিরিয়াছিল। এ-সব সে চাহিলেই পাইত, এমন কি ভবানী তাহাকে কথা দিয়া রাখিয়াছিল যে ভানুমতীর যদি ছেলে হয় তাহা হইলে বসন্তকে একখানা গরদের শাড়ী ত দিবেই, হয়ত বেনারসীও দিতে পারে।

বসন্ত বলিত, "দিদি, তোমার ভাই বরাত-জোর আছে, খাসা মনিব পেয়েছ। কে বল্‌বে তুমি বাড়ীর ঝি। যেন তোমারই ঘর-সংসার। টাকা-পয়সা যত খুসী খরচ, কর, কোনোদিন তোমায় না বলে না। আর দশা দেখ আমার। কাজ ভারী নয় বটে, কিন্তু একটি পয়সা নাড়বার জো নেই, মাগী তখুনি ধ'রে ফেলে। ছেলে না পিলে। কার জন্যে পয়সা জমাচ্ছে জানি না। একখানা ভাল কাপড় সুদ্ধ কিনে পরে না, হাতে ত এসে ইস্তিক দেখছি ঐ মরা সোনার বালা দুগাছি। বাক্সেও নেই কিছু। কোথাও যদি যেতে হ'ল, ত, বার করলেও সেই সেকেলে এক লালপেড়ে গরদ, দে'খে দে'খে চোখ প'চে গেল।"

ভবানী বলিত, "আমার ভানু বেঁচে থাক্। কোনোদিন আমায় ওরা ঝিয়ের চোখে কি দেখেছে? জামাই সুদ্ধ কখনো একটি কড়া কথা কোনোদিন বলেনি। পোড়াকপাল আমাদের বাছা, তাই অমন ছেলে অকালে বেঘোরে মারা গেল।"

বসন্ত একদিন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা দিদি, ওরা তোমায় মাইনে দেয় কত ক'রে? খাওয়া-পরা, ধোপা, সব খরচই ত দিচ্ছে?"

ভবানী হাসিয়া বলিল, "মাইনে আর কে আমায় দেবে লো? সংসারই ত আমার হাতে! ভানু মাসে মাসে যে দেড় হাজার ক'রে টাকা পায়, তার কি একটা সে আঙ্গুল দিয়ে ছোঁয়? বাবু এসে আমার কাছে দেন, আমি আবার বাবুর হাতে দিয়ে ব্যাঙ্কে জমা পাঠাই। যা দু-দশ টাকা খরচ লাগে, আমিই করি, কোনোদিন সে খোঁজও নেয় না। শ্বশুরবাড়ী যখন ছিল, জামাই মাসে মাসে তাকে একশ' টাকা ক'রে হাতখরচা দিত। তাও কি মেয়ে কখনও নিজের হাতে নাড়াচাড়া করেছে? আমিই তার কাপড়-চোপড় করাতুম, যখন যা দরকার কিনেকেটে আন্‌তুম। আমার হাতে মানুষ কিনা, মা মাসীর মতই আমায় মানে, ঝি ব'লে ত কোনোদিন অমান্য করেনি।"

বসন্ত বলিল, "বেশ আছ তুমি দিদি। দেড় হাজার টাকা আমরা কখনও এক সঙ্গে চোখেও দেখিনি।"

ভবানী উঠিয়া পড়িল। বলিল, "যাই ভাই এখন। আর এরপর ত এত ঘন ঘন আস্‌তে পারব না? এতদিন মেজদিদি ছিল, ভানুকে ফে'লে আস্‌তে পার্‌তুম যখন তখন। তা কাল সে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাচ্ছে, এখন আর কার কাছে রেখে আসব? তা তুই যাস্ মাঝে মাঝে।"

শোভাবতী তাহার পরদিনই চলিয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী হইতে জোর তলব আসিয়াছিল। শাশুড়ীর কাজ চলে না বৌ ঘরে না থাকিলে, এবং শাশুড়ীর ছেলেরও মন ভাল থাকে না। কাজেই একজন প্রকাশ্যে এবং আর একজন গোপনে নিজের নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে বড় উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়াছিল। অগত্যা শোভাবতীকে শ্বশুরবাড়ী ফিরিতে হইল। ভবানীকে বলিয়া গেল, "সময়মত খবর দিস্। যেমন ক'রে পারি আসব।"

ভানুমতী বলিল, "তোর স্বামী বড় স্বার্থপর মেজদি, নিজের অসুবিধাটুকুই দেখল। আজ না হয় কাল, তুই ত যেতিসই, কিন্তু আমার কথাটা একটু সে

ভেবে দেখল না। আমার ত সারাজীবন একলাই কাটাতে হবে, তবু তুই ছিলি, গল্পগাছা ক'রে দুদণ্ড নিজের পোড়া কপালের কথা ভুলে থাকতুম, এখন সারাদিন একলা ব'সে কি ক'রে সময় কাটবে?"

শোভাবতী মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "কি করব ভাই, মেয়েমানুষের জীবন পরাধীন, হুকুম তামিল না ক'রে ত উপায় নেই? নইলে তোকে এই অবস্থায় একলা ফে'লে আমি কখনও যাই? পুরুষ-মানুষে কি আর আমাদের মানুষ ভাবে? আমরা কেবল তাদের আরাম-সুবিধার জন্মে আছি। আমাদেরও যে কিছু দরকার থাকতে পারে তা তাদের মাথায়ই আসে না। খাওয়া-পরা আর থাকবার জায়গা জুটলেই মেয়েমানুষের ঢের হ'ল, তার আবার কিসের দরকার? যাই হোক, খবর পেলে আমি যেমন ক'রে পারি চ'লে আসব। শাশুড়ী তখন আর না করতে পারবে না।"

শোভাবতীর গাড়ী চলিয়া গেল। ভানুমতী চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। ভবানীকে বলিল, "কি ছাই-ভস্ম সব সেলাই করছিলি, আমায় কিছু কিছু দে না? হাঁ ক'রে সারাদিন ব'সে থেকে থেকে আমি এইবার পাগল হয়ে যাব। মাগো, একটা দিনও যে আমার আর কাটতে চায় না। এখনও সারাজীবন প'ড়ে রয়েছে।"

ভবানী তাহাকে কতকগুলি সেলাই আনিয়া দিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, "এই, ছেলেটি হয়ে গেলেই অনেকটা ভাল লাগবে, দেখো এখন। একটা নাড়বার চাড়বার জিনিষ হলেই সময় হু হু ক'রে কোথা দিয়ে চ'লে যাবে।"

দিন দশ বারো কাটিয়া গেল। হঠাৎ মাঝরাত্রে ভানুমতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ভবানীকে ঠেলিয়া ডাক দিল, "ও ভবানী, ভবানী ওঠ, আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে।"

ভবানী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঝট্ করিয়া খাড়া হইয়া বসিল। আলো জ্বালিয়া ব্যস্ত হইয়া ভানুমতীর কাছে আসিয়া তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চলিল, উত্তর দিবার অবকাশও তাহাকে দিল না।

ভানুমতী বলিল, "অতশত আমি জানি না বাপু, তুই বাবাকে খবর দে, তিনি মিসেস্ মিত্তিরকে ডেকে পাঠান। মাগী ক'ষে গাল দেবে এখন আমাকে, মাঝরাত্রে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম।"

ভবানী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, গাল দেবে না আর কিছু! টাকাগুলি গুনে নেবার বেলা কিছু কম নেবে নাকি? ঐ হ'ল ওদের কাজ, অত রাত-বিরাত বাছতে গেলে ওদের চলে নাকি? ধাইয়ের কাজ ক'রে ক'রে বুড়ী ত হয়ে গেল!"

ভানুমতী ভীত কণ্ঠে বলিল, "বড় ভয় কর্‌ছে কিন্তু রে! মেজদিটা বলেছিল খবর দিলে আস্‌বে। এতরাত্রে এখন তাকে কে খবর দেয়?"

ভবানী তখন ডাকাডাকি করিয়া বাবুর ঘুম ভাঙাইতে ব্যস্ত ছিল, সে ভানুমতীর কথার কোনো উত্তর দিল না। মহেশবাবুকে তুলিয়া দিয়া নীচে চলিল রঘুয়া চাকরের সন্ধানে। ভানুমতী ভয়ে, আশায়, উৎকণ্ঠায় ঘরময় ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এই বাড়ীটির অন্ততঃ সকলের ঘুম ছুটিয়া গেল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল, রান্নাঘরের উনানে আগুন পড়িল। মিসেস্ মিত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া পড়িলেন, পিছনে তাঁহার ব্যাগ হাতে শ্রীমতী বসন্ত।

মহেশ তাঁহাকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, নমস্কার করিয়া বলিলেন, "এই যে, আসুন আসুন, বড় ভাবনায়ই পড়েছি। ভানু উপরের ঘরে রয়েছে। আর কাউকে খবর দেবার দরকার আছে কি? কোনো ডাক্তার কি নার্স?"

মিসেস্ মিত্র তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিছু দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার মেয়ের বয়স ঠিক, স্বাস্থ্যও মোটের ওপর ভালই; আমি ত কোনো বিপদের আশঙ্কা করি না।"

ভবানীর সঙ্গে তিনি উপরের ঘরে চলিলেন, ব্যাগ হাতে বসন্তও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মহেশবাবু তাঁহাদের পিছন পিছন আসিতে আসিতে বলিলেন, "ও ভবানী, ভানুর পিসশাশুড়ী ঠাকরুণের বাড়ী একবার খবর

দিলে হ'ত না? হাজার হোক, তারা নিজের লোক, খবর দেওয়াটা উচিত।"

ভবানী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না বাবু না, এখন ওসবে দরকার নেই। এতরাত্রে কেউ আসবেও না, কাল সকালে খবর দিলেই চল্‌বে। মেজদিদির বাড়ী সকালে যাবে রঘুয়া, সেই সঙ্গে ওবাড়ীতেও ব'লে আস্‌বে এখন।" তাহার ভয় ছিল পাছে সংবাদ পাইয়াই উদয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কিছু অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে।

মিসেস্ মিত্র হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভানুর মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "ভয় পেয়ে গিয়েছ দেখি, মা লক্ষ্মী। কিছু ভাবনা নেই। এ তো আর অসুখ বিসুখ নয়, সাধারণ জিনিষ, ঘরে ঘরেই হচ্ছে।"

ভানুমতীও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মাঝরাত্রে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, খুব অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয় আপনার?"

লেডী ডাক্তার আর একপালা আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের অসুবিধা মা? আমাদেই কাজই হ'ল এই। বাচ্চারা কি আর আমার টাইম্ দেখে আসবে, তারা নিজের টাইমেই আসবে। শীতকাল হ'লে একটু অসুবিধা হয়ে বটে, না হ'লে আর কি? এই ত দিন-দুই আগে একটা কেস ক'রে এলুম মাঝ রাতে। সে বেটী বড় ভুগিয়েছে। তাকে শেষ অবধি—" তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে হওয়ায় থামিয়া গেলেন। বসন্তকে বলিলেন, "নে নে, চট্ ক'রে সব গোছগাছ ক'রে নে, সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভবানীকে জিগ্‌গেস কর্‌-না কোথায় কি আছে। ঘরখানা একবার ফিনাইল জলে ধুয়ে নিলে হয়; তা এত রাত্রে কি সুবিধা হবে?"

ভবানী বলিল, "কেন হবে না মা? যা যা দরকার তুমি বল, এখনি সব করাচ্ছি। বাঘের দুধ দরকার হয় মেয়ের জন্যে, তাও এনে দেব। তোমার উপরই ভরসা মা, দেখো আমার বাছার যেন কোনো বিপদ্‌-আপদ্ না হয়।"

মিসেস মিত্র বলিলেন, "বিপদ্ হবে কিসের দুঃখে? নিজের মুখে নিজের কথা বলতে নেই বাছা, কিন্তু এই পঁচিশ বছর প্র্যাক্‌টিশ করছি, কখনও একটি কেস বিগড়ায়নি আমার হাতে। তবে প্রথমবার একটু টাইম নিতে পারে এই যা। তাতে ঘাবড়াবার কি আছে?"

বাকি রাতটুকু দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। রঘুয়া খবর লইয়া শোভাবতীর শ্বশুরবাড়ী গেল। ফিরিয়া আসিল একলাই। ভবানী ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, মেজদিদি এল না?"

রঘুয়া বলিল, "না, বুড়ী মাইজির বড্ড অসুখ, তাঁকে ফে'লে আসতে পারল না। আবার বিকেলে খবর দিতে বলেছে, জামাইবাবুও আসবেন বিকেলে খবর নিতে।"

"তবে ত কেতাত্থ হলুম," বলিয়া ভবানী রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দু-মিনিট বাদে ফিরিয়া আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমার বাড়ী গিয়েছিলি?"

রঘুয়া জানাইল যে সে গিয়াছিল। মাইজি অল্প পরেই আসিবেন। সমস্ত দিনটা আশায় উৎকণ্ঠায় একরকম কাটিয়া গেল। মহেশবাবু কন্যার মমতায় তাহার ঘর হইতে বেশী দূরে যাইতেও পারিতেছিলেন না, আবার তাহার কাতরানিতে ঘরের কাছে টিঁকিতেও পারিতেছিলেন না, পাগলের মত কেবল এ-ঘর ও-ঘর উপর নীচ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভবানী একলাই দশটা মানুষের কাজ করিতেছিল, এবং সবাইকে বকিয়া ভূত ছাড়াইতেছিল। পিসীমা আসিয়া একবার দেখিয়া গিয়াছেন, শোভাবতী আসিতে পারে নাই। মাথার দিব্যি দিয়া তাহাকে কখন কি হয় খবর দিতে বলিয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা মিসেস মিত্র ও বসন্ত বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া আসিলেন। ভবানীকে চুপি চুপি বলিলেন, "রাতটাও নেবে হয়ত বাছা, এখানেই আমার বিছানা ক'রে দাও।"

রাত একটা প্রায় হইবে। আঁতুড় ঘরের স্ত্রীলোক-ক'টি ছাড়া সবাই শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই সময় ধাত্রী ঝি সকলে ব্যস্ত হইয়া

উঠিল। মিসেস মিত্র বলিলেন, "যাক্, শীগ্‌গির হয়ে গেলেই ভাল, কষ্টে মেয়েটার আর জ্ঞান নেই। ভয় পেয়ো না বাছা, ভয়ের কিছু নেই।"

হঠাৎ শিশুর ক্ষীণ ক্রন্দন শোনা গেল। ভবানী ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, তাহার পর মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "হায় ভগবান্, শেষে মেয়েই হ'ল!"

লেডী ডাক্তার ভবানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও কি বাছা! মেয়েছেলে কি সন্তান নয়? সবে জন্ম নিয়েছে, তাকে দে'খে ওরকম করতে আছে? এই বেঁচে থাক্, দেখো মায়ের কত আদরের ধন হবে। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখ, ঠিক যেন গোলাপের কুঁড়িটি।"

ভবানী বলিল, "সে কি বুঝি না মা? ছেলের চেয়ে মেয়ে কম কিসে? আর যদি পাঁচটা হবার আশা থাকত ভানুর, তা হ'লে একে ত মাথায় ক'রে নিতুম। কিন্তু এই যে সব মা, আর ত হবে না! ভানুর যে সর্বস্ব যাবে, তার চারদিকে শত্রু, এখন তারা ত আরো পেয়ে বসবে। লাখ লাখ টাকা যাবে তাদের হাতে, তখন তারা কি আর এদের আস্ত রাখবে? পথের কাঁটা দূর করবার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগবে। এতদিন যে কিছু করতে পারেনি, হাতে পয়সা ছিল না ব'লেই না? হে ভগবান্, এ কি করলে?"

মিসেস মিত্র সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "কি আর করবে বাছা, এখন ওঠ, মেয়েকে দেখ। যা হয়ে গেছে তার ত চারা নেই, এ ত মানুষের হাত না?"

ভবানী হঠাৎ তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই মা, তুমি ইচ্ছা করলে এর বিহিত করতে পার একটা। যা চাও তুমি তাই দেব।"

লেডী ডাক্তার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি কি করব গা? আমি ত আর বিধাতা নই যে মেয়েকে ছেলে ক'রে দেব? এখন ছাড়, পোয়াতিকে দেখি, তার এখনও হুঁস হয়নি ভাল ক'রে। ও বসন্ত, নে নে, শীগ্‌গিরি ক'রে তোর কাজ সেরে নে।"

ভবানী বলিল, "ওর এখন হুঁস হয়ে কাজ নেই মা, আমি যা বলছি শোন। তোমার কোন পাপ হবে না মা, যা হবার আমারই হবে। তোমায় হাজার টাকা দেব, দু হাজার চাও, দুহাজার দেব। এ মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও, তোমার বাড়িতে দু দিনের যে খোকাটি রয়েছে, মা মরা, তাকে এখানে দিয়ে যাও। আমরা তিন প্রাণী ছাড়া কেউ জানবে না, সব দিক্ রক্ষে হবে। সেও কায়স্থের ঘরের ছেলে, কোনো অন্যায় হবে না। এ মেয়েকে তুমি রাখ মা ; পাল্‌তে যত টাকা লাগে, আমি দেব।"

মিসেস মিত্র গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "তুমি বল কি বাছা! এমন কথা বাপের জন্মে শুনিনি। শেষে কি বুড়ো বয়সে জেল খাটব ?"

ভবানী বলিল, "কে তোমায় জেলে দিচ্ছে মা ? জান্‌বে কে ? বাড়ীর সকলে ত মড়ার মত ঘুমচ্ছে, ভানুরও জ্ঞান হয় নি। জান্‌বার মধ্যে তুমি, আমি আর বসন্ত। তা ও বেটীকে ঠাণ্ডা রাখবার ভারও আমি নিলুম। দোহাই মা তোমার, অমত ক'রো না। তোমায় হাজার টাকা এখুনি গুনে দিচ্ছি। বসন্তকে দুশ' দিচ্ছি।"

বসন্ত এতক্ষণ ভানুমতীকে লইয়া ব্যস্ত ছিল ; সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার মনিবের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "নিয়ে নাও মা, নিয়ে নাও। এক বছরেও তোমার এত রোজগার হবে না। আর আমার কথা যদি বল, আমায় চারটুকরো ক'রে কাট্‌লেও একথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। গিয়ে নিয়ে আস্‌ব খোকাটাকে ?"

মিসেস্ মিত্রের মনে তখন ধর্ম্মবুদ্ধি এবং লোভের প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ভবানী দেখিল সময় বহিয়া যায়, ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া লোহার সিন্ধুক খুলিয়া তাড়া তাড়া নোট বাহির করিয়া আনিল। এবার টাকা আর সে ব্যাঙ্কে পাঠায় নাই, প্রসবের সময় যদিই প্রয়োজন হয়, বলিয়া ঘরেই দুই হাজার টাকা জমা করিয়া রাখিয়াছিল। মিসেস মিত্রের হাতে হাজার টাকার নোট গুণিয়া দিয়া বলিল, "এই

নাও মা, আরো চাও আরো গিয়ে কাল দিয়ে আস্‌ব।" বসন্তের হাতেও দু'শ টাকার নোট গিয়া পড়িল।

গরীব লোকের মেয়ে সে, এত টাকা কখনও একসঙ্গে হাতে পায় নাই। পাছে ইহা হাত-ছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। নিজের কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইতে লইতে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হেই মা, অমত ক'রো না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। যাই খোকাকে নিয়ে আসি—"

লেডী ডাক্তার মাথা হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। বসন্ত দরজা খুলিয়া তীরের মত বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভবানী সদ্যোজাতা শিশুটিকে লইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া এই কঠোরহৃদয়া প্রৌঢ়ারও চোখ বারবার জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। রাজার নন্দিনী হইয়া যে জন্মিল, তাহাকে আজ স্বার্থের খাতিরে সে কোথায় নির্ব্বাসিত করিতেছে? কিন্তু ভানুর স্বার্থ তাহাকে দেখিতে হইবে, এবং উদয়ের খোঁতা মুখ ভোঁতা করিতে হইবে। পাপ যাহা হইবার হউক, ভগবান্‌ বা মানুষে তাহাকে যে শাস্তি বিধান করুক, সে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। রাজপুতের মেয়ে ভয়ে কখনও পিছায় না।

মিসেস্‌ মিত্র ভানুকে ঔষধ দিতে দিতে বলিলেন, "রাঁধুনী মাগীকে ভোর না হতেই কোনো গতিকে বিদায় কর্‌তে হবে। তাকেই রেখে এসেছি কিনা বাড়ীতে, তা সে কুম্ভকর্ণের বেটী এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে বাড়ী ফাটাচ্ছে। এখন কিছু জান্‌বে না, কিন্তু পরে খোকার জায়গায় খুকী দেখলে নানা কথা তুলতে পারে। মাইনে পায়নি একমাসের ব'লে, যাব যাবও করছে। দেখ ত, বসন্ত এল বুঝি?"

বসন্ত যেমন দ্রুতগতিতে গিয়াছিল তেমনি দ্রুতগতিতে ফিরিয়াছে। সদর দরজা খোলার সামান্য শব্দটুকু শোনা যাইতে না যাইতে সে আসিয়া উপরের তলায় উপস্থিত হইল। কোলে তাহার কম্বলে জড়ানো শিশুটি।

মিসেস্ মিত্র ঝট্ করিয়া ছেলেটিকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া ভবানীকে বলিলেন, "কি জামা টামা তোমরা শেলাই করেছ বাছা, গোটা-দুই দাও ওকে। আর বসন্ত, মেয়ে নিয়ে তুই এখুনি বেরো, তোকে এখন আর আস্তে হবে না। পথে বেরিয়েই গাড়ী করবি, বাছার যেন ঠাণ্ডা কিছুতে না লাগে। বাড়ী গিয়ে ওকে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুইয়ে রাখবি, রাঁধুনী মাগী ভোরে উঠতেই তাকে গাল মন্দ দিয়ে খুব একটা ধুম ঝগড়া বাধিয়ে দিবি। আমি গিয়েই তাকে বিদায় করব। খুকীর কাছে তাকে যেতেও দিস্ না, তাহ'লে দশ কথার সৃষ্টি করবে। যা, বেরো এখন শীগগির।"

বসন্ত শিশুকন্যাটিকে উত্তমরূপে কম্বল ও কাঁথায় জড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। খোকাকে নূতন জামা, মোজা প্রভৃতি পরাইতে পরাইতে ভবানী বলিল, "ছেলে দেখতে ত মন্দ না. তবে রং [illegible]

লেডী [illegible] বলিলেন, "বেটা ছেলে, রং নিয়ে কি হবে? তবু খুব কালোও না। বাঙালীর ঘরে যেমন হয় মাঝামাঝি, তাই হয়েছে। ওমা, মা লক্ষ্মী যে চোখ খুলে তাকাচ্ছ দেখি! দেখ, দেখ, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে! ভবানী, এদিকে নিয়ে এস, আলোর কাছে। এই দেখ মা।"

ভানুমতী শিশুর দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভবানী খুব খুসী হয়েছিস্, না? ও কি কাঁদ্‌ছিস্ নাকি? এখন আর কাঁদ্‌বার কি?"

ভবানী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না মা, আর কাঁদ্‌ব না! আহা, আজ জামাই বেঁচে থাক্‌লে!"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "ওসব কথা এখন আর কেন গো? যে গেছে সে ত গেছেই, এখন যে এল তাকে নিয়ে আনন্দ কর। কই শাঁখ টাঁখ বাজাও, বাড়ীর লোক ত এখন অবধি জান্‌লই না।"

ঘোর রোলে পাড়া কাঁপাইয়া শাঁখ বাজিয়া উঠিল। মহেশবাবু বিছান ছাড়িয়া আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিলেন। "কি হল ভবানী, কি হল; মা আমার ভাল ত?"

ভবানী খোকাকে তাঁহার সামনে তুলিয়া ধরিয়া বিজয়ের হাসি হাসিয়া বলিল, "খোকা হয়েছে বাবু, আপনার বাড়ী রাজা এসেছে। কই গিনি বার করুন।"

দুই আঙুল দিয়া শিশুকে একটু আদর করিয়া মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "গিনি ত দুহাতে ক'রে ও ছড়াবে ভবানী, গরীব দাদামশায় আর ওকে একটা গিনি দিয়ে কি করবে? তবু নিয়ম মেনে চলা ভাল, এই নাও দাদামণি," বলিয়া তিনি শিশুর গোলাপী মুঠির মধ্যে দুটি গিনি ঢুকাইয়া দিলেন। খোকা হওয়ার আশায় তিনি গিনি পকেটে করিয়াই শুইতে গিয়াছিলেন। ভানুমতীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা আমার ভাল আছে ত?"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "দিব্যি আছে, ওর সেরে উঠতে কিছু দেরী হবে [illegible]—আচ্ছা. আমায় তাহ'লে একটা গাড়ী ডেকে দিন, এখনও রাত রয়েছে, সঙ্গে একটা লোক [illegible] ওষুধ [illegible] গেলাম, এক দাগ খাইয়ে দিয়েছি, তিন ঘণ্টা পরে আর এক দাগ। সকালেই আমি এসে পড়ব এখন। ভবানী ত রইল, ও প্রায় ধাত্রীর কাজ আমার সমানই জানে; মা লক্ষ্মীর কোনো অসুবিধা হবে না।"

বাড়ীর ঝি চাকর সবাই শাঁখের শব্দে উঠিয়া পড়িয়াছিল, দরজার কাছে তখন রীতিমত ভীড়। সবাই খোকা দেখিতে ব্যস্ত। রঘুয়া গাড়ী ডাকিতে চলিল। মহেশবাবু মিসেস্ মিত্রকে বলিলেন, "আপনার 'ফি'টা?"

মিসেস্ মিত্রের হ্যাণ্ডব্যাগটি তখন প্রায় পেট ফাটিয়া মরিতেছে। তিনি সেটিকে হাতে করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আহা, সে হবে এখন। তার জন্যে তাড়া কিসের? আমি ত এখনো দশ-বারো দিন আসব। আচ্ছা, আসি এখন। আপনার চাকরটা একটু চলুক তবে আমার সঙ্গে।" মহেশ-বাবুও লেডী ডাক্তারের সঙ্গে নামিয়া গেলেন।

পুবের আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিল। তারপর ফিকা গোলাপী, তারপর ডগ্‌ডগে সিঁদুরে লাল। রাস্তাটা সজীব হইয়া উঠিল।

ঘোড়ার গাড়ী চলিল, ফেরিওয়ালার ডাক শোনা গেল। এ বাড়ীর সকলে মাঝরাতে জাগিয়া এখন ঘুমে ক্লান্ত হইয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে লাগিল। ভবানী সকলকে কাজে লাগাইয়া দিল, তাড়াহুড়া দিয়া। রাঁধুনী বলিল, "তোমার মুখ-চোখ যা হয়েছে দিদি, আয়নায় দেখ গিয়ে। সব ধকল যেন তোমাকেই পোয়াতে হয়েছে।"

ভবানী বলিল, "নে নে, উনুনে আঁচ দিগে যা। আমার ভাবনা ভাবতে হবে না। এখুনি হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জল দিতে হবে।"

হঠাৎ সদর দরজার সামনে হর্ণের শব্দ করিয়া প্রকাণ্ড এক মোটরকার আসিয়া থামিল। গাড়ীর দরজা খুলিয়া এক লাফে বাহির হইয়া আসিল উদয়, তাহার পিছন পিছন একজন ইংরেজবেশধারী ব্যক্তি ও একটি কালো মেমসাহেব। দুজনেরই হাতে ব্যাগ।

কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া উদয় এক ধাক্কায় সদর দরজা খুলিয়া সকলকে লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই আসিয়াছিল যে, কাহারও পরোয়া সে আজ করিবে না। সিঁড়ির মুখের কাছে আসিতেই মহেশবাবুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এস বাবা এস, এঁরা কে?"

উদয় পরম গম্ভীর মুখে বলিল, "ইনি এখানকার একজন খুব বড় midwiferyর specialist, আর ইনি নার্স। জ্যাঠামশায় টেলিগ্রাম করেছেন এঁদের যেন বৌঠানের জন্যে রাখা হয়। কাল আমার খবর পেতে বড় দেরি হ'ল, তা না হ'লে কালই আসতাম। বৌঠান কোথায়, এখনও কি খুব কষ্ট পাচ্ছেন?"

মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না বাবা, এখন ভালই আছে। ভালয় ভালয় কাল রাত্রেই তার ছেলেটি হয়ে গেছে, খুব বেশী কষ্ট পায়নি। ধাত্রী যিনি ছিলেন, তিনি খুব বিচক্ষণ মানুষ, কোনো বিপদ্ হয়নি তাঁর হাতে। এস-না, খোকাকে দেখবে?"

খোকাকে দেখিতে উদয়ের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। তাহার মুখে একেবারে যেন কে কালি মাড়িয়া দিল। কি করিবে তাহাই যেন সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। হতবুদ্ধির মত সিঁড়ির মুখেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে এক ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া বাঙালী সাহেবটি বলিল, "We had better get a move on. Our services are not required, it seems." কালো মেমসাহেবটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপর হইতে ভবানী জলন্ত দৃষ্টিতে ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল। উদয় যখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইহাদের লইয়া ফিরিয়া চলিল, তখন সে মনে মনে বলিল, "যাক, তোর এ মুখ যে দেখতে পেলাম, সেও আমার এক সান্ত্বনা। পাপ যা করবার তা ত করলুমই।"

সমস্ত দিন ধরিয়া খোকার দরবার চলিতে লাগিল। বুড়ী পিসীমা আসিলেন, বিজনবালা আসিল, বাড়ীর ছেলেরাও আসিল। এমন কি শোভাবতী সুদ্ধ আসিয়া জুটিল, শাশুড়ীর অসুখ এবং গালাগালি উপেক্ষা করিয়া। ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল, "দেখি দেখি, আমাদের রাজপুত্তুরকে। ও মা, ভানুর রং মোটেই পায়নি। কি যে ছাই আমাদের ছেলেমেয়েগুলো হচ্ছে, সব কালো। তা বেটা-ছেলে, ওর কিছু ব'য়ে যাবে না। আমার মেয়েটারই বিয়ে দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে। ভবানী, খোকার জন্যে এই ফ্রক, টুপী আর মোজা এনেছি, উঠিয়ে রাখ। টুপী একটু বড়ই হবে বোধ হচ্ছে।"

ভবানী বলিল, "তা হোক, ও কি আর এইটুকুই থাকবে নাকি? বড় হয়ে পরবে। তোমার শাশুড়ী কেমন আছে?"

শোভাবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আছে একরকম ভালই, তবু কাউকে বাড়ী থেকে নড়তে দেবে না। তাকে না ব'লেই একরকম পালিয়ে এসেছি. গিয়ে গাল খাব এখন!"

খোকা চারিদিকের আনন্দ-কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে লাগিল। দুপুরের দিকে তাহার দর্শনপ্রার্থীর দলও কমিয়া আসিল।

মিসেস্ মিত্র স্নানাহার সারিয়া, একমুখ পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া দর্শন দিলেন। ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি? বড় যে শুক্‌নো দেখাচ্ছে! পো-পোয়াতি ভাল ত?"

ভবানী বলিল, "ভালই আছে মা। এতক্ষণ লোকজনের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই নি।" তারপর ফিশফিশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুকী কেমন আছে?"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "দিব্যি ঘুমচ্ছে। বেশ ষ্ট্রং বাচ্চা, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। গিয়েই রাঁধুনী মাগীকে বিদায় করেছি, এরপর আর কাকপক্ষীও জান্‌বে না। চল এখন রুগীকে দেখি।"

রোগিণী ভালই ছিল, তাহাকে বেশী কিছু দেখিতে হইল না। খানিকক্ষণ গল্পসল্প করিয়া লেডী ডাক্তার বিদায় লইতে উঠিলেন। ভবানী তাঁহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "বাকি টাকাও নিয়ে যাও মা, দেনা-পাওনা শীগগির শীগগির চুকিয়ে নেওয়া ভাল।" বলিয়া সে টাকা বাহির করিতে লাগিল।

মিসেস্ মিত্র ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা দাও বাছা, মেয়েটার জন্যে নিলুম। তা না হলে আমি আর পাপের বোঝা বাড়াতুম না। আমি ত বড়মানুষ নই, একটা বাচ্চা ভালো ক'রে মানুষ কর্‌তে খরচ কত!"

ভবানী কাঁদিতেছিল, বলিল, "রাগে আর লোভে প'ড়ে মহাপাপ করেছি মা, রাজার মেয়েকে পথে বসিয়েছি। তার যাতে কোনোদিক্ দিয়ে কষ্ট না হয়, তুমি দেখো। টাকার জন্যে ভেবো না, যত টাকা লাগে আমি যেমন ক'রে পারি জুটিয়ে দেব।"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "আর বাছা, কেঁদে কি হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে। অযত্ন অনাদর কিছুই হবে না, যতদিন আমি বেঁচে আছি। তারপর ভগবানের ইচ্ছা।" তিনি টাকা লইয়া বিদায় হইয়া গেলেন।

ভানুমতী ভবানীকে ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁরে, সবাই চ'লে গেল নাকি? মেজদি কোথায়, ডাক না একটু গল্প করি।"

ভবানী বলিল, "বেশী কথা তোমার এখন না বলাই ভাল বাছা। আচ্ছা, দিচ্ছি ডেকে শোভাকে।"

শোভাবতী আসিতেই ভানু বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, খোকার কি নাম হবে ভাই? খুব সুন্দর দে'খে একটা নাম বল না?"

শোভাবতী বলিল, "রোস্, একটু ভেবে তো বল্‌তে হবে? তোর শ্বশুরবাড়ীর ধাঁচের নাম রাখবি নাকি?"

ভানুমতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, ও-সব মেয়েলি নাম, আমার একটুও ভাল লাগে না। ছেলের নাম হবে ঠিক ছেলের মতো। বড় হয়ে যেন লোকের কাছে নাম বলতে লজ্জা না হয়।"

শোভাবতী বলিল, "তবে ঘটোৎকচ কি বীরবাহু এই-রকম একটা রাখ্ কিছু? মেঘনাদও রাখতে পারিস্ ইচ্ছা করলে। ছেলের যা গলা হয়েছে, নামটা দিব্যি মানাবে।"

ভানুমতী বলিল, "যা যা, সব-তাতে চালাকি! কেন, শুনতে সুন্দর অথচ বেশ ছেলের মত নাম ভূভারতে নেই নাকি? আচ্ছা বেশ, বীরবাহু না হোক, আমার ছেলের নাম রইল সুবীর।"

শোভাবতী বলিল, "বেশ ত, মন্দ কি? তা বীরপুরুষ যে ভয়ানক চেঁচাচ্ছে, ওকে একটু ঠাণ্ডা কর্।"

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। খবর পাইয়া প্রমদারঞ্জন রোগজীর্ণ শরীর টানিয়া কোনোগতিকে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি আক্‌বরী মোহরের মালা দিয়া শিশুর মুখ দেখিয়া, তাহাকে কোলে লইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে জল চক্ চক্ করিতে লাগিল। খানিক পরে সুবীরকে ভবানীর কোলে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেহাই মশায়, আপনার পরামর্শই ঠিক। বৌমা খোকাকে নিয়ে কিছুকাল এখন এখানেই থাকুন। ছোট ছেলে, কখন কি দরকার হয়; মফঃস্বলে, সহর হলেও সব জিনিষ সব সময় পাওয়া যায় না। যত্ন-আদরের কোনো ত্রুটিই এখানে হবে না,

তা জানি। আর টাকা যখন দরকার, আমাকে জানালেই তার পরদিন পাবেন।"

মহেশবাবু বলিলেন, "আর ক'টা দিন থেকে যান না? খোকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক, ভাল ক'রে?"

প্রমদাবাবু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর মায়ার বন্ধনে জড়াব না নিজেকে। খোকা বেঁচে থাক, ভাল থাক, দূর থেকেই তাকে আশীর্ব্বাদ করব। উদয় আসে-টাসে এদিকে?"

মহেশবাবু বলিলেন, "কই, না। খোকা যেদিন হ'ল সেদিন একবার এসেছিল ডাক্তার আর নার্স নিয়ে। তখন আর দরকার নেই শুনে চ'লে গেল, ছেলেকে দে'খেও যায়নি।"

উদয়ের জ্যাঠামশায় বলিলেন, "ছ'লাখ টাকা হাতছাড়া হওয়ার দুঃখটা খুবই লেগেছে দেখছি। যেমন বাপ তার তেমন বেটা। সারদা আর ঐ লক্ষ্মীছাড়া মিলে যদি যত বদ্ খেয়াল ক'রে নিজেদের জমিদারীর অংশটা না খোয়াত তাহলে [illegible] আর ছোঁড়াকে পরের টাকার প্রত্যাশায় হাঁ ক'রে থাকতে হ'ত না। এককালে বাজে খরচ আমরাও কি না ক'রেছি; কিন্তু সময়ে সাম্‌লেও গেছি।"

মাসখানিক কাটিয়া গেল। ভানুমতী আজকাল বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। খোকার জন্য নিত্য নূতন গহনা আর পোষাকের ফরমাস করিয়া বাড়ীসুদ্ধ লোককে সে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহেশবাবুর কোনো পছন্দই নাই বলিয়া তিনি মেয়ের কাছে ক্রমাগত বকুনি খাইতেছেন। ভবানী গাল খাইতেছে অন্য কারণে। বুড়ো বয়সে তাহার নাকি ভীমরতি হইয়াছে, সে কেবল টাকা জমাইবার চেষ্টা করে। খোকার সিল্কের জামা যদি প্রতি মাসেই ছোট হয়, এবং প্রতি মাসেই করাইতে হয় তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার কি মাসে দশ-বিশ টাকা পোষাকে খরচ করিবার যোগ্যতা নাই? টাকাকড়ির ভার ইহার পর ভানুকে নিজের হাতেই লইতে হইবে দেখা যাইতেছে। ভবানী হাসে, কথা বলে না!

একদিন সন্ধ্যার পর ভবানী কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিল। ভানুমতী বলিল, "কোথায় গিয়েছিলি? ছেলেটা ভারি চেঁচাচ্ছে, কিছুতেই তাকে রাখতে পারছি না।"

ভবানী বলিল, "তোমার ধাত্রী যে চল্‌ল গো, তাই একটু তার ওখানে গিয়েছিলুম, দেখা করতে।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছে সে? আর আস্‌বে না?"

ভবানী বলিল, "আর আস্‌বে না বোধহয়। বলে, বুড়ো ত হলুম, আর কতকাল খাট্‌ব? ছেলেপিলেও কিছু নেই। কে তার এক পিসী মরেছে, ওর নামে এক বাড়ী রেখে গেছে গিরিধিতে, সেইখানে গিয়ে থাক্‌বে বল্‌লে।"

ভানুমতী বলিল, "ও মা, আমার সঙ্গে আর দেখাই হ'ল না তবে? বেশ মানুষটা, ঠিক মায়ের মত ক'রে আমায় যত্ন করেছে। খোকার ভাতে তাকে সোনার হার দেব ঠিক করেছিলুম, ভাল বেনারসী শাড়ী দেব।"

ভবানী বিষণ্ণমুখে বলিল, "টাকা পাঠিয়ে দিও মা, তারা সেখান থেকেই খোকাকে আশীর্ব্বাদ করবে। সেই [illegible] তাকেও কিছু দিও, [illegible] খুব যত্ন ক'রে তোমার কাজ করেছে।"

ভানুমতী বলিল, "তা দেব বৈ কি, সকলকেই দেব। তোকে ত খোকা বিয়েই করবে, কাজেই সব-চেয়ে বেশী লাভ তোর।"

ভবানী হাসিবার চেষ্টা করিল, তারপর ভানুর অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল।

৭

উগ্রী নদীটি নামে নদী হইলেও তাহাতে গরমের সময় জল দেখা যায় না। বালির চড়া প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে, মাঝে কেবল সরু রূপার হারের মত একটি ক্ষীণ জলস্রোত ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। গিরিধির বারগণ্ডা পল্লীর যত মানুষ রোদ পড়িতে-না-পড়িতে এই নদীটির

ধারে আসিয়া জোটে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আসে স্বাস্থ্যের খাতিরে বায়ু সেবন করিতে, যুবক-যুবতী বালক-বালিকারা আসে ফুর্তি করিতে। ছোট জলস্রোতটির মধ্যে নামিয়া পড়িয়া, জলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া একটা মস্ত আমোদ।

তিন-চারিটি বালক-বালিকা সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে নদীতে নামিয়া মহা কোলাহল সহকারে খেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের শ্যামবর্ণ কচি কচি হাত-পা-গুলি জলের মধ্যে প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইতেছিল। পরস্পরের গায়ে জল আর ভিজা বালি ছুঁড়িয়া মারা ছিল তাহাদের খেলার প্রধান অঙ্গ। বালক-দুইটি একেবারে বেপরোয়া হইয়া খেলায় মাতিয়াছিল। বালিকা-দুইটি খেলায় যোগ দিলেও যাহাতে কাপড়-চোপড় একেবারে না ভিজিয়া যায়, এবং মাথায় চুলের চেয়ে বালির পরিমাণ বেশী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবারও একটু একটু চেষ্টা করিতেছিল।

সান্ধ্য সূর্য্যালোক যখন ক্রমে নিভিয়া আসিল, বালির চর, জল ও দুইতীরের গাছপালার উপর হইতে রক্তাভ আলো মুছিয়া গিয়া ক্রমে কালিমার অবগুণ্ঠন নামিয়া আসিতে লাগিল, তখন চরের উপর উপবিষ্ট একটি তরুণী ডাকিয়া বলিল, "লীলা, বেলা, শীগ্‌গির উঠে এস জল থেকে। একেবারে আঁধার হয়ে এল, এরপর বাড়ী গিয়ে তোমাদের মায়ের কাছে বকুনি খাবে।"

ছোট মেয়ে--দুটি শাড়ীর প্রান্ত হইতে জল নিঙ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া, চুল ঝাড়িয়া জল হইতে উঠিবার জোগাড় দেখিতে লাগিল। ছেলে-দুটি উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না, দ্বিগুণ উৎসাহে মস্ত বড় বড় বালির গোলা পাকাইয়া সকলের গায়ে ছুঁড়িতে লাগিল। সব-ছোট মেয়েটি তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে কাঁদ কাঁদ গলায় বলিয়া উঠিল, "মাসীমা, দেখ, পঙ্কু একেবারে আমার চোখ কাণা ক'রে দিচ্ছে, বারণ করলেও শোনে না।"

যে যুবতীটি তাহাদের জল হইতে উঠিবার জন্য ডাক দিতেছিল, সে এইবার সঙ্গিনীর সঙ্গে গল্প ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। জলের ধারে আসিয়া ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া বলিল, "উঠে আয়, ভিজে একেবারে ভূত হয়ে গেছিস যে! পঞ্চু, তুমি ওর চোখে বালি দিয়েছ কেন?"

পঞ্চু বলিল, "ও আসে কেন ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে? ঘরে ব'সে পুতুল খেল্‌লেই পারে! ছিঁচ্‌কাদুনী খুকী। কই, বেলা ত কাঁদ্‌ছে না?"

যুবতী একটু হাসিয়া মেয়েটিকে টান দিয়া জল হইতে উঠাইয়া লইয়া চলিল। বড় মেয়েটি নিজেই উঠিয়া কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া তাহাদের সঙ্গ লইল।

যে যুবতীটি এতক্ষণ একলাই বালির উপর বসিয়া ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল, "চল্‌লি নাকি, কৃষ্ণা? তাহলে আমিও উঠি।"

কৃষ্ণা বলিল, "তোর এত সাত তাড়াতাড়ি উঠবার কি দরকার? আমি এগুলোকে বাড়ী পৌছে আবার আস্‌ছি। এই ত সবে সন্ধ্যে হ'ল, এরই মধ্যে ঘরে ঢুকে কি করবি? আর ত ক'টা দিন মাত্র ছুটির বাকী আছে, একটু গল্প-সল্প ক'রে নেওয়া যাক, এরপর ত আবার ঘানিতে জুত্‌তে হবেই নিজেদের।"

অন্য মেয়েটি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "তা চল্‌, বরং তোদের বাড়ীর সাম্‌নেই ঘোরা যাবে। এখানে একলা ব'সে থাকৃতে, গাটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করে। পাড়ার ছোঁড়াগুলোও বড় বদ্‌। সেদিন বিভা বল্‌ছিল, সন্ধ্যার সময় কে-একটা তার গায়ে ফুল না কি ছুঁড়ে মেরেছিল।"

কৃষ্ণা বলিল, "প্রত্যেক মেয়ের উচিত বেড়াতে বেরবার সময় একটা চাবুক সঙ্গে রাখা, আর এরকম বাঁদরামি দেখলে আর কথাটি না ব'লে এইসব রসিক-চূড়ামণিদের আগাগোড়া চাবকে দেওয়া। তাহ'লে এঁদের রসাধিক্য একটু কমে বোধহয়। আমার গায়ে অবশ্য কেউ কিছু ছোঁড়েনি, কিন্তু গুটি-দুইতিন ছেলে ঠিক ক'রে নিয়েছে যে আমার একটা **guard of**

honour দরকার। যখন যেখানে যাই, দেখি, অন্ততঃ চার গজের মধ্যে তারা কোথাও-না কোথাও আছে।"

কৃষ্ণার সঙ্গিনী লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "অমন রাণীর মত চেহারা দেখ্‌লে আমাদেরই সখ হয় guard of honour হতে, ওরা ত পুরুষ মানুষ! তোর নাম কে যে কৃষ্ণা রেখেছিল আমি তাই ভাবি। আমাদের দেশে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন ঢের দেখা যায়, কিন্তু তোর বেলা হয়েছে দেখছি পদ্মলোচনের নাম কাণা। তোর নাম কৃষ্ণা না হয়ে তপতী হ'লে ঠিক মানাত।"

কৃষ্ণা বলিল, "আর ত বুড়ো বয়সে নাম বদ্‌লানো চলে না, তা না হ'লে তোর দেওয়া নামটাই বাহাল কর্‌তাম। ইউনিভার্সিটির কল্যাণে নামটা ছাপার অক্ষরেও উঠে গেছে অনেকবার, এখন বদ্‌লালে আমারই মুস্কিল। কৃষ্ণা রায় ব'লে বি-এ পাশ ক'রে, তপতী রায় ব'লে চাক্‌রি নিতে গেলে কেউ ত চাক্‌রি দেবে না?"

লাবণ্য বলিল, "তুই আর ক'দিন চাক্‌রি কর্‌বি, দুদিন পরেই লাল বেনারসী প'রে কার-না-কার ঘর আলো কর্‌তে চ'লে যাবি। নিতান্ত মা-বাবা নেই তাই এতদিন ছাড়া আছিস, পিছন থেকে ঠেলা দেবার লোক থাক্‌লে এতদিনে তিন ছেলের মা হয়ে বস্‌তিস।"

কৃষ্ণা বলিল, "ভাগ্যে নেই! আমার বিয়ে করবার উৎসাহ খুব যে বেশী তা বলতে পারি না। বিয়ে ত আমাদের দেশে সব মেয়েই করে, কিন্তু তাতে তাদের লাভটা যে কি হয়, তা ত দেখি না। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে আরো ক'টি অনাহারে কাটাবার প্রাণী জুটিয়ে দিয়ে যায় মাত্র। বিয়ে ক'রে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে, এমন একটা মেয়ের নাম কর্ ত?"

লাবণ্য বলিল, "যা, যা, পাকামি কর্‌তে হবে না। উন্নতির জন্যেই সবাই বিয়ে করে আর-কি? এক দলের মা-বাপে বর জুটিয়ে দেয়, মেয়ের খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা হওয়া দর্‌কার ভেবে, আরেক দল নিজেই জোটায় প্রাণের দায়ে, না জুটিয়ে তাদের শান্তি থাকে না ব'লে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি দুই দলেরই বাইরে পড়ব। মা-বাপও নেই যে ঘাড় থেকে নামিয়ে নিশ্চিন্ত হবে, আর আমায়ও এখন এত ভূতে ধরেনি যে, একটি হাড় জ্বালাবার লোক না জুটলে শান্তিই পাব না। আমি ত ভাবছি সেই আমেরিকা যাবার স্কলারশিপটা জোগাড় করব, এর পরের বছর। চাকরি ক'রেই যখন চালাতে হবে, তখন যাতে একটু ভদ্র গোছের মাইনে পাওয়া যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। এ কি আর একটা জীবন! কোনোরকমে বেঁচে থাকা, তক্তপোষের ছারপোকাগুলো যেমন থাকে।"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাঠের মাঝখানে, ছোট বাংলো-ধরণের বাড়ীটির প্রতি খোলা দরজা-জানালার পথে আলোর স্রোত ক্রীড়াচঞ্চল শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া যেন বাহিরের তৃণশয্যার উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল। রান্নার গন্ধে সাম্‌নের জমিটি ভরপুর। কৃষ্ণা বলিল, "বাঙালীর বাড়ী যে, তা লোকে এক মাইল দূর থেকে বুঝবে। এমন ফোড়নের গন্ধ বার কর্‌বার সাধ্যি আর কোনো জাতের নেই।"

লাবণ্য বলিল, "তুই এক মহা মেমসাহেব। আমার ত খুব ভাল লাগে রান্নার গন্ধ। সব-কিছুতেই তুই এতও নাক সিঁটকে থাকতে পারিস্ বাপু। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানিস্? হয়ত রবিবাবুর গোরার মত তুইও কোনো সাহেবের মেয়ে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে বাঙালীর ঘরে এসে পড়েছিস। রংটা ত মেমের কাছাকাছি আছেই, মেজাজ এবং পছন্দগুলিও ঠিক সেই রকম।"

বাড়ীর সাম্‌নে বসিবার জন্য খান-দুই অর্দ্ধ-পুরাতন তক্তপোষ পাতা ছিল। তাহারই একটা রুমাল দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে কৃষ্ণা বলিল, "বোস্ এইখানে। মাগো, কি ধূলো। সাধে এখানে একখানা শাড়ী একদিনের বেশী দুদিন পরা যায় না? পাড়গুলোর কাছে আধ হাত ক'রে লাল ধূলোর আর একটা পাড় তখুনি দেখা দেয়।"

লাবণ্য বসিয়া বলিল, "আমাদের ধূলোর দেশ, ধূলো তো থাকবেই! একটা সাহেব বিয়ে ক'রে বরফের দেশে চ'লে যা না? আচ্ছা, সত্যি বল্, আমি যা বল্‌ছিলাম তাই হ'লে তুই খুসী হ'স্? তোর ত দেশী কোনো জিনিষের উপর বিন্দুমাত্রও টান দেখি না?"

কৃষ্ণা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "মোটেই হই না, এবং তোর আল্‌নস্করের স্বপ্ন সত্যি হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। আমার মা-বাপ নেই বটে, নিকট আত্মীয়ও কেউ আছে ব'লে জানা যায় না। কিন্তু আমি যে কাদের মেয়ে, কোথা-থেকে মাসীমা আমায় জুটিয়েছিলেন, সবই পরিষ্কার ক'রে জানা আছে, সে-সব নিয়ে রহস্যাবৃত উপন্যাস সৃষ্টি কর্‌বার কিছুমাত্র উপায় নেই। দেশী জিনিষ আমার ভালো লাগে না, তাই বা তোকে কে বল্‌ল? দেশের মন্দগুলো ভালো লাগে না ব'লে কি দেশের ভালোগুলোও ভালো লাগে না?"

লাবণ্য বলিল, "তোর কাছে কি যে ভালো, আর কি যে মন্দ তা বুঝবারও আমার সাধ্যি নেই। থাক গে। তুই ফির্‌ছিস কবে রে?"

কৃষ্ণা বলিল, "পরের 'উইকে' যে-দিন ভালো সঙ্গী পাব, সেদিনই যাব। মাঝে চেঞ্জের ভাবনা না থাকলে একলাই যেতাম, কিন্তু কুলি ডাকাডাকি, জিনিষ টানাটানি কর্‌তে ভালো লাগে না, তাই কারো সঙ্গেই যাব। দেখ্, এদিকে আমি একেবারে আর্যনারী, মেমসাহেবী ফর্‌ওয়ার্ডনেস্ আমার একেবারেই নেই।"

লাবণ্য বলিল, "অন্ততঃ এজন্যেও ত তোর একটা বর দরকার। পথে-ঘাটে জিনিষপত্র বইবে, আর তোর মতো রূপসীর একটা দারোয়ান দরকার, সে-কাজও কর্‌বে।"

কৃষ্ণা বলিল, "কেন রে? আমি কি ট্রাফিক সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট হ'তে যাচ্ছি? চিরজন্ম আমি কি ট্রেনেই ঘুরব যে তার জন্যে এত পাকাপাকি ব্যবস্থা?"

বাড়ীর ভিতর হইতে একটি প্রৌঢ়া রমণী বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "ওমা, কৃষ্ণাও ফিরেছ যে! আমি ভাবি মেয়েগুলো একলাই

এল বুঝি। বিকেলে ত কিছু খেয়েও বেরোওনি, এক-পেয়ালা চা ছাড়া। চল, গরম লুচি ভাজ্‌ছে, দুখানা খেয়ে নেবে, বেগুনভাজা দিয়ে। লাবণ্য, এস মা। তোমাকে যে আর এদিকে দেখি না বড় ?"

লাবণ্য বলিল, "এই, বাড়ীর বাইরেই সকলের সঙ্গে দেখাটা হয়ে যায় কিনা, কাজেই বাড়ী আস্‌বার আর চার থাকে না। আজ কৃষ্ণা সকাল-সকাল ফির্‌ল, আমি সঙ্গে সঙ্গে এসে জুট্‌লাম।"

বাড়ীর গৃহিণীর পিছন-পিছন কৃষ্ণা আর লাবণ্যও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রান্নাঘরের বারাণ্ডায় দুইখানা বড় বড় পিঁড়ি পাতিয়া তিনি বলিলেন, "এইখানে বোসো মা, ভিতরে যা গরম। বামুন-ঠাক্‌রুণ, দিদিমণিদের জলখাবার দিয়ে যাও।"

কৃষ্ণা জুতা খুলিয়া পায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "বাবা কি পরিমাণ বালিই জমেছে জুতোর মধ্যে। একখানা বাড়ী প্ল্যাষ্টার করা হয়ে যায়। এদেশে হয় 'টপ্ বুট' পরা উচিত, নয় খালি পায়েই হাঁটা উচিত।" সে পা মুছিয়া লাবণ্যের পাশের পিঁড়িতে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, "তোর আসনে কি পিঁড়িতে বসা দেখ্‌লে, সত্যি আমার পেট ফেটে হাসি আসে। যেন শুবি কি বস্‌বি ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিস না। না মামীমা ?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "অভ্যেস নেই কিনা মা ? ওর মাসীর ঘরে চিরকালই টেবিলেই খেয়েছে। আমাদের যদি এখন কেউ কাঁটা-চামচে খেতে বলে তাহ'লে আমরা খোঁচাখুঁচি ক'রে রক্তপাত ক'রে বসি। তবু ত কৃষ্ণা খুব মানিয়ে চল্‌তে জানে। মেমেদের স্কুলে-বোর্ডিংএ মানুষ, কোনোরকম ফিরিঙ্গি-আনার ধার ধারে না। আমাদের সঙ্গে সমানে ডালভাত খাচ্ছে, খালিপায়ে বেড়াচ্ছে। কেবল কোথাও নোংরামি দেখলে বড় খুঁৎ খুঁৎ করে।"

মেয়েরা খাওয়া সারিয়া উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণা যে ঘরে শোয়, সকলে সেই ঘরে আসিয়া বসিল। ঘরখানি ছোট, গৃহসজ্জাও কিছুমাত্র নাই,

কিন্তু কোথাও ধূলার কণাটি নাই। দুটি ছোট তক্তপোষ ঘরের দুইধারে, বিছানাগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মাঝে একটি ছোট টেবিল, তাহার উপর কাগজমোড়া মস্তবড় এক পুলিন্দা। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "এটা ত দেখে যাইনি? কখন এল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই এসেছে। আমি অমনি রেখে দিয়েছি, খুলে দেখিনি ভিতরে কি আছে।"

কৃষ্ণা দড়াদড়ি কাটিয়া পার্সেল খুলিয়া ফেলিল। বাহির হইল এক বড় ছবি।

কৃষ্ণা বলিল, "ওমা, মাসীমার ছবি, যেটা কল্‌কাতায় ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট্ কর্‌তে দিয়ে এসেছিলাম। বাঁধিয়ে পাঠাল না কেন ছাই! আমি ত তাই কর্‌তে ব'লে এসেছিলাম। আবার গিয়ে আমাকে বাঁধাতে দিতে হবে।"

লীলা-বেলার মা বলিলেন, "তা ছবিটা বেশ ভালোই হয়েছে। নিতান্ত শেষ-বয়সের নয় দেখ্‌ছি, বছর-চল্লিশ বয়সের হবে। ইদানীং বড় রোগা হয়ে গিয়েছিলেন, চুলটুলও সব উঠে গিয়েছিল। এ ছবিটাতে বেশ মোটাসোটা, সাজ-পোষাকও বেশ আছে দেখ্‌ছি।"

লাবণ্য বলিল, "হাঁ রে কৃষ্ণা, তোর মাসীমা ত দেখছি বেশ সাবেক কালের গহনা-গাঁটি পর্‌তেন, কাপড়খানাও গরদ ব'লে মনে হচ্ছে। তা তোকে এত মেম বানিয়ে গেলেন কেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "নিজে হয়ত কোনো কারণে মেম হয়ে উঠতে পারেননি, অথচ ইচ্ছাটা ছিল! আমাকে দিয়ে সে-সাধটা মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন আর-কি? চোদ্দ-পনেরো বছর অবধি ত শাড়ীর মুখ দেখিনি। তাল-গাছের মত লম্বা আর শিড়িঙ্গে রোগা ছিলুম, হাঁটু বের ক'রে বেড়াতে ভয়ানক লজ্জা কর্‌ত, অথচ মাসীমা কিছুতেই শাড়ী কিনে দিতেন না। বোর্ডিংএ অন্য মেয়েদের খোসামোদ ক'রে তাদের শাড়ী চেয়ে নিয়ে পর্‌তুম। আমার নাম রেখেছিলেন 'ক্রীষ্টিনা', আমি গায়ের জোরে তাকে কৃষ্ণা ক'রে নিয়েছি।"

লাবণ্য বলিল, "কোথাকার গোঁড়া হিন্দুঘরের মেয়ে, তোর এ-সব ধাতে সইবে কেন? বীফ্‌টিফ্‌ খাস্‌?"

কৃষ্ণা বলিল, "দূর হ, এমনি মাছমাংসই আমার ভালো লাগে না, তা বীফ খাব। মাসীমার কাছে শুনেছি আমার মা-বাবা নাকি ভারি সাত্ত্বিক বৈষ্ণব ছিলেন, সেই গুণ থেকে গেছে আর-কি?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "সবটা থাকেনি। তোমার স্বভাবে, মা, বৈষ্ণবের মাথা হেঁট ক'রে থাকার ভাব একেবারে নেই। নিতান্ত তোমার মাসীর কথা অবিশ্বাস করা যায় না, তাই; তা না হলে তোমার চেহারা, ধরণ-ধারণ, পছন্দ, কিছুই গরীব বৈষ্ণবের ঘরের মতো নয়। কোনো রাজা-রাজড়ার বাড়ীর মেয়ে হ'লেই তোমাকে ঠিক মানাত।"

কৃষ্ণা বলিল, "হাঁ, রাজার মেয়ে আমি যা, তা ত দশা দে'খেই বোঝা যাচ্ছে। তাহ'লে আর মা মরতেই ধাত্রীর হাতে ফে'লে সবাই স'রে পড়ত না। ভাবলে আমার কি যে রাগ হয় মাসীমা, কি বল্‌ব! মা-বাপই না হয় ছিল না, তাদের তিনকুলেও কি কেউ ছিল না? এমন ক'রে বিলিয়ে দিতে তাদের মনে একটু বাধল না? মাসীমা যদি আমায় না নিতেন, তা'হলে তারা হয়ত আমাকে নর্দ্দমাতেই ফে'লে দিত। কে জানে হয়ত বা কখনও দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে আমার কোনো গুণবান্‌ আত্মীয়ের সন্ধান মিলে যাবে। যদি চিনি, তাহলে তাদের যা শোনান শোনাব তা আমি মনেমনেই ঠিক ক'রে রেখেছি। মনে করেছি বিলেত হয়ে এসে ভালো কাজকর্ম্ম যদি কিছু পাই, টাকাকড়ি কিছু করতে পারি, তাহ'লে তাঁদের সন্ধানে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব। বাঙালীর ঘরের আত্মীয় ত, টাকার গন্ধ পেলে ঠিক এসে জুটবে।"

লাবণ্য বলিল, "তা আশ্চর্য্য নয়। আচ্ছা, এখন উঠি। ছবিখানা তুলে রাখ, তা না হলে বাচ্চারা দেখলে এখনি টানাটানি ক'রে নষ্ট করবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "দাঁড়াও মা, একলা যেও না। ভজুয়া তোমাকে আলো নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক। পাড়াটা ভালো না, রাত-বিরাতে মেয়েদের একলা পথে ঘাটে না চলাই ভালো।"

লাবণ্য চলিয়া গেল, গৃহিণীও কাজে গেলেন। ঘরের জান্‌লা-দরজা-গুলি বেশ ভালো করিয়া খুলিয়া দিয়া কৃষ্ণা আসিয়া নিজের বিছানায় বসিল। এতক্ষণ নিজের অতীত জীবনের গল্প করিয়া, এখন সেই সকল স্মৃতিচিত্রই একটার পর একটা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

অতি শৈশবের কথা তাহার কিছুই মনে পড়ে না। বাল্যকালের স্মৃতি তাহার এই গিরিধির সঙ্গেই জড়িত। এখানে পথে ঘাটে মাঠে খেলা করিয়াই সে মানুষ হইয়াছে। তাহার মাসীমাকে বিশেষ কাজকর্ম্ম করিতে সে দেখে নাই, কালেভদ্রে নিতান্ত টানাটানি করিলে তিনি এক-আধটা 'কলে' যাইতেন। অথচ তাহাদের দিন বেশ সচ্ছলভাবেই কাটিত। বাড়ীটা অবশ্য তাঁহার নিজের ছিল, কিন্তু অন্যান্য দিকেও বিশেষ ব্যয়সঙ্কোচ প্রকাশ পাইত না। কোথা হইতে টাকা আসিত সে খবর জানিতে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই কৌতূহল ছিল, কিন্তু কেহই বোধহয় সেটা জানিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিসেস্ মিত্র নিজে খ্রীষ্টান ছিলেন। কৃষ্ণাকেও তিনি সেই সমাজের মতে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ ছিল না। সামান্য-রকম বাংলা লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। স্বামীর সহিত খুব যে তিনি সুখে ঘর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে মনে হইত না। এক-রকম রাগারাগি করিয়াই তাঁহারা পৃথক্ হইয়া যান। মিসেস্ মিত্রকে তাঁহার বাপের বাড়ীর সকলে জোগাড় করিয়া ধাত্রীবিদ্যা পড়িতে পাঠাইয়া দেন। পাশ করিবার পর তিনি নাকি আর-একবার স্বামীর ঘর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খোঁজ করিয়া জানা যায় যে, স্বামীটি ইতিমধ্যেই একটি গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-করনা করিতেছেন।

ইহার পর আর তিনি কখনও স্বামীর খোঁজ করেন নাই। কলিকাতায় তাঁহার প্র্যাক্‌টিস ভালোই ছিল, পয়সার জন্য কোনদিনই তাঁহাকে ঠেকিতে হয় নাই।

কৃষ্ণা যখন তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনে আসিয়া জুটিল, তখন তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থা। কাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, তিনি গিরিধিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণাকে অতি যত্নেই তিনি পালন করিয়াছিলেন। মাতার স্নেহ হয়ত তাঁহার কঠোর স্বভাবে ছিলই না, কাজেই সেদিক্ দিয়া এই নিজ-নীড়চ্যুতা শাবকটি কিছু বঞ্চিতাই হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার আদর-যত্ন, পড়াশোনা, কোনো-কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়ই ইহার জন্য তিনি করিতেন। নিজে ভালো লেখাপড়া শিখেন নাই, এ দুঃখ তাঁহার থাকিয়াই গিয়াছিল। কৃষ্ণাকে তিনি কলিকাতার খুব ভালো মেমের স্কুলে দিয়াছিলেন, যাহাতে তাহার খুব ভালো শিক্ষা হয়। শিক্ষা বলিতে অবশ্য তিনি মেমসাহেবিই বুঝিতেন। তাহার নাম, তাহার চাল-চলন, সব যাহাতে নিখুঁৎ ফিরিঙ্গি-ভাবের হয়, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। সে থাকিয়া থাকিয়া এমন বাঁকিয়া বসিত যে, হাজার শাসনেও তাহাকে বাগ মানানো যাইত না।

এইরূপে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার আগেই নিজের ক্রীষ্টিনা নাম বদ্‌লাইয়া করিল কৃষ্ণা। ফ্রকগুলি নীচের ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিয়া, 'পকেট মনি' জমাইয়া, শাড়ী কিনিয়া পরিল। সখ করিয়া দিন-কতক মাছমাংস সুদ্ধ ছাড়িয়া দিল। মিসেস মিত্র মেয়ের রকম-সকম দেখিয়া তাহাকে খাঁটি মেম করার সম্বন্ধে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে সে যখন বছর-সতেরো বয়সে বলিয়া বসিল, "আমি গীর্জ্জা ফির্জ্জা যাব না, আমার ভালো লাগে না," তখন তিনি একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই কৃষ্ণার এই পালিকা মাতাটি পরলোক গমন করেন। তাহার পর হইতে জগতে কি একেলা সে! নিতান্ত বন্ধুত্বের খাতিরে সে ছুটিতে দিন কাটাইবার একটা স্থান পায় মাত্র, কিন্তু বিশ্ব-সংসারে তাহার দাবী কোথায়? কাহাকেও সে জোর করিয়া কি বলিতে পারে, "আমার ভার তোমায় লইতে হইবে, না লইয়া তুমি যাইবে কোথায়?" তাহার জন্মের জন্য দায়ী যাঁহারা, তাঁহারা ত আজ সকল নালিশের পরপারে। পালনের জন্য দায়ী যিনি তিনিও ইহলোকে নাই, থাকিলেও তাঁহার উপর কোনো দাবী চলিত না। সমাজ বা সংসারও তাহাকে এখনও কাহারও সহিত এমন বন্ধনে বাঁধে নাই যাহাকে সে কিছু দিতে পারে বা যাহার কাছে জোর করিয়া কিছু চাহিতে পারে। একেলা, একেলা, এই মায়ার বন্ধনময় জগতে সে একেবারে বন্ধনহীন। সে কাহারও নয়, তাহারও কেহ নয়।

ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে কখন তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। লীলার ডাকে তাহার চমক ভাঙিল। চোখ মুছিয়া সচেতন হইয়া দেখিল, মৃদু জ্যোৎস্নার আলো ঘরখানিকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, অনেক রাত হইয়া থাকিবে। পাশের ঘরে ছোট খোকাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা সজোরে এবং সরবে চলিতেছে।

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল। ছেলে-মেয়েরা এখনই খাইতে বসিবে, গৃহিণীকে তখন একটু সাহায্য করা দরকার, তা না হইলে ছেলে-মেয়েরা ভাত খায় যতখানি, মার খায় তাহার দ্বিগুণ, এবং ঘুমাইতে তাহাদের বারোটা বাজিয়া যায়।

৮

পাড়ারই এক ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতা যাইতেছিলেন। কৃষ্ণারও ছুটি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল, আর সপ্তাহখানিক মাত্র বাকী, সেটুকু এইখানে কাটাইয়া যাইতে পারিলে অবশ্য সে খুসীই হইত, কারণ কলিকাতায়

ফিরিতে বেশী আগ্রহ হইবার তাহার কোনোই কারণ ছিল না। কিন্তু তাহা হইলে আবার হয়ত সুবিধামত সঙ্গী নাও মিলিতে পারে। কাজেই আর সাতটা দিন গিরিধিতে কাটাইবার মায়া ত্যাগ করিয়া সে সকালে উঠিয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের সহিত যাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিতে। তাহার সঙ্গী ছিল লীলা।

বেলা সাড়ে-সাতটার বেশী হইবে না, কিন্তু এরই মধ্যে রৌদ্রের তেজ বেশ একটুখানি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ থাকিয়া থাকিয়া আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, রেশমী ছাতাতেও তাহার কোনোই সুবিধা হইতেছিল না। লীলা রোদ গরম সব অগ্রাহ্য করিয়া মনের আনন্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছিল, এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণার ডাকে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিতেছিল। গিরিধির পথের লাল ধূলা তাহার চঞ্চল চরণাঘাতে উড়িয়া উড়িয়া তাহার মাথার চুল অবধি রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল।

নিতান্ত এলোথেলো নিরাড়ম্বরভাবে বাড়ীর বাহির হওয়া কৃষ্ণার কুষ্ঠিতে লেখে নাই। এত সকালেও তাহার চুল বেশ পরিপাটি করিয়া এলো খোঁপা বাঁধা। পরণে একটি সবুজ রঙের ভয়েলের ব্লাউস এবং সবুজ পাড়ের একটি শাড়ী। কাঁধে বেশ চওড়া একটি 'গোল্ড্ ষ্টোনে'র ব্রোচ্। পায়ে সাদা রেশমী মোজার উপর উঁচু 'হীলে'র সাদা জুতা। পথে যে দুই-চারিটি মানুষ তখন চলিতেছিল, প্রত্যেকেই এই রূপসী তরুণীকে বেশ একটু ভালো করিয়া না দেখিয়া গেল না, কারণ তাহার সৌন্দর্য্যটা বাঙালী সাধারণ গৃহস্থঘরের অপেক্ষা অনেকখানিই উচ্চদরের ছিল, এবং সে-সম্বন্ধে কৃষ্ণার সচেতনতারও অভাব ছিল না। মেয়ে-মহলে ইহা লইয়া সমালোচনা চলিত যথেষ্ট। কৃষ্ণা যে খুবই সুন্দরী কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ অনেক সময় দেখা গেলেও, সে যে অবস্থার অতিরিক্ত বিলাসিতা করে, এ-বিষয়ে কোনোই মতভেদ দেখা যাইত না। কোথাকার কুড়ানো মেয়ে তার ঠিক নাই, তাহার আবার অত বিবিয়ানা কেন বাপু? এ-সব সমালোচনা কখনও যে

কৃষ্ণার কানে না যাইত, তাহা নহে, কিন্তু নিজের সুন্দর সমুন্নত নাসিকা অবজ্ঞায় কুঞ্চিত করিয়া সে যেন আরো দ্বিগুণ উৎসাহে আপনার মতেই চলিতে থাকিত।

নির্দ্দিষ্ট গৃহে পৌঁছিয়া, কৃষ্ণা ছাতা মুড়িয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। একটি ছোট ছেলে তাহাকে খবর দিল যে, মা বাড়ী নাই, বাবা বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। অভাবপক্ষে তাঁহারই সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সব স্থির করিয়া লওয়ার আশায় কৃষ্ণা ছেলেটির পিছন-পিছন বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কৃষ্ণা বলিল, "আমি একজন সঙ্গী খুঁজ্‌ছি। আপনারা যাচ্ছেন শুনে, জান্‌তে এলাম কবে যাবেন। আমি সঙ্গে এলে কি আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "অসুবিধা হবে কি রকম? অসুবিধা হলে আপনারই হবে। আমার ছেলে-মেয়েগুলো কি রকম জানোয়ার দেখেছেন ত? আপনার হাড় জ্বালিয়ে তুল্‌বে এক ঘণ্টার মধ্যেই। পঞ্চু নাকি সেদিন বেলার চোখে বালি দিয়ে দিয়েছে?"

কৃষ্ণা বলিল, "কোথায়? খেল্‌তে খেল্‌তে একটুখানি লেগে গিয়ে থাক্‌বে। আমার হাড় খুব শক্ত, সহজে জ্বলে না। আপনারা কি পর্‌শু যাবেন?"

পঞ্চুর বাবা বলিলেন, "গাড়ী রিসার্ভ ক'রে যেতে হবে আমাকে, তা না হ'লে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গিন্নীর বড় অসুবিধা হয়। পর্‌শু না পাই, ত তার পরদিন যাব।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, আমি আসি তাহলে। আমার টিকিট্‌টাও আপনি তাহলে ক'রে দেবেন। আমি বাড়ী গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

গৃহস্বামী বলিলেন, "টাকার জন্যে কিছু তাড়াতাড়ি নেই। একটা 'একষ্ট্রা' টিকিট আমার গাড়ী রিসার্ভের জন্যে নিতেই হয়েছে, আপনি যখন হয় টাকা দিলেই হবে।"

কৃষ্ণা আবার লীলাকে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। পথ এখন তাতিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে। লীলার খালি পায়ে পাছে ফোস্কা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে কৃষ্ণা তাহার হাত ধরিয়া খুব হন্‌হন্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হিসাব করিতে করিতে চলিল, তাহার হাতে কত টাকা আছে, এবং তাহার কত খরচ পড়িবে। ধোপা এখনও তাহার কাপড় দিয়া যায় নাই, সেও এক মুস্কিলের কথা। বাড়ী গিয়াই চাকরটাকে তাহার সন্ধানে পাঠাইতে হইবে। টাকার হয়ত একটু টানাটানিই পড়িবে। টিকিটের দাম দিয়া, গাড়ীভাড়া, কুলিভাড়া, প্রভৃতির জন্য টাকা-দশ হাতে রাখিলে, লীলা-বেলাদের কিছুই কিনিয়া দেওয়া চলিবে না। নিতান্ত দুই-চারি আনা দামের জিনিষ দিতে তাহার কিছুতেই মন ওঠে না। প্রতিবার ছুটির সময়েই প্রায় তাহাকে ইহাদের বাড়ী আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহারা কিছু কৃষ্ণার কাছে থাকিবার বা খাওয়ার খরচ লন না। তাই, পরের অন্ন ধ্বংস করার লজ্জা কাটাইবার জন্য কৃষ্ণা প্রতিবারেই ছেলেমেয়েদের জন্য বেশ-কিছু খরচ করিয়া উপহার কিনিয়া আনে, অথবা যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া যায়। ইহারা তাহার পালিকা মাতার অনেককালের বন্ধু। সেই হিসাবে কৃষ্ণাকে বাড়ীর মেয়ের মতই আদরযত্ন করেন, কিন্তু বিনা-প্রতিদানে কেবল উপকার গ্রহণ করিতে কৃষ্ণার দৃপ্ত মন বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাই সে এই উপায় বাহির করিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার যে-রকম টানাটানি, কি করিয়া যে সে কি করিবে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পিছন হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, "কি গো সুন্দরী, এত উর্দ্ধশ্বাসে কোথায় চলেছ ?"

কৃষ্ণা পিছন ফিরিয়া লাবণ্যকে দেখিয়া বলিল, "কোথাও চল্‌ছি না, বাড়ী ফির্‌ছি। পঙ্কুদের বাড়ী গিয়েছিলাম যাওয়ার ঠিক কর্‌তে। তুই কোথায় যাচ্ছিস্‌ এখন ? কবে যাওয়া ঠিক করলি ? আয় না।"

লাবণ্য বলিল, "না ভাই, এখন আর যাব না, অনেকগুলো শেলাই বাকি, বাড়ী গিয়ে তাই নিয়ে পড়ব এখন। জানিস্‌ ত, মা এসব কিছুই

পারেন না, ভাইবোনদের সব শেলাই আমাকে ছুটির সময় এসে ক'রে দিতে হয়। তা পঞ্চুদের বাড়ী যাবার জন্যেই এত সাজ করেছিস্? কার মনোহরণ কর্‌বার জন্যে এত ঘটা? বাড়ীর জ্যেষ্ঠতম যুবকটির ত বয়স আট বছর, তাকেই ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় আছিস্ নাকি? বাবা, শাড়ী ব্লাউস ম্যাচ্ করিয়েই অল্প লোকে পরে, তোর আবার জুতো মোজা ছাতা অবধি সব ঠিক মানানসই চাই। সবুজ ছাতার নীচে টুকটুকে মুখখানি বেশ ফুলের মত দেখাচ্ছে। দিনে ক'ঘণ্টা এ বিষয়ে study করিস্ রে?"

কৃষ্ণা তাহাকে চিমটি কাটিয়া বলিল, "চব্বিশ ঘণ্টাই। আমার আর ভাববার কি আছে বল্? তুই কবে যাচ্ছিস্, বললি না?"

লাবণ্য বলিল, "দিন-পাঁচ-সাতের মধ্যেই যাব হয়ত। এবার বাবাই দিয়ে আসবেন বললেন, কাজেই আর সঙ্গীর ভাবনা ভাবছি না।"

কৃষ্ণা বলিল, "এবার কিন্তু গিয়েই চোখ-কান খাড়া রাখিস্। যদি কোন কাজ খালি হয়, তখনি আমাকে জানাবি। আমার আর ঐ খ্রীষ্টান স্কুলে কাজ করবার মোটে ইচ্ছা নেই। তাছাড়া মাইনেও বড় কম, আমার একলা মানুষেরই খরচ চালানো দায় হয়ে ওঠে। সত্যি, এবার আমেরিকা যাবার স্কলারশিপটা পেলে বেঁচে যাই। এই আধ পয়সার হিসাব ক'রে চলতে চলতে আমার ত প্রাণ গেল।"

লাবণ্য বলিল, "মেয়ে-স্কুলের চাক্‌রি ত হরদমই খালি হচ্ছে, ভাই। আসল চাক্‌রির সন্ধান পেলেই সব লেজ তুলে চম্পট, বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী টিচারগুলি। তাদের চাকরি নেওয়া নিতান্ত একটা সময় কাটাবার occupation, বর যতদিন না জোটে। মিসেস্ চন্দ ত বলেন, এবার সব married টিচার নেবেন, নয়ত এমন দে'খে নেবেন, যাদের বছর পঞ্চাশ বয়স হয়ে গিয়েছে, তাহলে তারা আর ছ'মাস কাজ ক'রেই পালাবে না। সত্যি, termএর মাঝখানে কাজ ছেড়ে দিলে মেয়েদের বড় ক্ষতি হয়। তা মাইনে কিন্তু এখানেও খুব বেশী না, তা আগে থেকে ব'লে রাখছি। ওখানে যা পাচ্ছিস, তার চেয়ে বড়জোর দশ পনেরো টাকা বেশী হতে পারে।"

কৃষ্ণা বলিল, "তাই বা মন্দ কি? তেল-সাবান ইত্যাদির খরচটা ত উঠে যাবে?"

লাবণ্য তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "নে নে, থাম্ আর বেশী বড়মানুষী ঢং দেখাতে হবে না। তুই বুঝি মাসে দশ-পনেরো টাকার তেল সাবান মাখিস্? এইজন্যে সবাই তোর এত নিন্দে রটায়, যা বা না করবি তাও ব'লে বেড়াবি!"

কৃষ্ণা বলিল, "নিন্দে করল ত বয়ে গেল! আর কারো টাকায় ত করি না? নিজের টাকায় যদি আমি মাসে আড়াই মণ তেলও মাখি, তাতে তাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে কেন রে? আমার কেউ নেই ব'লে বুঝি আমাকে সারাক্ষণ ছেঁড়া কাপড় প'রে আর ছাই মেখে বেড়াতে হবে? দেখ্, এইজন্যে আমার আরো অনেক বেশী টাকা হাতে পেতে ইচ্ছা করে। যদি ইচ্ছা হয়, আমি মুঠো মুঠো ক'রে রাস্তায় ফে'লে দেব, ইচ্ছা হয় ত কাউকে পাঁচশ টাকা কি হাজার টাকা দিয়ে দেব। সংসারে মজা এই দেখি যে, পরের দুঃখটা লোকে খুব উপভোগ করে, পরের সঙ্গে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদবার লোক সর্ব্বদাই জুটবে, কিন্তু পরের সুখ-সমৃদ্ধিতে হাসবার লোক বড় কম। কারো কিছু সুখের কারণ হয়েছে শুনলে বেশীর ভাগ লোকেরই যেন গলায় ভাত আট্‌কে যায়।"

লাবণ্য বলিল, "তা ত যাবেই। সংসারে হিংসুটের ত অভাব নেই? আচ্ছা, তুই এগো, গরমে একেবারে লাল হয়ে গেছিস্। আজ বিকেলে যাব এখন।"

কৃষ্ণা লীলাকে লইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ী পৌছিয়া জুতা মোজা খুলিয়া, কাপড় বদ্‌লাইয়া সে জিনিষ গোছানোর কাজে লাগিয়া গেল। বই খাতা প্রভৃতি যাহা কিছু বাহিরে ছিল, সব জোগাড় করিয়া এক জায়গায় আনিয়া রাখিল। চাকরটাকে ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া নিজের ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহার ভিতরকার জিনিষপত্র সব বেশ পরিপাটি করিয়া গুছাইতে লাগিল, তাহা না করিলে সব জিনিষ ইহার ভিতর

কুলায় না। কাপড়-চোপড় নাড়ানাড়ি করিতে করিতে দুইটুক্‌রা রেশম বাহির হইল। একটি ফিকা নীল রংএর, অন্যটি সোনালী। নিজের ব্লাউজ তৈয়ারী করিবে বলিয়া কৃষ্ণা এ-দুইটি টুক্‌রা কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু ছুটির মধ্যে আলস্য করিয়া আর সে কিছু করে নাই। এখন হঠাৎ এগুলির উপর চোখ পড়াতে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। ভাবিল, 'এইগুলো দিয়ে লীলার একটা, বেলার একটা জামা হয়ে যাবে। কিছু খেলো জিনিষও হবে না, বেশ দামী সিল্ক। তাহলে এখনকার মত টাকার টানাটানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। খোকাকে এখান থেকেই কিছু ভাল দে'খে কিনে দেব এখন। কিন্তু সময়ই বা কোথা? আজ দুপুরেই যদি লাবণ্যর ওখানে গিয়ে শেলাই সুরু করি, তাহলে হয়। দেখা যাক্।'

ইতিমধ্যে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ধোপা আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই কাপড় লইয়া আসিবে। খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণা তখন স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া, তাড়াতাড়ি ডালভাত যাহা পাইল, মুখে দুটা গুঁজিয়া সে রেশমের টুক্‌রা-দুটি ও শেলাইয়ের সব সরঞ্জাম লইয়া লাবণ্যদের বাড়ী যাইবার জন্য পথে বাহির হইয়া পড়িল। আর বেশী দেরি করিলে হয়ত গরমের জন্য আর রাস্তায় চলাই যাইবে না।

লাবণ্য বলিল, "কি রে, হঠাৎ যে এমন অসময়ে?"

কৃষ্ণা বলিল, "মহা কাজ নিয়ে এসেছি। লীলা-বেলার এ জামাদুটো কালকের মধ্যে শেষ করতেই হবে। তোর প্যাটার্ন বইটা শীগগির বার কর্।"

সারা দুপুর কেবল কাটা, জোড়া দেওয়া, শেলাই করা চলিতে লাগিল। দুই সখীরই যেন আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। লাবণ্য মাঝে একবার নাওয়া-খাওয়া করিতে উঠিয়া গেল। তাহার ছোট ভাই-বোনেরা দু-চারবার ঘরের ভিতর ঘোরাঘুরি নাচানাচি করিয়া গেল,

কিন্তু কৃষ্ণার বিষম গম্ভীর ভাব দেখিয়া আর বেশীকিছু করিতে সাহস করিল না।

বিকালের দিকে কৃষ্ণার ঘাড় পিঠ সব ব্যথা করিতে আরম্ভ করিল; আর কাজ করা চলিবে না বুঝিয়া সে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া উঠিয়া পড়িল। লাবণ্য বলিল, "এই, চা খেয়ে যা! সারাদিন ব'সে ঠিক এই সময় উঠছিস্ যে বড়? এখন তোকে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে মা আমাকে খুব বকৃবেন।"

কৃষ্ণা মিনতি করিয়া বলিল, "না ভাই, যাই এখন। গরমে মাথা কেমন করৃছে। বাড়ী গিয়ে আর একবার স্নান করব, আর ধোপাটাও কাপড় দিয়ে গেল কিনা দেখতে হবে। আমার আবার কালকের মধ্যে সব গোছগাছ হওয়া চাই ত? পরশু যদি ওরা গাড়ী রিসার্ভ পায় ত পরশুই চলে যাবে, সেদিন আর কিছু গোছাবার সময় পাব না।"

লাবণ্য বলিল, "তাহলে কাল রাত্রে এসে আমাদের সঙ্গে খাবি, কথা দিয়ে যা। কবে থেকে ভাবছি, তোকে একদিন খেতে বলব, তা এর অসুখ ওর অসুখ লেগেই আছে। আর এই ছোট ফ্রকৃটা রেখে যা, আমি ওটা শেষ ক'রে রাখব।"

কৃষ্ণা রাজী হইয়া জিনিষ-পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ধোপা কাপড় দিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার খুব ভালো একটা ঢাকাই শাড়ী দেয় নাই। চাকর আসিয়া খবর দিল যে, ধোপা বলিয়াছে শাড়ী সে কাল-পরৃশুর মধ্যে নিশ্চয় আনিয়া দিবে, "আচ্ছাসে তৈয়ার" হয় নাই বলিয়া সে আজ আনে নাই।

"পরশু এলে ত আমি কৃতার্থ হয়ে যাব একেবারে," বলিয়া বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কৃষ্ণা বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। গরমে তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। একখানা খবরের কাগজ পাট করিয়া বাতাস খাইতে খাইতে সে ভাবিল, "এত রোদের মধ্যে না এলেই পারতাম।"

খানিক পরে উঠিয়া গিয়া সে স্নান সারিয়া আসিল। কালো চুলের রাশে বাতাস করিতে করিতে জিনিষপত্র গোছানোয় মন দিল। বেলা

ছুটিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, তুমি চ'লে যাচ্ছ? এবারে আমায় খেল্‌না দিয়ে গেলে না?"

কৃষ্ণা বলিল, "এবার তোর জন্যে সুন্দর সিল্কের ফ্রক তৈরি করছি। দেখিস্ এখন কাল।"

বেলা উৎসুক হইয়া বলিল, "না, এখনি দেখব।"

কৃষ্ণা বলিল, "এখন ত এখানে নেই। সেটা লাবণ্যদিদির কাছে আছে, সে শেলাই করছে। কাল শেলাই হয়ে গেলে নিয়ে আসব।"

রাত্রি হইয়া আসিল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া জিনিষপত্র বেশীর ভাগ গোছাইয়া, কৃষ্ণা আজ কিছু সকাল-সকালই শুইয়া পড়িল। ধোপা তাহার শাড়ী না দেওয়াতে মনটা তাহার একটু বিরক্ত হইয়াই রহিল। সারা রাত প্রায় স্বপ্ন দেখিল যে হারানিধির অন্বেষণে সে গিরিধিময় ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই পঞ্চুদের বাড়ীর চাকর খবর দিয়া গেল যে, কালই গাড়ী রিসার্ভ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের যাত্রা স্থির। কৃষ্ণার মহা তাড়াতাড়ি লাগিয়া গেল। চাকরকে আবার ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া সে ছুটিল লাবণ্যদের বাড়ী শেলাই শেষ করিতে। সারাদিন দুই বন্ধু অবিশ্রাম খাটিয়া ফ্রকগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। বিকাল হইয়া আসিল দেখিয়া লাবণ্য বলিল, "আর এখন বাড়ী গিয়ে কি করবি? মুখহাত এখানেই ধুয়ে নে, কাপড় ছাড়তে চাস্ তাও দিচ্ছি। একেবারে রাত্রে খেয়ে-দেয়ে যাস্। আমাদের বাড়ী খেতে বেশী দেরি হয় না, সব বাচ্চা-কাচ্চার দল, ন'টার মধ্যেই চুকুতে হয়।"

চুল বাঁধিয়া, মুখহাত ধুইয়া দুই সখীতে বাড়ীর সামনেই একটু বেড়াইতে চলিল। লাবণ্য বলিল, "লীলার ফ্রকটাই বেশী ভালো হয়েছে, তবে মেয়েকে কেমন মানাবে বলতে পারি না। ব্লু রংটা শ্যামবর্ণে সব সময় মানায় না।"

কৃষ্ণা বলিল, "কেন, লীলা এমন কিছু ত কালো নয়, একরকম মানিয়ে যাবে এখন। কিই বা করি বল? এখানে ত আর ইচ্ছামত জিনিষ সব

সময় পাওয়া যায় না? খোকাকে খেলনা কিনে দিলাম, আট-দশ টাকা খরচ ক'রে, তাও কিছু পছন্দ মত জিনিষ হ'ল না।"

খাওয়ার ডাক পড়ায় তাহারা ভিতরে চলিল। ফিরিতে রাত হইয়া গেল, কাজেই আসিয়া শুইয়া পড়া ছাড়া কৃষ্ণার আর কিছু করিবার রহিল না।

বিদায়ের সময় বাড়ীর সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। লীলা, বেলা, দিদিমণির দেওয়া নূতন সিল্কের ফ্রক পরিয়া তাহার সহিত ষ্টেশনে যাইতেছিল, কাজেই তাহাদের মুখে তখনও হাসি। কৃষ্ণা অনাত্মীয়া হইলেও, এবাড়ীতে আত্মীয়ার ব্যবহার পাইত এবং করিতও। তাহারও মনটা এই শিশুগুলিকে ছাড়িয়া যাইতে একটু কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু জগতে কিছুরই প্রতি মমতা করিয়া লাভ কি তাহার? সে ছোট খোকাকে কোলে লইয়া, চুমা খাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এবার গিয়েই একটা তার ক'রে দিও মা। সেবার তোমার চিঠি আসতে ছ-সাত দিন দেরি হ'ল, আমি ত ভাবনায় মরি। মেয়ে-ছেলে হাজার শক্ত সমর্থ হলেও তাদের পথে ছেড়ে দিয়ে প্রাণে স্বস্তি থাকে না।"

ট্রেন ছাড়িতে একটু দেরি আছে দেখা গেল। কৃষ্ণা সে সময়টুকু লীলা বেলাকে লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, তখন লীলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "জানো দিদিমণি, মা বলেছেন, এর পরের বছর থেকে আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব আর আসব। আমিও স্কুলে ভর্ত্তি হব কিনা?"

কৃষ্ণা বলিল, "পরের বছর আমি হয়ত বিলেত চ'লে যাব, কি ক'রে তুমি যাবে আসবে আমার সঙ্গে?"

লীলা লনিল, "ইঃ! তুমি বিলেত যাবে কেন? সেখানে ত কেবল মেমরা যায়।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমিও ত মেম? দেখিস্ না, লাবণ্যদিরা আমায় মেমসাহেব ব'লে ডাকে?"

বেলা ঝাঁকড়া চুল সুদ্ধ মাথাটা দোলাইয়া বলিল, "না, তুমি কক্ষনো মেম না। তুমি ত শাড়ী পরো। মেমরা ঘাঘ্‌রা পরে, আর শাদা মোজা পরে, পা বার ক'রে বেড়ায়।"

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। চাকরের হাতে লীলা-বেলাকে গছাইয়া দিয়া কৃষ্ণা গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীর ভিতর ইতিমধ্যেই মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঙ্কু ও তাহার ছোট ভাই জান্‌লার পাশে বসিবার অধিকার সাব্যস্ত করিতে মুষ্টিযোগের শরণ লইয়াছে। কৃষ্ণা ভিতরে আসিতেই তাহাদের পিতা হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, কিরকম সব জন্তু নিয়ে আমার যাওয়া-আসা করতে হয়। আপনি আবার আমাদের অসুবিধা করার ভাবনা ভাবছিলেন।"

৯

গ্রীষ্মের ছুটির পর মহানগরীর স্কুল-কলেজগুলি সবে খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনও সব ছাত্র-ছাত্রী বাড়ী হইতে ফিরে নাই। ক্লাসগুলিতে ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা বেশী নয়। পড়াশুনাও তেমনভাবে আরম্ভ হয় নাই।

সাড়ে-তিনটা বাজিতে না-বাজিতে কলেজ স্ট্রীটে কলেজের ছাত্রের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ক্লাস বসিবার সময় অত কেহ একসঙ্গে আসে নাই, যার যেমন সুবিধা তেমনই আসিয়াছে। কে যে আসিল, কে যে আসে নাই, তাহারও খোঁজ বড়-একটা লওয়া হয় নাই। এখন সকলে একসঙ্গে বাহিরে আসিয়া দীর্ঘ অবকাশের পর বন্ধু-বান্ধবের মুখ দেখিয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। রৌদ্রের তেজ তখনও অতি প্রখর, ছেলেদের মুখ আরক্ত ও পরিচ্ছদ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সে-দিকে কেহ বিশেষ লক্ষ্য রাখিল না। তরুণ-বঙ্গের দল ছাতা বহিয়া বেড়ানোকে বড়ই সেকেলে মনে করে। কাজেই রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদের গতি কি?

কেহ কেহ খাতা এবং বই মাথায় করিয়া বন্ধুদের দলের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল; যাহাদের বাড়ী কিছু বেশী দূরে, তাহারা ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল; যাহাদের তখনি তখনি বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা নাই, তাহারা কলেজ স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

একটি ছেলে দল হইতে একটু পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ভবানীপুরের ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার চেহারার মধ্যে বিশেষত্ব আর কিছুই ছিল না, কেবল লম্বায় সে সাধারণ বাঙালীঘরের ছেলের চেয়ে কিছু বড়। রঙ তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশ-ভূষার পারিপাট্য খানিকটা আছে। হাতে দামী 'রিষ্ট্‌ওয়াচ', বুক পকেটের ভিতর হইতে একটি সোনা-বাঁধানো ফাউণ্টেন্ পেন্ উঁকি মারিতেছে।

পিছন হইতে তাহার পিঠে চড় মারিয়া আর-একটি যুবক বলিয়া উঠিল, "কি হে রাজপুত্তুর, কখন এলে? ক্লাসে তোমায় দেখেছি ব'লে ত মনে হচ্ছে না?"

ছেলেটি পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "কি ক'রে দেখবে? আমি ঠিক আড়াইটার সময় smartly এসে পৌঁছেছি। তারপর চন্দর, বাড়ীর খবর কি? নোলকপরা মুখটুখ কিছু হৃদয়ে বহন ক'রে এনেছ? আমি ত সারা ছুটি গোলাপী চিঠির প্রত্যাশায় ছিলাম, কিছু ত এসে পৌঁছল না?"

চন্দ্রনাথ বলিল, "চিঠিগুলো এখনও ছাপা হয়নি, আর নোলকটা যদিও তৈরি হয়ে এসেছে তবু সেটা ঝুলোবার উপযুক্ত একটা খাঁদা নাক এখনও পাওয়া যায়নি। তা, তোমার নিজের খবর কি শুনি? এত যে বক্তৃতা ঝাড়লে যে ক্যাল্‌ক্যাটা ইউনিভার্সিটির এম্-এ কিছুতেই পড়বে না, এখন ত দেখছি বেশ সুড়সুড় ক'রে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং থেকে বেরচ্ছ?"

আর-একজন যুবক বলিল, "এ কি son proposes but mother disposes হ'ল নাকি, সুবীর? তোমার নামখানা বিশেষ সার্থক হয়নি, বাপু। বাঙালীর ছেলের একমাত্র বীরত্ব-ক্ষেত্র যা অন্তঃপুর। সেখানেও তুমি জয়লাভ করতে পার না?"

সুবীর বলিল, "অত সস্তায় বীর নাম কিনে কি হবে? সেইজন্যে সব বীরত্ব সঞ্চয় ক'রে রাখছি, যখন ভালো occasion জুটবে সবটা একসঙ্গে ঝেড়ে দেব। যাক, এতক্ষণে একটা ওদিক্‌কার ট্রাম আস্‌ছে ব'লে মনে হচ্ছে। রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত মাথার চাঁদি উড়ে যাবার জোগাড় হ'ল। চন্দর চল না হে আমার সঙ্গে? মেসের ঠাকুর আর চাকর ছাড়া তোমার পথ চেয়ে থাক্‌বার ত আর কেউ নেই?"

চন্দ্র বলিল, "কি তাজ্জব কাণ্ড! কলিযুগের ninth wonder! রাজপুত্তুর আজ ট্রামে চড়বে নাকি? ট্রাম কোম্পানীর বাপ-দাদা এমন কি পুণ্যি করেছিল? কেন, তোমার 'শেভরলে'-খানা কি হ'ল?"

সুবীর বলিল, "মা সেখানা আজ দখল ক'রে কালিঘাটে পুণ্য অর্জ্জন কর্‌তে গিয়েছেন। কাজেই ট্রাম কোম্পানীকে অনুগ্রহ করা ছাড়া আমার উপায় নেই। চল, চল, ট্রাম এসে পড়ল!"

দুই বন্ধু লাফ দিয়া ট্রামে চড়িয়া বসিল। চন্দ্রনাথ বলিল, "নিয়ে ত চল্‌লি। গিয়ে কর্‌ব কি আমি?"

সুবীর বলিল, "কিঞ্চিৎ জলযোগ কর্‌বে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেবে, এবং মা যদি দয়া ক'রে সময়মত ফেরেন, তা হ'লে সাড়ে-ছটার সময় পিক্‌চার প্যালেসে রুডল্‌ফ ভ্যালেন্টিনোর প্রেম করা দেখতে আস্‌বে। এই subjectএ ওর মতো ভালো টিচার একটিও নেই।"

চন্দ্র কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়েই বা লাভ কি? আমাদের অদৃষ্টে অপূর্ব্ব সুন্দরী ফরাসী নর্ত্তকী, সাহারা মরুভূমিতে আরব ডাকাতের সঙ্গে মারামারি, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে সুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবন, এসব কিছুই জুটবার সম্ভাবনা নেই। আমরা দশটা থেকে পাঁচটা মার্‌চ্যান্ট অফিসে কলম পিষব, আর বাড়ী এসে শুন্‌ব, খোকার জ্বর, টেঁপীর কান কটকট, গিন্নির মাথা-ধরা, বাড়ীওয়ালার দারোয়ান তাগিদ দিতে এসেছিল, ইত্যাদি।"

সুবীর বলিল, "আরে, এখনি হাল ছাড়লে কি চলে? এখন অন্ততঃ কল্পনা ক'রেও একটু thrilled হও। আমি ত সারাক্ষণ যত-রকম আজগুবী আর অসম্ভব কল্পনা করা যায়, তাই নিয়েই থাকি। তারপর realityতে যা হবার তা ত হবেই। তাই ব'লে, সেই ভাবনা ভেবে এখন থেকে আধমরা হয়ে থেকে লাভ কি?"

চন্দ্রনাথ বলিল, "তোর পক্ষে তবু কিছু সম্ভাবনা থাক্‌লেও থাকতে পারে। আর কিছু না হোক, টাকার ছালার ওপর ত ব'সে আছিস্? এদেশে romance না জোটে, ত ওদেশে গিয়ে দিব্যি ফুর্ত্তি মেরে আস্‌তে পার্‌বি, যতদিন খুসি। তোর বিলেত যাওয়ার প্ল্যান কি একেবারে ভেস্তে গেল?"

সুবীর বলিল, "একরকম তাই, যে-সব conditionএ মা আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী, তাতে আমি যেতে রাজী নই। কাজেই এখনকার মত কথাটা ধামা-চাপা রয়েছে।"

চন্দ্র বলিল, "তুই জোর ক'রে চ'লে যা না! এখন ত আর নাবালক নেই। মা না-হয় রাগই কর্‌বেন, কিন্তু একমাত্র ছেলের ওপর রাগ ক'রেই বা কতদিন থাকবেন?"

কথা বলিতে বলিতে ট্রাম এস্‌প্লানেডে তাহাদের নামিবার জায়গায় আসিয়া পড়িল। বই-খাতা গুছাইয়া এক হাতে ধরিয়া নামিতে নামিতে সুবীর বলিল, "না রে, তা করা চলে না। চল্, বাড়ী গিয়ে সব শুনবি। এঃ, এখনও বেজায় রোদ রয়েছে। দেখ্, আর ট্রামে উঠবি, না হেঁটে যাবি বাকিটুকু? বেশী দূর না।"

ট্রামের রাস্তা হইতে তাহাদের বাড়ী অতি অল্পই দূর; চন্দ্র হাঁটিতে আপত্তি করিল না। সেইটুকু পথ দ্রুতপদে অতিক্রম করিয়া দুই বন্ধু একটি লাল ইটের গাঁথনী গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বাড়ীটি খুব বেশী বড় নয়, তবে দেখিতে সুন্দর। চারি পাশে খানিকটা জমি। গেট হইতে লাল সুরকি ঢালা পথ বাড়ীর সিঁড়ির পদতলে গিয়া থামিয়াছে। পথটির

দুই ধারে ফুলের বাগান ;—ডান পাশে বিলাতী মরুশুমী ফুল তাহাদের নীল নয়ন খুলিয়া অভ্যাগতের দিকে চাহিয়া আছে, শ্বেত গোলাপের ঝাড় বায়ুভরে কাঁপিয়া উঠিতেছে, মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি বিচিত্র লীলায় দাঁড়াইয়া, ফোয়ারা হইতে গলানো হীরকের স্রোতের ন্যায় জল সবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। একটি উড়ে মালী এই-সকলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। কোথাও ঘাস একটু বড় হইয়া গিয়াছে, সে ছোট একটি 'লন্-মোআর' লইয়া সব কাটিয়া ছাঁটিয়া সমতল করিতেছে।

বাম পাশেও ফুলের বাগান, কিন্তু সেদিকে আধুনিক রুচির প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না। বেলা, জুঁই, রজনীগন্ধা, শ্বেত করবী, কাঞ্চনের সেখানে রাজত্ব। মার্ব্বেল পাথরের মূর্ত্তি, ফোয়ারা বা রঙীন মাছ কিছুই সেখানে নাই। একটি শাদা কাবুলী মার্জ্জারী আপনার স্থূল দেহ লইয়া ঘাসের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে, ক্রীড়াপরায়ণ দুইটি শাবক, তাহার পাশে পশমের বলের মত এদিক্ ওদিক্ গড়াগড়ি দিয়া খেলিতেছে, মাঝে মাঝে মায়ের কাছে দুই-একটা চড়চাপড়ও লাভ করিতেছে। বাড়ীর পিছনে ফলের বাগান এবং ছোট একটি পুষ্করিণী আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু এসকল বাহির হইতে চোখে পড়ে না।

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়াই সম্মুখে পড়ে মস্ত 'হল'। ইহা খুব দামী আসবাব দিয়া সাজানো, তবে সবগুলি আধুনিক রুচি-সঙ্গত নয়। বড় বড় গিল্টি-করা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির ভারে ঘরের ছাদ সুদ্ধ যেন নামিয়া পড়িয়াছে মনে হয়। চারিদিকের দেয়ালে চারখানা বৃহৎ আয়না ; ঘরে ঢুকিবামাত্র চারিপাশেই নিজেকে দেখিয়া হঠাৎ অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। পিতলের কাজ করা জয়পুরী টেবিল, লাল মখমলে মোড়া ভারী ভারী চেয়ার এবং সোফা, উপরে সারি সারি বাতির আধার প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন, নীচে বহুমূল্য তুর্কী কার্পেট, কিছুরই অভাব নাই। ঘরখানিতে ঢুকিয়া মনে হয়, হ্যাঁ, এবাড়ীর লোকেরা বড়লোক বটে, তবে এখানে বসিয়া দু'দণ্ড হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিবার কথা কাহারও মাথায় আসে না।

চন্দ্রনাথ বলিল, "বাপ রে, এ ঘরে কেউ বসে নাকি ?"

সুবীর বলিল, "না, এটা আমাদের পরিবারের bad taste আর vulgarityর museum। কাঠে আর কাঁচে কতরকম ক'রে টাকা নষ্ট করা যায় আমার বাপ-ঠাকুরদাদারা তারই competition করেছেন এর মধ্যে। নিতান্ত হোমরা-চোমরা অথচ বুদ্ধিহীন কোনো জীব এলে আমি মায়ের আজ্ঞায় তাঁকে নিয়ে এখানে বসাই, তা না হ'লে এটা আমাদের passage রূপেই ব্যবহার হয়। আমার উপরের বস্‌বার ঘরটা আমি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়েছি, অর্থাৎ সাজাইনি। কিন্তু সেখানে বস্‌লে কারও অন্তরাত্মা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে না।"

কথা বলিতে বলিতে দুই বন্ধু উপরে উঠিয়া আসিল। সিঁড়ির বাম পাশের ঘরগুলি সুবীরের, ডানদিকের গুলি অন্তঃপুর, যদিও সম্প্রতি সেখানে অন্তঃপুরিকার একান্তই অভাব। সুবীরের মা ও তাঁহার দুইতিনটি দাসী ভিন্ন এখন আর এদিকে কেহই বাস করে না।

সুবীরের বসিবার ঘরে খান-চার কালো কাঠের পালিশ করা চেয়ার ছাড়া আর বেশী কিছু আসবাব নাই। আর আছে, সারি সারি বইয়ের আল্‌মারী। দেওয়ালের গায়ে গোটাদুই ফোটোগ্রাফ ও গোটাদুই লাল্‌চে বাঁশের ফ্রেমে বাঁধানো জাপানী ছবি ভিন্ন অন্য কোনো ছবি নাই। ঘরের দরজা-জানলাগুলি পরদার ধার ধারে না। তাহাদের ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরে হাওয়া যতটা প্রবেশ করিতেছিল, রৌদ্রের উত্তাপ প্রবেশ করিতেছিল তাহার চেয়ে বেশী। ঘরের মাঝখানে সিলিংএ আঁটা একটি বৈদ্যুতিক পাখা। সুবীর ঘরে ঢুকিয়াই সেটি চালাইয়া দিল।

তাহাদের দেখিয়াই একজন চাকর ছুটিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সুবীর বলিল, "যা, আমাদের দুজনের চা এই ঘরে দিয়ে যেতে বল্। মা ফিরেছেন নাকি ?"

চাকর বলিল, "আজ্ঞে, তিনি এখনও ফেরেননি। ফির্‌তে সন্ধ্যে হবে ব'লে গেছেন।"

সুবীর চন্দ্রনাথকে বসাইল, নিজেও বসিয়া বলিল, "তাহলে সিনেমায় যাওয়াটা কালকের জন্যে তুলে রাখা যাক্। এই রোহিণী, ভবানীদিদিকে বল্‌গে যা আমাদের খাবার ঠিক ক'রে দিতে। আর দেখ্, চা কর্‌বার মত বুদ্ধি যখন তোর মাথায় নেই, তখন বৃথা চেষ্টা না ক'রে, পেয়ালা, টি-পট, গরম জল, চিনি-টিনি সব এইখানে দিয়ে যা, আমি ক'রে নেব।" চাকর চলিয়া গেল।

চন্দ্র বলিল, "এত বড় বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে শুধু তুমি আর তোমার মা? এ বড় বেমানান লাগে হে! শীগগির আরো লোক জোটাও।"

সুবীর বলিল, "সে চেষ্টা ত আমি ছাড়া আর সকলেই কর্‌ছে। আমার কেবল ওদিকে উৎসাহের অভাব। শুধু বাড়ী ভরাবার খাতিরে লোক জুটিয়ে আন্‌লে বাড়ী শেষে এমনই মারাত্মক রকম ভ'রে উঠবে, যে আমাকেই হয়ত বেরিয়ে যেতে হতে পারে।"

চন্দ্র বলিল, "যাতে সে-রকম অঘটন না ঘটে, তার ব্যবস্থা ক'রেই আনো না হয়। ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান যদি না চলে, ত কল্‌কাতায় হিন্দু মেম-সাহেবেরও আজকাল কিছু অভাব নেই। বি-এ, এম-এ, যা চাও, তাই পাবে। তোমার মতো সুপাত্র হাতছাড়া করবে, এমন পাত্রী বা পাত্রীর বাপও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। বল ত ঘট্‌কালি করি। আমার সন্ধানে দু-চারটি মেয়ে আছে। বিদুষী তাঁর হওয়াই চাই, এটা আমি ধ'রেই নিচ্ছি, রূপসীও খুব হওয়া দরকার বোধহয়? টাকাকড়িও চাই নাকি?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, একাধারে সরস্বতী, উর্ব্বশী এবং কুবেরনন্দিনী। এর কম দাবী করব কেন? কিন্তু কার্য্যতঃ জুটবে হয়ত একটি খুকী, যাঁর গোরুর মত ড্যাবা চোখ এবং খ্যাঁদা নাক, নাকের গোড়া অবধি চুল দিয়ে ঢাকা, এবং বাকিটা ঢাকা ঘোমটা দিয়ে। তাঁর বিদ্যা কথামালা অবধি, এবং স্বামীর চেয়ে পুষী মেনীকে সঙ্গী হিসাবে preference দেবেন। এই ভয়েই ত ওধার মাড়াতে ইচ্ছা হয় না।"

চন্দ্র বলিল, "তুমি বিয়ে না করলে ত আর ঐ রকম একটি জীব নিজের থেকে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে না? যেমন চাও, তেমন দে'খেই করবে তোমার ত আর বাপখুড়ো, ঠাকুরদাদা দশ গণ্ডা বেঁচে নেই যে, জোর ক'রে গলায় একটি গৌরীদানের দুগ্ধপোষ্যা শিশু ঝুলিয়ে দেবে?"

সুবীর বলিল, "দশ গণ্ডাকে পারা যায়, বিশেষ তারা যদি পুরুষ হয়; কিন্তু একটি মায়ের সঙ্গে পারা শক্ত, বিশেষ তিনি যদি বিধবা হন, আর তাঁর একটিমাত্র সন্তান থাকে। আইনতঃ আমি এখন সাবালক, যা খুশি করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ এতবড় অক্ষম এবং নিরুপায় জীব আর নেই হে। যা করতে যাই, তাতেই মনে হয় মা দুঃখ পেলেন বা। অত্যন্ত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, সংসারের কোনো সাধই তাঁর মেটেনি। এখন সব সাধ তাঁর আমাকে দিয়েই মেটাবার ইচ্ছা—একটা মানুষের সমস্ত স্নেহ-মমতার অধিকারী হওয়া বড় মুস্কিলের জিনিষ। আমি এক-একদিকে তাঁর ভগবান্‌কে ছাড়িয়ে গিয়েছি মনে হয়। তুই বল্‌ছিস আমি জোর ক'রে বিলেতে যেতে পারি? তা পারি হয়ত। কিন্তু ফিরে এসে মাকে আর দেখব কি না সন্দেহ। তাঁর কিছুকাল যাবৎ heart troubles জুটেছে, এত বড় 'শক্' সইবে না। কাজেই চুপচাপ ব'সে আছি, যতদিনে তিনি মত দেন। চাকরির জন্যে বিলেতে যেতে হবে না, এই এক রক্ষা।"

ইতিমধ্যে জল-খাবার আসিয়া পড়িল। রূপার, পাথরের এবং চীনে-মাটির বাসনে টেবিলটা সবখানা ত ভরিয়া গেলই, তাহাতেও জায়গায় কুলায় না দেখিয়া ভৃত্য ছুটিয়া পাশের ঘরে গেল, আর একটা ছোট টেবিল আনিতে। দুইজন দাসী ততক্ষণ আধ-ঘোমটা টানিয়া খাবারের রাশ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। টেবিল আনা হইলে পর সব খাবারের পাত্র তাহার উপর গুছাইয়া রাখিয়া দাসীদ্বয় চলিয়া গেল। চাকরটি, যদি তাহাদের আরও কোনো-কিছু প্রয়োজন হয়, তাহারই অপেক্ষায় দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্র বলিল, "আরো জন-দশ-বারো খাবে ব'লে মনে হচ্ছে হে; তাদের ডেকে পাঠাও, অনর্থক দেরি ক'রে লাভ কি? ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ তেড়ে।"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "তুমি আরম্ভ ক'রে দাও, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিতে নেই। অন্যদের আস্‌বার সময় হ'লেই তারা আসবে। দেখ, চা ঢাল্‌ব নাকি? না, এই সর্‌বতেই চলবে?"

চন্দ্র বলিল, "দেখা যাক্। এ কিন্তু তোদের অন্যায় বাপু! টাকা আছে ব'লে কি তা নর্দ্দমায় ঢেলে দিতে হবে? দুটো মানুষের জন্যে যা জলযোগের ব্যবস্থা দেখছি, তাতে দশটা মানুষ বেশ পেট ভ'রে খেতে পারে। এর কতখানি ফেলা যাবে, আন্দাজ কর্ ত? তুই রোজই এইরকম জলযোগ করিস্ ত? দুই প্লেট ফল, লুচি, ভাজা তরকারী, চাট্‌নি; সরবৎ দুইরকম, পায়েস, ক্ষীর এবং কমলালেবু; সন্দেশ দুরকম, রসগোল্লা এবং পিঠে; তার উপর চা। এই ত দেখছি জলযোগের ব্যবস্থা। তোমরা পেট ভ'রে খেতে হলে তাহলে কি খাও?"

সুবীর বলিল, "রোজই কি আর অত খাই? আজ তুমি এসেছ শুনে ভবানীদিদির একটু বিশেষ-রকম দিল্ খুলে গেছে দেখছি। নাও আরম্ভ কর, তোমার ক্ষিদে না থাক্, আমার পেট চোঁ চোঁ করছে।"

দুই বন্ধু আহার সুরু করিল; খাইতে খাইতে চন্দ্রনাথ বলিল, "ভবানী-দিদিটি কে হে? বাড়ীতে ত এক তোমার মা আছেন ব'লেই জান্‌তাম।"

সুবীর বলিল, "ভবানীদিদির পরিচয় দেওয়া শক্ত ব্যাপার। তিনি জন্মেছিলেন রাজপুতানী হয়ে, কিন্তু জীবনটা কাটিয়ে দিলেন বাঙালীর ঘরে। আমার দাদামহাশয় যখন রাজপুতনায় কাজ করতেন, তখন ইনি তাঁদের বাড়ী ঝি হয়ে আসেন। কিন্তু বেশীদিন ঝি ভাবে এঁকে কাটাতে হয়নি, বাড়ীর পাঁচজনের একজনের মতই তিনি ছিলেন। চেহারা দেখলে বা কথাবার্ত্তা শুন্‌লে বোঝাই যায় যে ভগবান্ তাঁকে দাসীবৃত্তি করবার জন্যে সৃষ্টি করেন নি। আমার মায়ের বিয়ে হবার পর, ভবানীদিদি তাঁর সঙ্গে

আমাদের বাড়ী আসেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে ইনিই আমাদের সংসারের অভিভাবিকা হয়ে আছেন। একাধারে তিনি house-keeper, manager এবং cashier। তিনটে লোক রাখলেও এর চেয়ে ভাল ক'রে কাজ চলত কিনা সন্দেহ। মা ত কোনোদিনই কিছু দেখেননি সংসারের। আমাকে মানুষ করার কাজটাও তিনি যতটা না করছেন, তার বেশী করেছেন ভবানীদিদি।"

চন্দ্র বলিল, "বেশ remarkable ত হে! তাঁকে আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।"

সুবীর বলিল, "স্বচ্ছন্দেই দেখতে পারিস্, তিনি ত আর অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গললনা নন, তার উপর বয়সও হয়েছে প্রচুর। মা আজ বাড়ী নেই। এরপর একদিন তোকে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব, ভবানীদিদিকেও দেখিয়ে দেব।"

এতক্ষণে ইহাদের খাওয়া শেষ হইল। সুবীর চা ঢালিবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "থাম, থাম, আর জায়গা নেই। এর পর নাকমুখ দিয়ে সব বেরিয়ে আসবে। ওহে বাপু রোহিণী, না অশ্বিনী, কি তোমার নাম? এগুলি সব সরিয়ে নিয়ে যাও ত; আর ওগুলোর দিকে তাকাতে পারছি না।" ভৃত্য তাড়াতাড়ি আসিয়া প্লেট, গেলাস, প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া গেল।

টেবিলের উপর পা উঠাইয়া দিয়া পানের মশলা চিবাইতে চিবাইতে চন্দ্র বলিল, "বাড়ীতে smoking prohibited নাকি হে?"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "prohibit আর কে করবে হে? বিশেষ ক'রে আমার পুর্ব্বপুরুষগণ smoking কেন, আর যতরকম যা-কিছু আছে, সবই যখন অবাধে চালিয়ে গেছেন। তবে আমিও পাছে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, এবিষয়ে মায়ের ভয়ানক একটা ভয় আছে দেখি। তাই পাছে তিনি কষ্ট পান ভেবে বাড়ীতে আর উল্কামুখী হবার ব্যবস্থাটা রাখি না। বাইরে অবশ্য তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে যে ক'গণ্ডা সিগারেট ধ্বংস করি তার

খবর ত আর তিনি রাখতে যান না? মায়ের বিশ্বাস, সব দিক্ দিয়েই আমি এখনও Sir Gallahad আছি। একদিন থিয়েটারে গিয়েছি শুনে মহা shocked হয়ে গিয়েছিলেন।"

চন্দ্র বলিল, "তোমাদের পক্ষে extra-careful হলেও ক্ষতি নাই। Heredity যদি মানতে হয়, তাহলে রক্তের মধ্যেও যে পাপের বীজ থাকে তাকে রোগের বীজের মতই ভয় ক'রে চল্‌তে হয়। আমরা হয়ত যদি, একবার গেলাসে চুমুক দিই, তাহলে থেমে যেতে কিছুই কষ্ট হবে না। কিন্তু তোমরা যদি একবার স্বাদ পাও, তাহলে চিরজীবনের মত দাসখত লিখে দেবে। সাবধান থাকাই ভাল।"

সুবীর বলল, "যাঃ, যাঃ, সব বাজে। আমি bet করতে পারি সব-চেয়ে দামী আর সুস্বাদু মদও যদি আমি খাই, শুধু একবার নয় একশো বারও, তাহলেও আমার ছাড়তে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হবে না। ওবিষয়ে আমার একফোঁটাও টান নেই। নাচ্‌ওয়ালীর ঘাঘরার পেছনে ছুটবার সখও আমার কোনোদিন হয়নি, হবেও না, এ আমি পরীক্ষা ক'রেই দেখেছি। Ideaটাই আমার nauseating লাগে। Heredity আমি মানি বটে, তবে তাই নিয়ে যে যেখানে যত ন্যাকামি আর বোকামি করেছে, সব-কিছু আমি মানতে রাজী নই। তাহলে ত বেঁচে থাকাই দায় হয়, এবং দিবারাত্র মায়ের আঁচলের তলায় নিজেকে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। তাঁর যদিও ইচ্ছা তাইই, নিতান্ত সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন বেরতে দেবার আগে গলায় একটা রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিতে চান।"

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ষাকবচটি সজীব ত?"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "তা না হলে আর এত আপত্তি করব কেন? তামার বা পিতলের কবচ হলে ত বাড়ীর বাইরে গিয়েই খুলে পকেটে পুরতে পারতাম। কিন্তু রক্ত-মাংসের জীব বড় ভয়ানক জিনিষ হে। 'শেষকালেতে মাথার রতন লেপটে রইবেন আঠার মতন' এমনই যে, প্রাণ একেবারে আইঢাই করবে। অনেককাল আগে পুরানো বঙ্গদর্শনের একটা

গল্পে পড়েছিলাম যে, একজন চাকর নিজের স্ত্রীর বর্ণনা করছে মনিবপুত্রের কাছে, 'কি করব দাদাঠাকুর? এ মা নয় যে তেড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে খেদিয়ে দেব। এ যে ইস্তিরী, অদ্ধাঙ্গ।' নইলে আর বিলেত যাওয়ার লোভও ছেড়ে দিই?"

চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "মা বুঝি ঐ conditionএ যেতে দিতে রাজী আছেন?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু যে-ধরণের বৌ আমার পছন্দ, সেটা তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। কাজেই, এখন আমার চুপচাপ ব'সে থাকা ছাড়া উপায় কি? তা না হলে ত দিব্যি বিয়ে ক'রে honeymoon trip-এই বিলেত চ'লে যাওয়া যেত। সে কি grand হ'ত বল ত? কল্পনা ক'রেই জিভে জল আসে!"

চন্দ্র বলিল, "আরে, সবুরে মেওয়া ফলে। এখন থেকে অত ঘাবড়াস কেন? চল্ একটু বাইরের থেকে ঘুরে আসা যাক্। এই গরমে কি ঘরে টেঁকা যায়?"

দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

১০

জমিদার-বাড়ীতে তখনও সবাই নিদ্রিত, ঝি-চাকরগুলির সুদ্ধ নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ভোরের আলো সবে খোলা জানলার ফাঁকে ফাঁকে ঘুমন্ত অধিবাসীদের চোখের উপর জাগরণের তাগিদ বহন করিয়া আনিতেছে দ্বিতলের একটি বড় ঘরে দুইটি মানুষ ঘুমাইতেছিল। এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারেও বুঝা যায় যে দু'জনই রমণী।

একজনের ঘুমের পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে দু'চারবার এপাশ ওপাশ করিয়া আলস্য ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইতে

রগড়াইতে ডাকিল, "ভানু, ও ভানু, ওঠ গো। কাল সারাটা দিন ত দাঁতে কুটো দিয়ে কাটিয়েছ। এখন উঠে চান করে মুখে কিছু দাও, তা না হলে আবার শরীর খারাপ করবে। কাল রাত্তিরেই আমি সব জোগাড় ক'রে রেখেছি।"

আর-একটি রমণীও ডাকাডাকিতে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। দিনের আলো এখন বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল, ঘরের ভিতরটায় আর আবছায়া ছিল না। ঘরের একধারে একটি ছোট অথচ মূল্যবান্ পালঙ্ক, তাতে একটি মানুষই শুইতে পারে, অন্য দিকে একটি তক্তপোষ। একটা আলনা দেয়ালের গায়ে খাড়া হইয়া আছে, তাহাতে তিনচারখানি থান ধুতি, একটি গরদের চাদর এবং একটি সেমিজ রক্ষিত। ছোট একটি আলমারী এক কোণে, তাহাতে সারি সারি বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক। ঘরের অন্য-এক কোণে একটি লোহার সিন্ধুক, তাহার ভিতরে যে কি আছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যে-দুইটি মানুষ এতক্ষণ এ ঘরে ঘুমাইতেছিল, তাহারা যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা ভবানী এবং ভানুমতী, তাহা বোধহয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ভবানী এখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। মাথার চুল পাকা, মুখ গভীর বলিরেখায় অঙ্কিত। গায়ের রং হল্‌দে তুলট কাগজের মত হইয়া উঠিয়াছে। দাঁড়াইলে বোঝা যায়, তাহার দীর্ঘ দেহ অনেকখানিই নুইয়া পড়িয়াছে। দেখিলেই তাহাকে এখন আর পুরুষবেশী নারী মনে হয় না। শরীরে সে-শক্তি আর নাই। ভিতর হইতে কিসে যেন তাহার শরীর-মনের বল শুষিয়া খাইতেছে। তাহাকে এখন সাধারণ বাঙালী ঘরের একটি বৃদ্ধা বলিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দেওয়া যায়, যদিও চোখের দৃষ্টিতে আগেকার দিনের রুদ্র তেজের ঝলক এখনও মাঝে মাঝে জ্বলিয়া ওঠে। আগের চেয়ে সে কথা-বার্ত্তাও ঢের কম বলে।

ভানুমতী এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। অকাল বৈধব্য ও সংসারের নানা দুঃখ-দুশ্চিন্তার আঘাত তাঁহাকে বয়সের চেয়েও

দ্রুতগতিতে বার্দ্ধক্যের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। তবুও এখনও হাজার লোকের মাঝে দাঁড় করাইলে সকলে একবার সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখে। তিনি যে রাণী হইতেই জন্ম লইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার শুভ্র রক্তহীন মুখে, দৃপ্ত চলার ভঙ্গীতে, আয়ত চোখের দৃষ্টিতে এখনও বর্ত্তমান। ঝরিয়া-পড়ার মুখে শ্বেত শতদলের যে শোভা, তাহা এখনও তাঁহার দেহকে ত্যাগ করে নাই। মাথার চুলে এখনও পাক ধরে নাই, অন্ততঃ উপর হইতে দেখিয়া কিছুই বোঝা যায় না।

ভবানীর ডাকে তিনি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ওমা এরই মধ্যে দিব্যি রোদ উঠে গেছে দেখছি। কাল অত ঘোরঘুরি ক'রে এমন দশা হয়েছিল যে একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়েছি। অত যে স্বপ্ন দেখি রোজ রাতে, কাল তাও দেখিনি। যাই, স্নানটা ক'রে আসি।"

ভবানী ইতিমধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। বিছানা উঠাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "রোস, তেল এনে দিই। বারণ করলুম যে, একাদশীর দিনটা অমন টো টো ক'রে বেড়িও না বাপু, শেষে নিজেই ভুগবে, তা কারো কথা শুন্‌বার মেয়ে ত তুমি নও! এখন কিছু ভালো-মন্দ না হলেই হয়। ওরে ও মাধী, তেল দিয়ে যা না। নবাবের বেটীদের এখনও ঘুমই ভাঙেনি নাকি ?"

নবাবের বেটীদের ঘুম ভাঙিয়াই ছিল। একজন ঝি তেলের বাটি হাতে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর আসিয়া হাজির হইল। ভানুমতী খাট হইতে নামিয়া একখানি পাটির উপর বসিলেন। গলা হইতে একগাছি সরু বিছাহার খুলিয়া পাশে রাখিয়া বলিলেন, "নে, তেলটা দিয়ে দে। জানিস ভবানী, এইটুকু যে পরি, তাও লোকের পোড়া চোখ এড়ায় না। ভাবে, বুড়ো মাগী, বিধবা হয়েছে, তবু গয়না পরার সখ যায় না। এক-একসময় ভাবি খুলে রাখি, কিন্তু মন ওঠে না রে!"

যে ঝিটি তাঁহার সুদীর্ঘ চুল খুলিয়া তেল দিয়া দিতেছিল সে বলিল, "লোকের মুখে আগুন মা, তাদের কথায় তুমি কান দিও না।

তোমার ছেলে রয়েছে অমন রাজপুত্তুরের মত, গলা খালি কর্‌লে তার অকল্যাণ হবে।"

পুত্রের নাম হইতেই ভানুমতীর মুখের উপর গভীর স্নেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মনে আছে রে ভবানী, যেদিন প্রথম থান কাপড় পর্‌লুম, সেদিন খোকা কি রাগারাগিটাই না করলে। বলে তোমার হাতে আর আমি খাব না, তুমি বিচ্ছিরি। তখন ত তবু ছোটটি ছিল, বড় হয়েই কি জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু বেশী হয়েছে? ও-বছরে বল্‌লুম, প্রয়াগে গিয়ে এবার চুল-ক'টা ফে'লে আস্‌ব, বয়েস ত হচ্ছে, এখন তিথি-ধর্ম্ম কিছু করি; তাতে বলে কি, 'অমন বেলের মতো মাথা ক'রে যদি তুমি এসো, তাহলে আমি বাড়ীর থেকে বেরিয়ে যাব, তোমার মুখ দেখব না। বাবা যে কেন তোমাকে টাকাকড়ি খরচ ক'রে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন তা জানি না, সবই তোমার পাড়গেঁয়ে বুড়ীদের মতো'।"

ভানুমতী সব কথাই প্রায় ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন কিন্তু সে কোনো কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া নীরবে আপনার কাজ করিতেছিল। পারতপক্ষে কথা না বলাই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উত্তর দিবার ভার লইয়াছিল মাধবী ঝি। সে বলিল, "দাদাবাবুর যা কথা, মা! ষেটের কোলে বড়টি হয়েছেন, এখন বিয়ে- থাওয়া দিয়ে দিলে বেশ হয়। তখন আর মাকে কেমন দেখাচ্ছে, সে-কথা বেশী ভাববেন না। যে বয়সের যা মা; একটি বৌরাণী এলে আমাদেরও বাড়ী সাজন্ত হয়। এতবড় বাড়ী যেন খাঁ খাঁ কর্‌ছে, লোক নেই, জন নেই।"

ভানুমতী বলিলেন, "আমারই কি অসাধ বাছা? বয়সও হয়েছে, রোগেও ধরেছে, এখন খোকার বিয়ে দিয়ে যেতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুজ্‌তে পারি। কিন্তু নাতিনাত্‌নী দে'খে মরার সুখ কি আর এ পোড়া কপালে আছে? যা সন্ন্যাসী ছেলে, ওর জমিদার-বাড়ীর ছেলের মতো কোনো হাল-চাল নেই! বিয়ে কর্‌তে ও রাজী হয় না, তা না হলে মিত্তিররা কি কম সাধাসাধি কর্‌ছে মেয়ে নিয়ে? ঘরও ভালো, মেয়েও ভালো। তবে একটু

ছোট, এই যা। তা, বাঙালীর ঘরে কিছু অসাজন্ত হত না। কিন্তু ছেলের পছন্দই অন্যরকম।"

ভবানী এতক্ষণে কথা বলিল, "যে-সময়ের যেমন, তেমন ত হবে বাছা? আজকালকার কোনো ছেলেই কচি বৌ পছন্দ করে না, তা তোমার ছেলেই বা করতে যাবে কেন? তারা চায় বৌ তাদের সঙ্গে সব বিষয়ে সমানে চলুক! আমি ত ভালোই বলি সেটা, ঘরে বৌ ঘোমটা টেনে শাশুড়ী-ননদের মধ্যে ব'সে থাকবে, আর ছেলে ওদিকে কোথায় বাইজি, কোথায় নাচওয়ালী, এইসব নিয়ে ঘুরবে, সেই কি ভালো? বৌ যদি সবদিক্‌দিয়ে মন জোগাতে পারে, তাহলে কি আর ছেলেদের ওসব বদ্‌খেয়াল হয়? তুমি বাপু ছেলের অমতে বৌ জোটাতে যেও না, তাতে ভালো হবে না, এই তোমাকে ব'লে দিলুম। দেখতে না, জ্ঞানদা কেমন করত তোমাকে ইংরিজি শেখাবার জন্যে, গান-বাজ্‌না শেখাবার জন্যে? তোমার শ্বশুর চালাক মানুষ ছিলেন, কোনোদিন আপত্তি করেননি।"

ভানুমতী বিষণ্ণ মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সত্যি, কত চেষ্টাই যে করেছিলেন! আমি ছাইকপালী তবু পিস্‌শাশুড়ীর ভয়ে তাঁর কথা শুনতে চাইতুম না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে অমন মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়? মিত্তিরদের মেয়েটি নাকি দেখতে খাসা, ফোর্থ্‌ ক্লাস অবধি পড়েছে, গান-বাজনাও কিছু কিছু জানে। তবে বয়স কম, মাত্র তের বছর। তা ওরা মেজদিদির কাছে বলেছে আমরা যদি কথা দিই, তবে ওরা মেয়ে আরো বছর দুই রাখ্‌তে পারে, তার বেশী আর পারবে না। বনেদী ঘর, তাদের আবার আত্মীয়-স্বজনে ছি ছি করবে। খোকাকে আজ আর-একবার ব'লে দেখ্‌তে হবে। মেজদিদি আজকালের মধ্যে একবার আস্‌বে বলেছিল, তাকে নাকি ওরা অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।"

ভবানী বলিল, "যাও বাছা, চান করগে। পরের ভাবনা পরে ভেবো। তবে এইটুকু ব'লে রাখি, হিন্দুয়ানীর ঘটা করতে গিয়ে ছেলের মন ভেঙে দিও না। না-হয় ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান মেয়েই বিয়ে করবে,—তারাও ত মানুষ?"

ভানুমতী হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন, "বুড়ো হয়ে তোর ভীমরতি ধরেছে দেখছি। খ্রীষ্টান বিয়ে করবে কি রকম? তাহলে আর আমায় এ বাড়ীতে টিক্‌তে হবে না। সাতটা নয় পাঁচটা নয়, আমার ঐ এক ছেলে, তার বৌ নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না? খোকা আমার বেঁচে থাক্‌, সে মাকে অমন দুঃখ কখনও দেবে না।"

মাধবী বিস্ময়ের আতিশয্য দেখাইবার জন্য গালে হাত দিয়া বলিল, "দিদি কি যে বলে তার ঠিক নেই! এ কি হেঁজি-পেজির ঘর যে যা-খুসি করলেই হল! এই বংশে শেষে খ্রীষ্টান বৌ আসবে! ওমা!"

ভবানী তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "নে নে, ন্যাকা সাজতে হবে না। তুমি যাও বাপু, চান ক'রে এসো, আমি ফলটলগুলো গুছিয়ে আনি।" বলিয়া সে শয়নকক্ষ ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। ভানুমতী চলিলেন স্নানের ঘরে, পিছনে তোয়ালে ধুতি প্রভৃতি লইয়া চলিল মাধবী।

স্নানান্তে খাইতে বসিয়া ভানুমতী বলিলেন, "মাধী, রোহিণীকে ডেকে জিগ্‌গেস করত রে, খোকা উঠেছে নাকি, তার চা টা খাওয়া হয়েছে নাকি? নিজের পোড়া পেট নিয়েই ব্যস্ত আছি, ছেলেটার এখন অবধি খোঁজই নিলুম না।"

ভবানী বলিল, "সে এখনও ওঠেনি গো ওঠেনি, তুমি খাও ত।" মাধবী তবু গৃহিণীর আজ্ঞাপালনার্থ রোহিণীর সন্ধানে চলিয়া গেল।

খাইতে খাইতে ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আম আনাস্‌-নি যে বড় এবার?"

ভবানী বলিল, "এনেছিলুম। সবে উঠেছে, দাম বেশী ব'লে গোটা-দুই মোটে এনেছিল। ভাবলুম একটা খোকাকে দেব, একটা তোমার জন্যে রাখব। তা খোকা কাল বিকেলে আর-একটি ছেলেকে নিয়ে এল, একসঙ্গে জল খেল, দুটোই তাদের দিলুম।"

ভানুমতী বলিলেন, "ওমা, তাই নাকি? কে ছেলেটি?"

ভবানী বলিল, "নাম ত জানি না। রোহিণী বললে, 'দাদাবাবুর সঙ্গে আর-এক বাবু এসেছে।' উঁকি দিয়ে দেখলুম, ওরই বয়সী একটি ছেলে, একসঙ্গে পড়ে বোধ হয়। তুমি থাকলে বোধ হয় এদিকে নিয়ে আসত। খোঁজ করছিল, মা আছেন নাকি।"

ভানুমতীর খাওয়া শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। মাধবী থালা-বাটি উঠাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেই ভবানী বলিল, "এখন আর ঘোরাঘুরি ক'রো না। একটু জিরোও, তা না হলে আবার বুক ঢিপঢিপ সুরু হবে। খোকা চা খাওয়া হলেই আসবে এখন এদিকে। না হয় আমি তাকে ব'লে আসছি। হার-ছড়া গলায় দাও, ফেলে রেখেছ পাশে, আবার কোথা দিয়ে কে নিয়ে যাবে।"

হারটি সরু, তাহাতে মস্ত ভারী এক পদক ঝুলিতেছে। স্প্রিং টিপিলেই তাহার উপরের ডালাটি খোলা যায়, ভিতরে জ্ঞানদারঞ্জনের একটি ক্ষুদ্র ছবি। ভানুমতী একবার ডালা খুলিয়া ছবিটি দেখিয়া লইলেন, তাহার পর হার উঠাইয়া গলায় পরিলেন। ভবানী বাহির হইয়া গেল, সুবীরের সন্ধানে।

মিনিট-দশ-পনেরো পরেই সুবীর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সবে ঘুম ভাঙিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখনও তাহার চোখমুখ আর পোষাকে বর্ত্তমান। ঘরে ঢুকিয়াই মায়ের পিঠে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "কি মা, কাল ত খুব মস্ত এক-বস্তা পুণ্য সঞ্চয় ক'রে এসেছ শুনলাম। এখন ডাঃ ভৌমিককে ডাকতে হবে নাকি তাই বল। তোমার পুণ্যে সবচেয়ে লাভবান্ হন তিনিই, বেশ callএর উপর call জুটতে থাকে।"

ভানুমতী হাসিয়া বলিলেন, "বোস্ বোস্, এখনি ডাক্তার ডাকতে হবে না, শরীর ত কিছু খারাপ করছে না!—চা টা খেয়েছিস?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, লাল সরবৎ খেয়েছি। তোমার চাকরটি যা চমৎকার চা করে, তার সঙ্গে কুলফী মালাইয়ের তফাৎ বোঝা শক্ত। রোজ বলি আমাকে চা, চিনি, দুধ আর গরম জল দিয়ে যেতে, তা ভক্তির আতিশয্যে

কোনোদিনই সে সেটা ক'রে উঠতে পারে না। ওর জ্বালায় আমার এতদিনের বন্ধুকে না ত্যাগ করতে হয়।"

ভানুমতী বলিলেন, "তা, চা না খেলেই বা ক্ষতি কি? ওতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ডাক্তারে বলে। আমরা যে চা খাই না, তাতে আমাদের ত কোনো অসুবিধা হয় না?"

সুবীর বলিল, "সুবিধা যে কি হয়, তাও ত দেখি না। ডাঃ ভৌমিক তোমার কল্যাণে মাসে একশ টাকা অন্ততঃ পান, আমার এই যে তেইশ বছর বয়স হতে চলল, আমার জন্যে তেইশ টাকাও ডাক্তারকে দিতে হয়েছে কিনা সন্দেহ।"

ভানুমতী স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যা যা, আর বড়াই করতে হবে না। ভারি না ভালো স্বাস্থ্য, তালপাতার সেপাই কোথাকার! কাল কে এসেছিল রে তোর সঙ্গে?"

সুবীর বলিল, "ও, আমার সঙ্গে পড়ে, চন্দ্রনাথ ব'লে একটি ছেলে। নিয়ে এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ব'লে, তা তুমি ত রাত দশটায় ফিরলে! আজ আর কোথাও বেরচ্ছ না ত? গাড়ীখানা আমার চাই।"

ভানুমতী বলিলেন, "আমি কোথাও যাব না। তবে মেজদিদিকে সন্ধ্যের সময় একবার আনতে পাঠাবার কথা আছে। তা সে আর কতক্ষণ লাগবে? আধঘণ্টা বড়জোর। তারপর তুই গাড়ী নিস এখন।"

সুবীর বলিল, "কাজ নেই বাপু, তুমি গাড়ী রাখ, আমি ট্যাক্সি ক'রে যাব এখন। মেজ-মাসীমা আসবার আগেই আমি চম্পট দেব। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নই।"

ভানুমতী বলিলেন, "পাগলের কথা শোন! কেন রে? মেজ-মাসী তোকে কামড়ায় নাকি? সে আসবার আগে পালাবি কেন?"

"তিনি ত এসেই কোনো দুগ্ধপোষ্য খুকীর রূপ-গুণ বর্ণনা করতে বসবেন, সে শুনতে আমি রাজী নই। দুই কান প'চে গেছে!"

ভানুমতী বলিলেন, "তবে তুই কি বিয়ে করবিই না একেবারে ঠিক করেছিস? একমাত্র ছেলে তুই এ বংশের, তুই এ-রকম ক'রে জেদ ধরলে চলে? আমাকে নাতির মুখ দে'খে মরতে দিবি না?"

সুবীর বলিল, "বুড়ী হওনি, তবু বুড়ী-গিরি না ফলালে তোমার চলে না! এখনি না মরলে তোমার কিছুতেই চলবে না?"

ভানুমতী বলিলেন, "আর বুড়ী হতে বাকিই বা কি? বাঙালীর মেয়ে কুড়ি পার হলেই বুড়ী, আর আমার ত দুকুড়ি কোন্‌কালে পার হয়ে গিয়েছে। জানিস্, কাল কালীঘাটে মিত্তিরের জেঠীর সঙ্গে দেখা হল।"

সুবীর বলিল, "তবে ত আমি কৃতার্থ হলাম। কি তাঁর বক্তব্য?"

ভানুমতী হাসিয়া বলিলেন, "কবে আমাদের দিক্ থেকে মেয়ে দেখতে যাবে তাই খোঁজ নিচ্ছিল। মেয়ে নাকি খুব সুন্দর রে।"

সুবীর বললে, "সুন্দর হলেই তাকে গিয়ে দেখ্‌তে হবে? আচ্ছা, শুধু দেখ্‌লে যদি তুমি খুসি হও ত গিয়ে দে'খে আস্‌ব।'

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, দে'খেও যদি তোর পছন্দ না হয়, তবে আমি আর কথা কইব না। তাহলে একটা দিন ঠিক ক'রে মেজদিদিকে আজ ব'লে দেব।"

সুবীর বলিল, "যা খুসি করগে, আমি এখন চললাম। আজ যেন বেশী ঘোরাঘুরি ক'রো না। এমন-কি বামুনঠাক্‌রুণের রান্নার তদারক করবার লোভও ত্যাগ ক'রো। প্রতি একাদশীর পর অসুখ করা ত তোমার এক রুটীন দাঁড়িয়ে গেছে। অন্ততঃ বৈচিত্র্যের খাতিরেও দু-একবার সেটা বাদ দাও।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভানুমতী ভবানীকে ডাকিয়া বলিলেন, "রান্না-বান্নাগুলো দেখিস্ একটু আজ। আমার অভিভাবক বাবাটি আমার আজ নীচে নামা বারণ ক'রে দিয়ে গেলেন। নতুন বাম্‌নী-মাগীর যা রান্নার ছিরি, তা ভূতেও খেতে পারে না। মেয়েমানুষের হাতে যে আবার এমন অখাদ্য সৃষ্টি হয়

তাও জানতুম না। আর পাশের বাড়ীর বুড়োঠাকুরুণকে একটু ডেকে দিয়ে যা, গল্প-সল্প করি, একলা হাঁ ক'রে ব'সে থেকে আর কি করব ?”

ভবানী ঘাড় নাড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। এ-বাড়ীর রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘর, খাইবার ঘর, প্রভৃতি সবই নীচে। তবে বাড়ীতে লোকের সংখ্যা এত কম যে আজকাল আর ঘটা করিয়া খাইবার ঘরে কেহই খাইতে যায় না। সাহেবী ধরণে সজ্জিত খাইবার ঘরটি তালা-বন্ধই থাকে, কারণ সাহেব-স্ববাকে খানা দিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ অর্জ্জনের দিকে বর্ত্তমান জমিদারটির একটুও উৎসাহ নাই; নিজেও সে উপরেই খায়, বসিবার ঘরে পড়ার টেবিলের উপর। বাহারের ডাইনিং রুমটি মাঝে মাঝে খোলা হয়। দামী রূপার বাসন, চীনা মাটির বাসন, প্রভৃতি ভবানীর তদারকে একবার ধুইয়া মুছিয়া ঝাড়িয়া ভৃত্যেরা আবার আলমারী সাজাইয়া রাখে, তারপর দরজায় আবার তালাচাবি বন্ধ হয়। ভানুমতী ত নিজের শুইবার ঘরেই খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া লন্, ডাক্তারের হুকুমে তাঁহার দিনে দুইবারের বেশী সিঁড়ি ওঠা-নামা করা বারণ।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। স্ববীর খাইয়া-দাইয়া, গাড়ী চড়িয়া কলেজে চলিয়া গেল। ভানুমতীরও খাওয়া-দাওয়া শীঘ্রই চুকিয়া গেল। বাকি রহিল কেবল বাড়ীর ঝি-চাকরের দল। তাহারা ইচ্ছামতো যখন খুসি খাইয়া, মাদুর, কম্বল, চট, খবরের কাগজ যে যাহা পাইল, তাহাই পাতিয়া সুখে নিদ্রা দিল। উপরের তলায় ঘরে ঘরে গরম হাওয়ার ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ হইয়া গেল। বৈদ্যুতিক পাখার ডানার ঝাপটায় বিশেষ-কিছু যে আরাম পাওয়া গেল তাহা নহে, তবু মন্দের ভালো বলিয়া ভানুমতী পাখার তলায় শীতলপাটী বিছাইয়া, একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বাংলা অনুবাদ হাতে করিয়া দীর্ঘ দুপুরবেলাটা কোনো গতিকে কাটাইয়া দিলেন।

ক্রমে রৌদ্রের ঝাঁজ কমিয়া আসিল। জানলা-দরজা একে একে খুলিতে লাগিল। বই মুড়িয়া রাখিয়া ভানুমতী উঠিয়া বসিয়া, তাকাইয়া

দেখিলেন, দেয়ালের গায়ে ঝোলানো বড় ঘড়িটার দিকে। তাহার পর দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে মাধী, ফলটলগুলো, আর মিষ্টি সব দিয়ে যা, অমনি ছোট বঁটিটাও আনিস্। খোকা কলেজ থেকে ফিরেছে কিনা একটু খবর নে ত।"

মাধবী আসিল, রঙীন বেতের ডালায় নানারকম ফল ও একটি বঁটি লইয়া, পিছনে মিষ্টি লইয়া আসিল ভবানী। ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ছেলের আজ্ঞা মেনে আজ ভালোই আছ দেখছি। নাহয় আমিই আজ ফলটল-গুলো ছাড়িয়ে দিই?"

ভানুমতী বলিলেন, "না, না, আমি বেশ পারব, তুই দে। সারাদিন কি হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকা যায়? খোকা ফিরেছে, মাধী?"

নীচে মোটরকার থামিবার ও দরজা-খোলার শব্দ শোনা গেল। "এই এলেন," বলিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ভানুমতী বঁটি লইয়া ফল কাটিতে বসিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিকঠাক করিয়া ঝির হাতে দিয়া ভানুমতী ছেলের ঘরের দিকে চলিলেন।

সুবীর মুখ ধুইতেছিল। মায়ের পদশব্দে তোয়ালে দিয়া মাথা-মুখ ঘষিতে ঘষিতে বসিবার ঘরে আসিয়া বলিল, "এই যে, আজ দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছ, অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি ত? মাসীমার জন্যে গাড়ী পাঠাতে পার এখন, আমার আর দরকার নেই।"

ভানুমতী বসিয়া বলিলেন, "এই যে পাঠাব আর-একটু পরে। যা ভয়ানক রোদ এখন। তুই খেতে বোস্। মেজদিদিকে কিন্তু আজ মেয়ে দেখার কথা আমি বল্‌ব, তারপর যেন আমাকে বিপদে ফেলো না।"

সুবীর বলিল, "না, না, তোমার ভাবনা নেই, দেখব যখন বলেছি তখন দেখবই, যা থাকে কপালে। আমাকে কি একলাই যেতে হবে নাকি? কবে এবং কোন্ সময়ে? শনি কি রবিবারে দিন ঠিক ক'রো, তা না হলে আমি কিন্তু পারব না।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, আসছে শনিবারের কথাই ব'লে দেব। একলা যাবি কেন, বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিস্। দেওয়ানজীকেও ব'লে পাঠাব, তিনিও আসবেন। একআধজন বুড়ো মানুষ সঙ্গে থাকা ভালো।"

সুবীর বলিল, "একজন কেন, দশজন বুড়ো তুমি সঙ্গে দিও। আর খুকীটিকে কি কি জিজ্ঞেস করতে হবে, তাও শিখিয়ে দিও। তা না হলে আমি হয়ত কি যা তা প্রশ্ন করব, সে ভয়ে কেঁদেই ফেলবে।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা, যা, সব-তাতে ফাজলামি! আমারও ত অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল, কই, কত কেঁদেছিলাম? বাঙালীর মেয়ে তেরো বছরেই বেশ পাকাপোক্ত হয়ে যায়। দেখিস এখন, কিছু খুকী নয়।"

সুবীর নীরবে খাইতে লাগিল। "যাই, মেজদিদির জন্যে গাড়ীটা পাঠিয়ে দিইগে," বলিয়া ভানুমতী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

১১

শোভাবতীকে আনিবার জন্য যে গাড়ী গিয়াছিল, সেটা ঘণ্টা-দুই পরে ফিরিল। সুবীর ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে। ভানুমতী সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া দিদিকে অভ্যর্থনা করিলেন, "মেজদি, উপরে উঠে এস, সোজা। ডাক্তারে ত আমার নীচে যাওয়া বারণই ক'রে দিয়েছে, আমি পারতপক্ষে আর সিঁড়ি মাড়াই না।"

শোভাবতী অতিকষ্টে একটা করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়ও ছিল একটি শিশু কন্যা, এবারেও তাই। তফাতের মধ্যে প্রথমবারের সঙ্গিনীটি ছিল তাঁহার কন্যা এবারেরটি তাঁহার নাতনী, দুর্গার কন্যা ইলা। শোভাবতীর নিজের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ক্রমে ম্লান হইতে হইতে একরকম কালোই হইয়া গিয়াছে।

চব্বিশ বৎসর বয়সের সে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র মতো দেহযষ্টি আর নাই, এখন তিনি বিপুলায়তনা বাঙালী গৃহিণী। মাথার সাম্‌নের চুলে পাক ধরিয়াছে, টাকও একটুখানি দেখা দিয়াছে, সেটা ঢাকিবার জন্য সীমন্তে খুব চওড়া করিয়া সিন্দুর লেপা। পরণে তাঁহার সেমিজের উপর বিপুল লাল পাড় যুক্ত গরদ; ব্লাউস্, পেটিকোট পরার উৎপাত তিনি অনেকদিন চুকাইয়া দিয়াছেন। গিন্নী-মানুষের আর সে-সবে প্রয়োজন কি? অঙ্গে কয়েকটি খুব মোটা মোটা সোনার গহনা। সচরাচর এগুলি ব্যবহার না করিলেও, ভানুমতীর বাড়ী আসিতে হইলে শোভাবতী সর্ব্বদাই যথাসাধ্য গহনা পরিয়া আসেন। নাই বা সেখানে কেহ থাকিল, তবু একে জমিদার বাড়ী, তাতে কুটুম্বের বাড়ী।

ইলাকে লইয়া উপরে উঠিতে শোভাবতী হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া ভানুমতী বলিলেন, "নামিয়ে দাও মেজদি, ইলাকে। ইদানীং যা মোটা হয়ে পড়েছ, আর ছেলেপিলে কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা তোমার পোষায় না। ওরে ও মাধী, এদিকে আয়, ইলাকে উপরে দিয়ে যা।"

মাধবী ছুটিয়া আসিয়া ইলাকে বহন করিয়া আনিল। শোভাবতী কোনোমতে উপরে উঠিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "কেন রে চোগ দিচ্ছিস? মোটা হব না ত কি? মোটা হবার ত বয়সই হয়েছে, নাতী নাতনীর মুখ দেখেছি। তোর মতো কি চারকাল প্যাকাটীর মত শরীরই থাকবে? দেখিস্ এখন, বৌ এলে তোকে কিরকম বেমানান দেখাবে তার পাশে।" শোভাবতীকে মোটা বলিলে তিনি বড়ই চটিয়া যান।

ভানুমতী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আগে বৌই আসুক, তারপর আমায় যেমন দেখাবার দেখাবে। চল, ঘরে বসবে চল, একেবারে হাঁফিয়ে পড়েছ। মাধী, খুকীকে নিয়ে তুই নীচে যা, ভবানীকে বল্ ওকে মিষ্টি দিতে। উপরে পান আর খাবার জল পাঠিয়ে দে।"

কথা বলিতে বলিতে, দুই বোনে আসিয়া ভানুমতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দিনের বেলায় অসহ্য গরম কাটিয়া গিয়া এখন সন্ধ্যার সময়

বেশ একটুখানি ঝিরঝির করিয়া হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেঝের উপর একখানা মাদুর পাতিয়া ভানুমতী বলিলেন, "বোস ভাই মেজদি। তারপর তোমার কর্ত্তাটির খবর কি? আর যে একেবারেই এ-মুখো হন না?"

শোভাবতী বলিলেন, "আছেন একরকম। শীতটা গিয়ে বাতের বেদনার খানিকটা গিয়েছে। কোন্‌মুখোই বা হন? সারাদিন ত আছেন নিজের কাগজপত্র, মক্কেল আর আদালত নিয়ে। ছেলেটার ক'টা ভালো ভালো সম্বন্ধ এসে ফিরে গেল, তা সেদিকেও খেয়াল নেই। নিজের কেস নিয়েই আছেন। আমি আছি ব'লে তাই, তা না হলে খাওয়া-নাওয়াও এতদিনে উঠে যেত বোধহয়।"

ভানুমতী উৎসুক হইয়া বলিলেন, "অনেক সম্বন্ধ আসছে নাকি সুশীলের? ওমা, তা বাপ একবার খেয়ালও করে না? বিয়ে দেবার মতলব নেই নাকি ছেলের?"

শোভাবতী তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "কে জানে! বললে বলেন, রোস, রোস, এরই মধ্যে তোমার ছেলের বিয়ের বয়স উৎরে গেল নাকি? ক'হাজার কামাচ্ছে তোমার ছেলে? বিয়ে করে বৌকে খাওয়াতে পারবে ত?"

ভানুমতী বলিলেন, "আহা, ঘরে খাবার বড় ভাবনা, সেই দুঃখে আর ছেলের বিয়েই হচ্ছে না! আজকালকার পুরুষমানুষগুলির ধরণই হয়েছে এক অদ্ভুত! যেমন ছেলে, তেমনি বুড়ো। খোকাটাকে দেখ না, একবার বিয়ের নাম করলেই যেন মারমুখো হয়ে আসে। এবার তবু কত কষ্টে একটুখানি নিমরাজী মতন হয়েছে। সেইজন্যেই আজ তোমায় আসতে বললুম, এই বেলা যদি কিছু পাকাপাকি ক'রে নেওয়া যায়।"

শোভাবতী উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা রাজী হয়েছে তাহলে? ওরা ত শুনলে বর্ত্তে যাবে। আমার ত গায়ের মাংস খুবলে খাচ্ছে, কবে মেয়ে দেখতে আসবে, কবে মেয়ে দেখতে আসবে ক'রে। এইবার তাহলে ব'লে দেব। কি বললে খোকা?"

ভানুমতী বলিলেন, "পুরোপুরি রাজী আর কই? তবে অনেক বলা-কওয়াতে মেয়ে দে'খে আসতে রাজী হয়েছে। আমি বলেছি মেয়ে যদি তার পছন্দ না হয়, তবে আমি আর কথাটি কইব না। মেয়ে খুব সুন্দর ত? আমি সেই আশায় আছি। তা না হলে যে মাথা-পাগলা ছেলে আমার, কোন্ দিন এক মেম বৌ এনেই হয়ত হাজির করবে। বড় ভয়ে ভয়ে আছি।"

মাধবী পান ও জল আনিয়া রাখিল। গোটা-দুই পান একসঙ্গে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া, অস্পষ্ট স্বরে শোভাবতী বলিলেন, "তা মেয়ে কিছু নিন্দের নয়, আমার নিজের চোখে দেখা মেয়ে। তোমাদের ঘরের কিছু অযুগ্যি হবে না। রং খুব ফরশা, তোর মতো হবে। চুল খুলে দেখিনি তবে খুব চুল আছে ব'লে শুনি। তা, কবে সুবিধে হবে বলে দিস; ওরা দিন দে'খে সব ঠিক করবে।"

ভানুমতী বলিলেন, "শনি-রবিবারের মধ্যে যদি ভালো দিন থাকে, তাহলে তখনই যেন ঠিক করে। অন্যদিন আবার খোকার কলেজ থাকে, সে যেতে চাইবে না। দুচারজন বন্ধুবান্ধব তার সঙ্গে যাবে বোধ হয়। তাছাড়া দেওয়ানজীকে আসতে লিখতে হবে, সময় ঠিক ক'রে তিনিও যাবেন। একজন বোঝা-শোনা মানুষও সঙ্গে থাকা ভালো।"

শোভাবতী বলিলেন, "তবে তাই বলে দেব। ওদের বড় মেয়েটার শ্বশুরবাড়ী আমার বাড়ীর খুব কাছেই, রোজই ছাতে উঠে কথাবার্ত্তা বলে। তাকে বললেই সে তখুনি খবর পাঠিয়ে দেবে। তারপর, তুই আছিস কেমন? একটু যেন ভালোই দেখছি। এবার একাদশীর পর আর অসুখ করেনি ত?"

ভানুমতী বলিলেন, "না, এবার ত অনেকটা ভালোই আছি। গরমটা কম্‌লে আর-একটু সারব বোধ হয়। ডাক্তারে বলছে পুজোর ছুটিতে হাওয়া বদল করতে যেতে, কোথায় যাব তাই ভাবছি। আমার ইচ্ছা পুরী যাই, তা খোকা যেতে চায় না; বলে, 'ওখানে দেখবার

জিনিষের মধ্যে সমুদ্র আর ভিড়, দুটোই আমার দেখা আছে, আর দেখতে চাই না'।"

শোভাবতী বলিলেন, "আমরা এবার দেওঘর যাচ্ছি, চল্-না আমাদের সঙ্গে? খোকা না-হয় তার যেখানে খুসি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেড়িয়ে আসবে। তুই গেলে ত আমিও বাঁচি, একজন কথা বলবার লোক পাওয়া যায়।"

ভানুমতী বলিলেন, "সে হলে ত আমিও বাঁচি। যাক, সে এখনও মাস-দুইতিন পরের কথা। এখন আগে খোকার বিয়ের একটা ব্যবস্থা যেমন ক'রে হোক করতে হচ্ছে। যা ত শরীর, কবে আছি, কবে নেই। এখন একটি নাতী দে'খে যেতে পারলে আর দুঃখ থাকে না। নিজের সব গহনাগুলো দিয়ে সাজিয়ে, একটি টুকটুকে বৌএর মুখ দেখতেও বড় সাধ যায়।"

শোভাবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অত সাধ ক'রে তোর জন্যে সব গড়িয়েছিল রে! ক'দিনই বা পরতে পেলি? এখন কোন্ ঘরের কোন্ বেটী এসে জুড়ে বসবে।"

ভানুমতী বলিলেন, "যাক্ গে ভাই, সে কথা আর তুলিস্ নে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল ঘটেছে, এখন বৌএর অদৃষ্টে যেন শাঁখা, সিঁদুর, গহনা, সব অক্ষয় হয়ে থাকে। তুমি আজই ওদের খবর দিও কিন্তু।"

শোভাবতী বলিলেন, "তা ঠিক দেব। তোর গাড়ীটা একটু ব'লে দে, আমায় দিয়ে আসুক গিয়ে। আজ আবার দুর্গার দেওর-দুটোকে খেতে বলেছি, একটু রান্নাবান্নাগুলো না দেখলে চল্বে না।"

শোভাবতী চলিয়া যাইবার পর, সুবীরের অপেক্ষায় ভানুমতী খানিকক্ষণ বসিয়াই রহিলেন। কিন্তু মাসীমার সহিত দেখা হওয়ার ভয়েই হোক, কি সিনেমাতে গিয়াছিল বলিয়াই হোক, সুবীর সেদিন অনেক দেরি করিয়াই ফিরিল। তাহার পূর্ব্বেই ভানুমতীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, ভবানী জোর করিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিল। কারণ ডাক্তার তাহাদের বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রাত ন'টার বেশী যেন ভানুমতীকে কিছুতেই

জাগিতে না দেওয়া হয়। সুতরাং সেরাত্রে আর মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হইল না।

সকাল হইবামাত্র সুবীর মায়ের মুখে খবর পাইল যে, সাম্‌নের শনিবারেই তাহাকে ক'নে দেখিতে যাইতে হইবে, সেদিন ভালো লগ্ন আছে, দেওয়ানজীকেও আসিতে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখন সুবীর কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইতে চায়, যেন ঠিক করিয়া রাখে। "আচ্ছা, আচ্ছা," বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কলেজ যাইবার ছুতা করিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিল।

কলেজে গিয়া চন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ বলিয়া আর-একটি ছেলেকে সে এই বিজয়যাত্রার সঙ্গী নির্ব্বাচন করিল। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে,—বড় সুশীল ও সুবোধ বালকের মতো মায়ের নির্ব্বাচিত কনে দেখতে চলেছিস্? তোর এত-সব বক্তৃতা গেল কোথায়?"

সুবীর বলিল, "কনে দেখার বিরুদ্ধে ত আমি কোনো বক্তৃতাই করিনি। বিয়ে করব এমন কোনো কথা আমি দিই নি।"

প্রবোধ বলিল, "বিয়েই যদি কর্‌বে না ত মেয়ে দেখতে গিয়ে লাভ? এ ত সার্কাস্ বা বায়োস্কোপ নয়?"

সুবীর বলিল, "তাঁরা এবং আমার মা যখন আমাকে সে মেয়ে না দেখিয়ে ছাড়বেন না, তখন আমি দেখাটা চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। তা না হলে ভদ্রলোকের মেয়েকে অকারণ সংএর মতো সাম্‌নে এনে দাঁড করাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই।"

চন্দ্রনাথ বলিল, "মেয়ে যদি খুব সুন্দরী হয়, এবং তোর পছন্দও হয়, তাহলেও তুই বিয়ে কর্‌বি না?"

সুবীর বলিল, "আমার পছন্দ হবে না, পরীর বাচ্চা হলেও না। বারো-তেরো বছরের মেয়েকে বিবাহের purposeএ পছন্দ হওয়াটাকে আমি চরিত্রের একটা criminal weakness মনে করি! যাদের মা-বাবার কোলে থাক্‌বার কথা, তাদের ছেলের মা হতে বাধ্য করাটা আইনে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।"

প্রবোধের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বৌ এখন পর্যন্ত কিশোরীই। সে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তুমি বড় strong language ব্যবহার কর হে। অমন বলেও সবাই, বিয়েও শেষে ছোট মেয়েকে করে সবাই। যে দেশের যা। আমাদের পাঁচজনের ঘরে একেবারে পাকাপোক্ত ঝানু মেয়ে নিয়ে এসে, নিজেদেরও অসুবিধা, তাদেরও অসুবিধা।" অপ্রিয় প্রসঙ্গ বলিয়া কথাটা তিন বন্ধুতে ঐখানেই চাপা দিল।

শনিবার দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। কনের বাড়ীর লোক খুব খুসী হইয়াই দিনক্ষণ সবতাতেই রাজী হইয়াছে। বৃদ্ধ দেওয়ানজীও সময় মতো আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুবীর ও তাহার দুই বন্ধু তাহার বসিবার ঘরে বসিয়া সময়োপযোগী গোলমাল করিতেছে। অন্তঃপুরে শোভাবতী, দুর্গা, বিজনবালা, তাহার ছোট জা, প্রভৃতি মিলিয়া বিধিমতে ছেলেকে যাত্রা করাইয়া পাঠাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। একমাত্র ছেলে, কোথাও যেন বিন্দুমাত্র ক্রিয়াকলাপের ত্রুটি না হয়, এই ভানুমতীর ইচ্ছা। তিনি বিধবা, তাঁহার শুভকর্ম্মের কোথাও ছায়াপাত করিতে নাই, তিনি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

নিতান্তই কনে দেখিতে যাইবার ব্যাপার, তাহা লইয়া কত আর ঘটা করা যায়? শীঘ্রই সুবীরের ডাক পড়িল। সে বন্ধুদের বসিতে বলিয়া ভিতরে আসিবামাত্র, তাহার মা, মাসী, দিদি, কাকী প্রায় সমস্বরে কথা বলিয়া উঠিলেন। শোভাবতী বলিলেন, "এই এক আমাদের ভট্‌চায বামুন ছেলে হয়েছেন! কেন রে, একখানা ভাল কাপড়-জামাও কি পরতে নেই? এ কি কারো বাপের শ্রাদ্ধে মন্ত্র পড়াতে যাচ্ছিস?"

ভানুমতী বলিলেন, "কোথায় পাবে বল? মাত্র তিন আলমারী কাপড় জামা চাদর ওর। সে-সব কার জন্যে জমা করছিস্?"

সুবীর কথা না বলিয়াই ফিরিয়া গেল, এবং মিনিট-কয়েক পরে ঢাকাই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, বেনারসী চাদরে সজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ভানুমতীর ইচ্ছা ছিল, দামী রিষ্টওয়াচ, হীরার আংটি, বোতাম, প্রভৃতিগুলোও

ছেলের গায়ে ওঠে; কিন্তু বেশী বকাবকি করিলে পাছে ছেলে একেবারে বাঁকিয়া বসে, এই ভয়ে তিনি আর কিছু বলিলেন না। শীঘ্রই বিধিমতে যাত্রা করিয়া, মোটর-হর্ণের শব্দে পাড়া কাঁপাইয়া সুবীর কনে দেখিতে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী এবং তাঁহার সঙ্গী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর-একখানা ধারকরা মোটরে করিয়া পিছনে চলিলেন।

মেয়ের বাপ রাধিকাপ্রসাদ মিত্র ওকালতী করিয়া নিতান্ত কম পয়সা রোজগার করেন নাই। আজকাল কর্ম্ম হইতে একরকম অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ভবানীপুরেই কিছু দূরে তাঁহার বাড়ী। আত্মীয়স্বজন লইয়া পরিবারটি নিতান্ত ছোট নয়।

বৈঠকখানায় তখন বাড়ীর লোক, আত্মীয়-কুটুম্ব, পাড়াপ্রতিবেশী মিলিয়া রীতিমতো ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। জমিদার-পুত্র ভাবী বরকে দেখিতে মেয়েদেরও উৎসাহের অন্ত নাই, কাজেই অন্তঃপুরও কোলাহল-মুখরিত। দুইটি ঘরে লোক জমা হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। ভাঁড়ার ঘরে, যেখানে জলখাবার সাজানো হইতেছে, সেখানে বাড়ীর যত বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার সঙ্গে পাড়ার যত গৃহিণীর দল আসিয়া যোগ দিয়াছেন। অবাধে সমালোচনা চলিতেছে। আর-একটি বড় ঘরে, সেটি বাড়ীর এক বৌএর শয়নকক্ষ, কনে সাজানোর জের এখনও চলিতেছে। বার পাঁচ-ছয় সাজ বদল করিয়া কনে বেচারী এতক্ষণে যেন একটু নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ঘরভরা বালিকা, কিশোরী ও তরুণী। এখনও কেহ বা কনের চুলটা একটু টানিয়া সাম্‌নে নামাইয়া দিতেছে, কেহ বা গালে ও কপালে অল্প একটু পাউডার যোগ করিয়া দিতেছে, এখানের ব্রোচটি টানিয়া ওখানে করিয়া দিতেছে।

এমন সময় বাহিরে মোটরের বাঁশী শোনা গেল। "ঐ রে, এসে পড়েছে," বলিয়া বালকবালিকার দল বাড়ী কাঁপাইয়া সদরের দিকে দৌড় দিল। কিশোরী ও যুবতীর দল দরজা-জানালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারিয়াই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুবীরদের মোটর-দুইখানা বাড়ীর সামনে আসিবামাত্র, বৈঠকখানা হইতে তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রায় শ'খানিক লোক বাহির হইয়া আসিল। বিপুল সমারোহ করিয়া তাহাদের লইয়া গিয়া বসানো হইল। মেয়ের বাপখুড়ো প্রভৃতির সঙ্গে দেওয়ানজী ও তাঁহার প্রৌঢ় সঙ্গীটিই কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, ছেলেরা একটু দূরেই বসিল। পাড়ার যুবকের দল তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য আসিয়া জুটিল।

প্রথমে আসিল জলখাবারের ডাক। সকলকে পাশের ঘরে উঠিয়া যাইতে হইল। চারজনের জায়গা পাশাপাশি করা হইয়াছে, মার্ব্বেল-মণ্ডিত মেঝের উপর। আসনগুলি কালো মখমলের, বাসনগুলি রূপার এবং শ্বেত পাথরের। এক একজনের জন্য যাহা জলখাবার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গোটা চার মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পারে। থালা, রেকাবী, বাটি, গেলাস বহুদূর জুড়িয়া সাজানো হইয়াছে। সুবীর বসিয়া চন্দ্রনাথের কানেকানে বলিল, "কি হে, হামাগুড়ি দিতে হবে নাকি শেষে? এত দূর পর্য্যন্ত হাত ত পৌছবে না। কনের বাড়ীর লোকেরা কি আমাদের মানুষের আদিপুরুষ ব'লে ভ্রম করছেন?"

প্রবোধ বলিল, "গল্প শুনেছি, অনেক বনিয়াদী বাড়ীতে এইরকম ক'রে খাবার সাজালে, সঙ্গে একটা বাঁকানো কাঠের লাঠি দিয়ে দেয়, বাটিগুলো টেনে নিতে পারে।"

সুবীর বলিল, "ভাগ্যে আমাদের তা দেয়নি। আমি অন্ততঃ লাঠি দেখলে তার অর্থ অন্যরকম করতাম।"

হাস্যালাপের ভিতর জলযোগ শেষ হইয়া গেল। যাহা খাইল, তাহার দশগুণ জিনিষ নষ্ট করিয়া, নিমন্ত্রিতের দল উঠিয়া গেল। বৈঠকখানায় গিয়া বসিবামাত্র মেয়ের এক খুড়া হাঁকিয়া বলিলেন, "ওরে নলি, পান দিয়ে যা।"

কন্যা পান লইয়া প্রবেশ করিল। ইহাই রীতি, অতএব বাড়ীতে একশ' জন চাকর-বাকর থাকিলেও মেয়েকেই পান লইয়া আসিতে হইবে। অবশ্য তাহার হাতে একটি মাঝারী গোছের রূপার ডিবা; বেশীর ভাগ পান-মশলা

দাসীতেই বহন করিয়া আনিল। মেয়ে পান আনিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজীর সাম্‌নে রাখিল, কোনোমতে একটা প্রণামও তাঁহাকে করিয়া ফেলিল।

চার-পাঁচজোড়া চোখ আসিয়া পড়িল মেয়েটির মুখের উপর। সুবীর দেখিল, সামনে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া, তাহার রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখশ্রীও সুন্দর। তবে সে নিতান্তই বালিকা, বয়স কিছুতেই তেরোর বেশী হইবে না। তাহার মনে হইল, একটু কম করিয়া সাজাইলে ইহার স্বাভাবিক শ্রী অনেকখানিই ধরা পড়িত। মূল্যবান্ বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ী, জামা ও ধারকরা মণিমুক্তার ভারের তলায় মেয়ে যে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে তাহাকে প্রায় খুঁজিয়া পাওয়াই ভার। তবু মেয়েটি যে সুন্দরী সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।

মেয়ের সহিত কথা বলার ভার বৃদ্ধ দেওয়ানই গ্রহণ করিলেন। কনের নাম নলিনী, সে ফোর্থ্ ক্লাশে পড়ে। রান্নাবান্না শিখিতেছে, আলুর দম ও মাংস রাঁধিতে জানে, শিঙাড়া, পান্তুয়া প্রভৃতিও অল্প জানে। শেলাই শেখে সে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর কাছে। তাহার হাতের-কাজ কয়েকটি পরীক্ষার্থে উপস্থিতও করা হইল। মোটের উপর সে বেশ প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সুবীর বা বন্ধুরা কন্যাকে কোনো প্রশ্নই করিল না।

চন্দ্রনাথ বলিল, "কি হে, কেমন দেখছ? আমার ত সবদিক্ দিয়ে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।"

সুবীর বলিল, "ভালোই ত।"

প্রবোধ বলিল, "তবে চাঁদ পথে এসো। এই না ছোট মেয়ে তোমার ভারি অপছন্দ? এবার কেমন?"

সুবীর বলিল, "আমার মতের কোনো পরিবর্ত্তন হয়েছে ব'লে ত বুঝছি না। মেয়েটি দেখতে ভালো, লেখাপড়া কাজ-কর্ম্ম শিখেছে, কিছুই অস্বীকার করা যায় না। আমার যদি মেয়ে adopt করবার সখ থাকত, তাহলে একে ঠিক পছন্দ করতাম। বেশ কচি মুখ, গাল টিপলে দুধ বেরয়।"

তাহার বন্ধুরা বলিল, "তোমার মত ফাজিল তুনিয়ায় নেই হে! কি চাও তুমি?"

সুবীর বলিল "জানি না। হয়ত কখনও কাউকে দে'খে মনে হবে 'একে চাই'। তখন বুঝবে আদর্শটা কি।"

মতামত পরে জানানো হইবে বলিয়া বরপক্ষ প্রস্থান করিলেন। কন্যাপক্ষে তখন বরের চেহারা, স্বভাবচরিত্র, প্রভৃতি লইয়া মহা সমালোচনা লাগিয়া গেল। সুবীর যে নিশ্চয়ই বেশ কিছু অহঙ্কারী এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত দেখা গেল। হইলই বা জমিদারের ছেলে, তাই বলিয়া এত নাক সিঁট্‌কাইবার ঘটা কেন? তাহারা কি এতই ফেল্‌না? তাহাদের মেয়ে পাইলেও অনেক লোকে লুফিয়া নেয়।

১২

স্কুলের ঘণ্টা পড়িতে তখনও কিছু দেরি ছিল, কৃষ্ণা সেই অবসরে নিজের ঘরখানা গোছাইয়া-গাছাইয়া একটু ভদ্র করিয়া তুলিতেছে। সবে কাল সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কাজেই জিনিষপত্র যেমন-তেমন-ভাবে ঘরময় ছড়ানো। বাক্স এখনও তালাবন্ধ সুট্‌কেস্‌টাও তাই, কেবল বিছানা খোলা হইয়াছে।

কৃষ্ণার ঘরখানা ছোটই, বাতাসও বিশেষ নাই, তবে আলো আছে, এই যা রক্ষা। ঘরের দেওয়ালে কৃষ্ণার নিজের, তাহার সহপাঠিনী বন্ধুদের এবং তাহার পালিকা মাতার অনেকগুলি ছবি, সুদৃশ্য কালো ফ্রেমে বাঁধানো। এক কোণে একটি কালো মেহগনির ড্রেসিং চেষ্ট্, আর-এক কোণে আয়না। ঘরের সব আস্‌বাব খুব চক্‌চকে কালো পালিশের।

সুট্‌কেস্‌ খুলিয়া তাহার ভিতরের কাপড়, ব্লাউস, পেটিকোট প্রভৃতি কৃষ্ণা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। সেগুলি পরিপাটি করিয়া আনায়ন্

গোছাইতেছে, এমন সময় দরজায় টোকা দিয়া মিহি গলায় কে জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আস্‌ব ?"

কৃষ্ণা বলিল, "এসো।" মেয়েটি ঢুকিয়া একখানা চিঠি আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "দারোয়ান এখুনি দিয়ে গেল।"

উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়াই কৃষ্ণা বুঝিল চিঠিখানা লাবণ্যর। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "বাপ্‌রে, কি অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি, সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় চিঠি হাজির।"

ঠিক এই সময় ঢং ঢং করিয়া স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। হাতের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চিঠিখানা বন্ধ অবস্থাতেই একটা দেরাজে ঢুকাইয়া দিয়া, কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি জুতা-মোজা পরিয়া নীচে নামিয়া গেল। লম্বা ছুটি-ভোগের পর, আবার একটানা পাঁচ ঘণ্টা চীৎকার করিয়া পড়াইতে তাহার বেশ পরিশ্রম বোধ হইতে লাগিল। মেয়েগুলি দেড়মাস মা-বাপের আদর খাইয়া আরো যেন বেয়াড়া হইয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ ছুটির পড়া কিছুই করে নাই। অনেক বকুনি এবং শাস্তি বিতরণ করিয়া একেবারে শ্রান্ত হইয়া চারটার সময় কৃষ্ণা আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

চা না খাইয়া আর কাজে হাত দিবে না ঠিক করিয়া সে খাটের উপর একটু গড়াইয়া লইল। লাবণ্যের চিঠি তখনও পড়া হয় নাই। দেরাজ হইতে সেটা টানিয়া বাহির করিয়া শুইয়া শুইয়াই পড়িতে লাগিল।

গিরিধি
বাণীকুঞ্জ

ভাই কৃষ্ণা,

তুই গিয়ে গিরিধিটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। তুই নামে কালো, কিন্তু কাজে ছিলি আলো। যা হোক, আর দিন-পাঁচ পরে আমিও যাব মনে ক'রে বিরহটা কোনোমতে সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বেড়ানোটা বন্ধই আছে, কার সঙ্গেই বা বেড়াব ? রাতদিন শেলাই ক'রে ভাই-বোনদের এক বছরের

কাপড়-চোপড় ক'রে দিচ্ছি, যাতে পুজোর ছুটিতে এসে আবার না সিঙ্গারের কল নিয়ে বসতে হয়।

লীলা, বেলা, নূতন ফ্রক প'রে একদিন বেড়াতে এসেছিল, দুজনকেই বেশ মানিয়েছে। খোকা নাকি তার খেল্‌না এরই মধ্যে ভেঙ্গে ফেলেছে।

এখন আসল কথা পাড়া যাক্‌। তুই আমায় কাজের সন্ধান পেলে চোখকান খোলা রাখতে বলেছিলি, না? আমি কল্‌কাতায় না গিয়েই এক কাজের সন্ধান পেয়েছি। মাইনে বেশ আছে, তোর আমেরিকা যাবার জাহাজ ভাড়াটাড়া গোছাবার সুবিধাই হবে। তবে কাজটা তোর সুবিধার লাগবে কিনা তা জানি না।

আমাদের বাড়ীর সামনের লাল বাড়ীটা এতকাল খালি থেকে হঠাৎ এক ভাড়াটে লাভ করেছে, দেখেই গিয়েছিলি। কাল অকস্মাৎ তাদের বাড়ীর একপাল মেয়ে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী এসে হাজির। তুই তখন সবে বিদায় হয়ে গিয়েছিস্‌। সন্ধ্যাটা একরকম ক'রে কেটে যাবে আশা ক'রে তাদের সাদরেই অভ্যর্থনা করেছিলাম। দুটি বৌ, একটি গিন্নী এবং গোটাচার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। গিন্নীর স্বামী মস্ত বড়মানুষ, লাখপতি একেবারে। বর্ম্মাতে কাঠের ব্যবসা করেন। তিনি নানা স্থানে ঘোরেন, গিন্নী ছেলেপিলে বৌ ইত্যাদি নিয়ে রেঙ্গুনেই বাস করেন। তা না হ'লে ছেলেপিলের পড়াশোনার সুবিধা হয় না। বড় ছেলেদুটি বিলাতে আছে, বৌদের গিন্নী নিজের কাছেই রেখেছেন। এদের ইংরেজী পড়াতে এবং গানবাজনা শেখাতে চান। তাঁদের ভয়, পাছে বিলাত থেকে এসে অশিক্ষিতা স্ত্রীদের ছেলেরা পছন্দ না করে। কিন্তু মেমের কাছে পড়াতে সম্পূর্ণ নারাজ। একটি বাঙালী টীচার চান, ব্রাহ্ম কি হিন্দু হ'লেই ভাল, ক্রীশ্চান্‌ হ'লেও খুব বেশী আপত্তি নেই। তবে গোরু-টরু না খায়, এমন হ'লেই ভাল। তাকে থাকার ঘর, খাওয়া-দাওয়া বাদে দু'শো টাকা মাইনে দিতে রাজী আছেন, যদি শেলাই, গানবাজনা, পড়ানো, সবেরই ভার নিতে পারে।

শুন্‌বামাত্র আমার তোর কথা মনে হ'ল। একাধারে এত গুণ এক তোর আছে ব'লেই জানি। দেখ্‌, করবি নাকি ? খাওয়া-দাওয়ার কোনো খরচ নেই, বাবুগিরি ক'রে যদি একশ টাকাও ওড়াস্‌, তা'হলেও একশ টাকা মাসে save করতে পারবি। বছর খানেক কাজ করলেই তোর passage money জমা হয়ে যাবে।

ভেবেচিন্তে কাজ করিস কিন্তু বাপু। আমি শুধু সন্ধান ব'লে দিচ্ছি, এদের সঙ্গে আমার চেনাশোনাও নেই, কেমন মানুষ, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। মগের মুল্লুক, নিতান্ত কাছেও নয়। তোর বয়স অল্প, রূপের বালাইও কম নেই, বিপদের আশঙ্কা আছে। তবে এদের বাড়ীটা একেবারে প্রমীলার রাজ্য, নিতান্ত বাচ্চা ছাড়া পুরুষ-জাতীয় কোনো জীব নেই বোধ হয়, সেদিক্‌ দিয়ে খানিকটা safe; আর রেঙ্গুনে আমাদের চেনা-শোনা বাঙালী আরো ছু-চার ঘর আছেন, তাঁরাও তোর খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। দেশে থাকলে বেশী মাইনে তুই পাবি না। বড় জোর একশ, তাও পাওয়া খুব শক্ত।

গিন্নীটিকে মানুষ ভালো মনে হল, তাই তোর কথা বল্‌লাম। তিনি ত তোকে না দে'খেই রাজী, এখন তুই রাজী হলেই হয়। এরা মাসখানিক পরে কল্‌কাতায় যাবে, সেখান থেকে বর্মায় ফিরবে। তুই যদি কাজটা নিতে চাস্‌ তাহলে আমি তোকে নিয়ে গিয়ে এদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে দেব। তাদের কথায়-বার্ত্তায় বুঝলাম বেশ smart, up-to-date মানুষই এরা চায়, তবে অতিশয় বেশী modernism বোধহয় তাদের হজম হবে না। এক কথায় তারা ঠিক তোর মতো একটি মানুষ চায়। এখন তোর পছন্দ হলেই হয়।

চিঠির উত্তর এখানেও দিতে পারিস্‌, কি আমি ফিরবার পর মুখেও বল্‌তে পারিস্‌।

কেমন আছিস ? আমরা সব একরকম। বৃষ্টির জ্বালায় কিছু আর ভালো লাগে না।

ইতি—লাবণ্য

চিঠিখানা শেষ করিয়া কৃষ্ণা ভাবিতে লাগিল কি তাহার করা উচিত। টাকার লোভ যে না আছে তা নয়, আবার দেশ ছাড়িয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু চিরকালই এই পঞ্চাশ টাকার কাজে তাহার চলিবে নাকি? আমেরিকা কি বিলাত যাইতে পারিলে যথেষ্ট সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু টাকা জোগাড় করিতে হইবে তাহার নিজেকেই। সুতরাং এই ধরণের চাকরি করা ছাড়া উপায় কি?

মানুষগুলি কেমন কে জানে? কোনো বিপদ্-আপদ্ ঘটিবে না ত? বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ নাই, একটা সুবিধার কথা। কিন্তু তবু অনেকখানি বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। জগতে তাহার আপনার বলিতে যখন কেহই নাই, তখন অত ভাবিলে আর চলে কই? তাহাকে আগলাইবার মানুষ যখন ভগবান্ রাখেনই নাই, তখন কনে বৌ হইয়া থাকার লোভ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। মনে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া সংসারে অকুণ্ঠিতভাবে চলাফেরা করা ছাড়া উপায় কি? সে চাকরিটা লইবেই ঠিক করিয়া ফেলিল, যদি বাড়ীর লোকগুলিকে দেখিয়া-শুনিয়া তাহার পছন্দ হয়। লাবণ্যকে চিঠি লিখিয়া আর কাজ নাই। দুদিন পরে ত সে আসিয়াই পৌঁছিবে।

ঢং ঢং করিয়া চায়ের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। খাট ছাড়িয়া উঠিয়া, পা'দুখানা একজোড়া মখমলের চটীর ভিতর ঢুকাইয়া কৃষ্ণা নীচে চলিয়া গেল। আহারান্তে ফিরিয়া তাহার আর ঘর গোছানোর কাজে ভিড়িতে মোটেই মন গেল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, এঘরে আর ক'দিন আছি? দুদিন বাদেই পোঁটলাপুঁটুলি বাঁধিয়া কোন্ পথে যাত্রা করিতে হইবে ঠিকানা নাই। নিতান্ত না করিলে নয়, এমন গোটা-কয়েক কাজ সারিয়া সে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

মাঝের ক'টা দিন অনেকরকম ভাবনাই সে ভাবিয়া লইল। কিন্তু যাওয়াটাই শেষ পর্য্যন্ত স্থির রহিল। শুধু কলিকাতা আর গিরিধি, গিরিধি আর কলিকাতা করিয়া কতদিন কাটানো যায়?

অচেনা অদেখা দেশের টান যেন তাহার শিরায় এখন হইতেই বাজিতে আরম্ভ করিল!

লাবণ্য ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সে বড় অস্থিরভাবে দিন কাটাইতে লাগিল। কোনো কাজেই সে মন দিতে পারে না। কেবলই মনে হয়, দুদিনের জন্য কেন আর এত হাঙ্গামা করা। অথচ চারিদিকের অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলা ভিতরে ভিতরে কেবলই তাহাকে পীড়া দিতে থাকে।

যাই হোক, কোনোমতে মাঝের চারপাঁচটা দিন কাটিয়া গেল, লাবণ্যও কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। স্কুলের কাজ সারিয়া ফেলিয়া, চা খাইয়া লাবণ্যের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ফিরিতে রাত হইলেও হইতে পারে, এজন্য মেট্রনকে তাহার ঘরে খাবার রাখিয়া দিতে, এবং দারোয়ানকে গেট খোলা রাখিতে উপদেশ দিয়া গেল।

কৃষ্ণা লাবণ্যের স্কুলে পৌছিয়া দেখিল, মেয়েরা মাঠে বেড়াইতেছে, লাবণ্য তাহার চিরসঙ্গী শেলাই হাতে করিয়া বেঞ্চে বসিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছে। কৃষ্ণাকে দেখিয়া সে শেলাই রাখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কাজটা নিবিই মনে হচ্ছে। তা না হলে শুধু কি আর আমার টানে, এত সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিস ?"

কৃষ্ণা তাহার পিঠে এক কিল মারিয়া বলিল, "তুই ভারি মিথ্যাবাদী। কবে আমি তোর সঙ্গে দেখা করতে আসতে এক বছর দেরি করেছি শুনি ?"

লাবণ্য বলিল, "তা অবশ্য করিস না। তাই ব'লে যেদিন আসি, সেই দিনই কিছু তোর দেখা পাই না। আচ্ছা, ঝগড়া থাক্ এখন। এইখানেই বসা যাক, আমার এখন ঘরে ঢোকবার জো নেই। তারপর, তুই কি ঠিক করলি বল্।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি ত যাবই ভাবছি। দুশ টাকা, আর পঞ্চাশ টাকায় ঢের তফাৎ। অবশ্য মানুষগুলিকে না দে'খে কিছু বলতে পারি না। হাজার হোক, মেয়েমানুষ ত ? তার উপর আবার বাঙালীর মেয়ে। প্রাণে ভয়-ডর আছে ত ?"

লাবণ্য বলিল, "আমার ত বিশ্বাস তোর ভালোই লাগবে। আমি যেটুকু দেখলাম, তাতে আমার কিছু মন্দ লাগে নি। গিন্নীটি একটু হাবাগোবা ধরণের, তবে মনটা ভালো। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা দুচারটা বলবেন, তোকে সেগুলো সয়ে যেতে হবে। বৌ-দুটি বেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, মিশুক-প্রকৃতির লোক, তোর ভালোই লাগবে। খোঁজখবর নিয়ে যতদূর জানলাম, ওরা মানুষ ভালোই। রেঙ্গুনে আমার এক কাকা থাকেন, তাঁর কাছেও চিঠি লিখেছি খোঁজ নেবার জন্যে। ওরা আর দশ-পনেরো দিন পরেই কল্‌কাতা আসবে, এখানে মাস-খানেক থেকে তারপর রওনা হবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "তবে সে-ক'দিন অপেক্ষা ক'রেই দেখি। এখনি কাজে নোটিস দেব না। শেষে একূল ওকূল দুকূল যাবে?"

লাবণ্য বলিল, "নোটিস দেবার ঢের সময় পাবি; ওরা কলকাতায় একমাস থাকবে ত? সেই এক মাসের নোটিস দিলেই চলবে। আমি বলি, তুই কাজ নে। তোর স্বভাবে পঞ্চাশ টাকার কাজ করা বেশীদিন সইবে না। এর থেকে বেশ বড় সুবিধা তোর হতে পারে।"

কৃষ্ণা বলিল, "দেখাই যাক। আচ্ছা, ওদের সব কেমন দে'খে এলি? লীলা, বেলা কেমন আছে? খোকাটা আরো দুষ্টু হয়েছে নাকি?"

দুই সখীতে তখন ঘরোয়া গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়ের দল তাহাদের সামনে দিয়া ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতেছিল। কৃষ্ণার রূপ সম্বন্ধে যে গভীর আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ইহারা বসিয়া বসিয়াই টের পাইতেছিল। লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "দেখ্, মেয়েমানুষেরই মুণ্ডু ঘুরে যায় তোর চেহারা দে'খে, ছেলের পালের মধ্যে পড়লে তাদের যে কি দশা হয়, তাই ভাবছি।"

কৃষ্ণা বলিল, "অকারণ ভাবনা খরচ ক'রে কি করবি, আমি ত আর ছেলেদের কোনো কলেজে কাজ নিচ্ছি না?"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়ের দল আস্তে আস্তে বোর্ডিংএর দিকে চলিল। লাবণ্য বলিল, "খেয়ে যা না এখানেই? তোকে যে অপূর্ব্ব খানা খেতে হয়! একটু মুখ বদল ক'রে যা।"

কৃষ্ণা বলিল, "তা লোভ হচ্ছে বটে। আমাদের মেট্রনটির বাংলা রান্না সম্বন্ধে যা জ্ঞান, দেখলে তোর পেটে ব্যথা ধ'রে যাবে হাসতে হাসতে। আমিও তার চেয়ে বেশী জানি। কাল সুক্ত রাঁধতে বলেছিলাম, তাতে একরাশ লঙ্কাবাঁটা দিয়ে এমন এক সুখাদ্য তিনি তৈরী করিয়ে দিলেন, যে আমার ত চক্ষুস্থির!"

লাবণ্য বলিল, "আমাদের সে সুখটা আছে ভাই। মাইনে কম পেলেও আরাম ক'রে খেতে পাই। মাসীমা এখন অবস্থায় প'ড়ে বোর্ডিংএ মেট্রন-গিরি করতে এসেছেন, কিন্তু আগে খুব গোঁড়া হিন্দু ঘরের বৌ ছিলেন। শক্ত শাশুড়ীর হাতে প'ড়ে রান্নাবান্না খুব ভালোই শিখেছেন। সামান্য শাক-পাতা দিয়ে যা রাঁধেন তাই যেন অমৃত মনে হয়।"

দুই বন্ধু উঠিয়া লাবণ্যের ঘরে চলিল। অতিথি আসিয়াছে বলিয়া লাবণ্য আজ আর খাবার ঘরে খাইতে গেল না, দুইটি মেয়েকে ডাকিয়া তাহার ঘরেই দুজনের খাবার দিয়া যাইতে বলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা সাজাইয়া গুছাইয়া দুজনের ভাত দিয়া গেল। লাবণ্য বলিল, "তোর আসার খবর মাসীমার কাছে পৌঁছে গেছে, দেখেছিস? অন্যদিন যেখানে তিন-চারটার বেশী তরকারী থাকে না, সে স্থলে আজ আটটা নটা তরকারী। এরই মধ্যে ভদ্রমহিলা কখন এত রাঁধলেন জানি না।"

কৃষ্ণা বলিল, "খুব চমৎকার রাঁধেন সত্যিই, আমার ঘাস-পাতা খাওয়া মুখে খুবই ভালো লাগছে।"

যে মেয়ে-দুটি ইহাদের পরিবেশন করিতেছিল, তাহাদের ভিতর একটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং অল্প পরেই বাটীতে করিয়া আরো তরকারী আনিয়া উপস্থিত করিল। কৃষ্ণা ত ব্যাপার দেখিয়া, প্রায় খাওয়া ছাড়িয়া পলাইবার জোগাড় করিল। বলিল, "রান্না ভালো বলেছি ব'লে কি আমি একলাই বোর্ডিং সুদ্ধ মানুষের খাবার খেয়ে যাব? তোদের মাসীমা কি ভেবেছেন আমি ভাট-বামুনের মেয়ে?"

মেয়েরা এবং লাবণ্য মিলিয়া অনুরোধ-উপরোধ করিয়াও তাহাকে আর বেশী-কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

কৃষ্ণা যখন বোর্ডিংএ ফিরিল তখন রাত অনেক। মেয়েরা সব শুইতে চলিয়া গিয়াছে, দুএকটি শিক্ষয়িত্রীর ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। নিজের ঘরে ঢুকিয়া জুতা-মোজা ছাড়িয়া কৃষ্ণা ঘুমাইবার জোগাড় করিতে লাগিল। জান্‌লাগুলি ভালো করিয়া খুলিয়া দিল যাহাতে একটু বাতাস ঘরে আসিতে পারে। তাহার পর বিছানায় শুইয়া আবার নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মন দিল। অর্থের প্রলোভনে সে ত চলিল কোন্ অচেনা অজানা মানুষের মধ্যে। ইহার পর তাহার ভাগ্যে কি যে আছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু জন্মাবধিই ত তাহার প্রতি বিধাতা বিরূপ, তাহার জন্য প্রথম হইতেই ঘর কোথাও ছিল না। এখন আর ঘরের মায়া করিলে তাহার চলিবে কেন? দুদিনের অতিথির মতোই সে সব-জায়গায় যাইবে আসিবে, মায়ার বন্ধনে বাঁধিতে কেহই তাহাকে চাহিবে না। মরণের দিন পর্য্যন্ত এমনই একাকিনীই হয়ত সে থাকিবে। ভালোবাসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসিবার আকাঙ্ক্ষা, নারীর হৃদয় জুড়িয়া থাকে সর্ব্বদাই, সে আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি কি কখনও হইবে না? সকলের বাহিরের-ঘরের অতিথি সে হইবে, আদরও পাইবে, কিন্তু কাহারও হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে তাহার প্রবেশাধিকার কি ঘটিবে না?

ভাবিতে-ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা নিজেই বুঝিল না। সকালে উঠিয়া মন হইতে সকল দ্বিধা সংশয় সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কিছু অলঙ্ঘনীয় বাধা যদি না জোটে তাহা হইলে সে বর্ম্মায় যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিল। সংশয়ের দোলায় দুলিয়া লাভ নাই কিছুই। একবার সাহসে ভর করিয়া সে দেখিতে চায় অদৃষ্টে তাহার ভালো কিছু আছে কিনা। যাই হোক, এই স্কুলের চাকৃরিতে সে ইস্তফাই দিবে।

সেই দিনই সে পদত্যাগপত্র লিখিয়া সেক্রেটারীর কাছে পাঠাইয়া দিল। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা মহা ঠাট্টার ধুম লাগাইয়া দিল। লাল শাড়ীজামা কিনিয়া দিবার, গহনা গড়াইয়া দিবার জন্য সবাই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এ কথা সে ক্রমাগতই শুনিতে লাগিল।

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "লাল না হোক, অন্য রঙের শাড়ীজামা কিছু হয়ত শীগগিরই দরকার হতে পারে। তখন আপনাদের সাহায্য নিশ্চয়ই পাব। গহনাটার সম্প্রতি ত কিছু দরকার দেখছি না, পরে যদি হয় ত আপনাদের জানাব।"

একজন শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস রায় কি সাহেবের ঘর আলো করতে যাচ্ছেন? গহনা-গাঁটির দরকার নেই?"

কৃষ্ণা বলিল, "সাহেবের এমন মতিচ্ছন্নে ধরেনি। আমি অন্য একটা ঘরে যাচ্ছি বটে, এবং কতকটা আলো দান করার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু সাহেবকে নয়, ছুটি ছোট মেয়েকে।"

তাহার সখী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "নাঃ, আপনি নেহাৎ বেরসিক। এতদিনেও সাহেব জোটাতে পারলেন না?"

১৩

কৃষ্ণার দিনগুলো বড় উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া কাটিতেছিল। কাজ ছাড়িয়া দিয়া ত বসিয়া রহিল, ইহার পর নূতন কাজটিও যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহার অবস্থা হইবে চমৎকার। যাহাদের কাজ তাহারা ত দিব্যি গিরিধি বসিয়া আছে, কলিকাতায় আসিবার নামও নাই। প্রতিদিনই প্রায়, কৃষ্ণা হয় নিজে লাবণ্যর কাছে গিয়া খোঁজ করিত, নয় চিঠি লিখিয়া পাঠাইত। কিন্তু একই উত্তর তাহাকে শুনিতে হইত। ব্রহ্মপ্রবাসীর দল শীঘ্রই কলিকাতা রওনা হইবে, তবে ঠিক কোন্ দিন তাহা লাবণ্য বলিতে পারে না।

যাহা হউক অবশেষে তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিল। শনিবার তাহাদের স্কুল থাকে না, মেয়েরা হয় বাজারে জিনিসপত্র কিনিতে যায়, নয় শিবপুরে বা আলিপুরে বাগানে বেড়াইতে যায়। কৃষ্ণাকে প্রায়ই এই দলের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিতে হয়, কারণ তাহার পছন্দ এবং দরদাম করার উপর মেয়েদের অগাধ বিশ্বাস। বেড়াইতে গেলেও তাহারা মিস্ রায়কে দলে টানিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে, অন্য শিক্ষয়িত্রীর অধীনে বেড়াইয়া তাহারা যেন বেড়ানর সুখ মোটেই পায় না। তাঁহারা কেবল জেল-খানার কয়েদীর মতো মেয়েদের গাড়ী হইতে নামান, একটা বাঁধা রাস্তা ধরিয়া খানিকটা ঘুরাইয়া আনেন, আবার গাড়ীতে গিয়া তোলেন। ইচ্ছামতো দাঁড়াইতে, বসিতে, বা গল্প করিতে তাহারা মোটেই পায় না।

সেদিনও ড্রেসিংরুমে মহা কলরব করিয়া মেয়েরা বেশভূষা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা আলিপুরের বাগানে বেড়াইতে যাইবে। কৃষ্ণাও নিজের ঘরে, আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছিল। খাটের উপর তাহার শাড়ী আর ব্লাউস বিরাজ করিতেছে, চুল বাঁধা শেষ হইলেই হয়।

বাহির হইতে মিহি গলায় প্রশ্ন হইল, "আস্‌ব মিস্ রায় ?"

কৃষ্ণা ঘাড় না ফিরাইয়াই বলিল, "এসো"। একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিল, "লোক দাঁড়িয়ে আছে জবাবের জন্যে।"

কৃষ্ণা উপরে লাবণ্যর হস্তাক্ষর দেখিয়াই খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটিকে বলিল, "আচ্ছা, যাও তুমি, আমি জবাব পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মেয়েটি বাহির হইয়া যাইতেই সে চিঠি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। লাবণ্য জানাইয়াছে যে ব্রহ্মপ্রবাসী দীনবন্ধু-বাবুর পরিবারবর্গ কাল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আজ সকালে তাঁহারা লাবণ্যর কাছে লোক পাঠাইয়াছেন, কৃষ্ণাকে তাঁহারা একবার দেখিতে চান। আজ বিকালে লাবণ্য তাঁহাদের বাড়ী কৃষ্ণাকে লইয়া যাইতে পারে, কৃষ্ণার যদি সময় হয়। যাওয়া ঠিক করিলে কৃষ্ণা যেন এখনই পত্রবাহক

দারোয়ানের সঙ্গে চলিয়া আসে, একটু গল্পসল্প করিয়া বিকালের দিকে যাওয়া যাইবে এখন।

ঝিকে ডাকিয়া কৃষ্ণা বলিল, "নীচে অন্য স্কুলের যে দারোয়ান এসেছে, তাকে দাঁড়াতে বল। আমি যাব তার সঙ্গে। একখানা গাড়ী ডেকে রাখতে বল।"

তাহার পাশের ঘরে যে শিক্ষয়িত্রীটি থাকিতেন, তাঁহারও বয়স অল্প, কৃষ্ণার সঙ্গে ইঁহারই যা একটু ভাবসাব ছিল। তাঁহার ঘরে গিয়া কৃষ্ণা বলিল, "খাট থেকে একটু উঠতে হচ্ছে বিদ্যুৎবরণীকে।"

বিদ্যুৎ তাহার বড় বড় চোখ আরও বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কি কারণে শুনি? কোথায় চম্‌কাতে হবে? বেশ ত আরামে শুয়ে আছি।"

কৃষ্ণা বলিল, "মেয়েগুলোকে ভাই, তুমি যদি দয়া ক'রে একটু চরিয়ে নিয়ে এসো। আমার খুব জরুরী কাজে এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। মিস্ গুহর সঙ্গেও তাদের পাঠাতে পারি, কিন্তু বেচারীরা তাহলে মনে মনে আমার উপর ভারি চট্‌বে।"

বিদ্যুৎ হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "বেশ বাবা, নিজে কোথায় চললে অভিসারে, আর একপাল হাড়-জ্বালানে মেয়ে চাপিয়ে গেলে আমার কাঁধে। ভাবছিলাম একটু আরাম ক'রে ঘুমব।"

কৃষ্ণা বলিল, "কাল যত পারো ঘুমিও। আজ তোমার ঘুম না হতে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কাল আমি সকালে উঠে মেয়েদের গির্জ্জায় নিয়ে যাব, তুমি দেদার ঘুমিও।"

বিদ্যুৎ বলিল, "আচ্ছা, সে ভালো কথা। তোমার দরকার নিতান্তই জরুরী দেখছি, তা না হলে গির্জ্জায় যেতেও সুদ্ধ তুমি রাজী! সাতজন্মেও ত যাও না।"

কৃষ্ণা নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। একটুখানি কি যেন চিন্তা করিল। তারপর সাদাসিধা শাড়ীজামা পরিয়া, একখানা বড় খবরের কাগজে একটি ঢাকাই নীলাম্বরী শাড়ী, সেই কাপড়েরই ব্লাউস, একটি

তোয়ালে এবং একটি রুমাল জড়াইয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। দারোয়ান গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, কৃষ্ণাকে এক মিনিটও দেরি করিতে হইল না।

লাবণ্যও মেঝেতে মাদুর পাতিয়া ছুটিটা ভালো করিয়া উপভোগ করিতেছিল। কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিল, "তোর অদৃষ্টে মগের মুল্লুক লেখাই আছে দেখছি। এক মিনিটও আর দেরি সইছে না।"

কৃষ্ণা তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, "নিজেই আসতে বল্‌লি, আবার এখন ঢং করছিস কেন?"

লাবণ্য বলিল, "বোস্‌, বোস্‌। আবার পোঁটলায় ক'রে কি নিয়ে এসেছিস্‌? তোর war paint? মেয়েমানুষ, তাতে আবার বাঙালী সংসারের বুড়ী গিন্নী, তাকে ভোলাবার জন্যে অত নীলাম্বরীর দরকার নেই! তোমার ঘরোয়া রূপেই তারা যথেষ্ট মজবে, আর সাজসজ্জা ক'রে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিও না। বৌগুলি না ভড়কে যায়,—শেষে স্বামীরা ফিরে এসে ছাত্রীর বদলে মাষ্টারমশায়কে না পছন্দ ক'রে বসে।"

কৃষ্ণা তাহাকে ধাক্কা দিয়া খানিকটা সরাইয়া বলিল, "সর্‌ না একটু, সারা মাদুরটা জুড়ে শুয়ে আছিস, আমাকে একটু জায়গা দে। নীলাম্বরী দে'খে তারা যদি ভয় পায়, তোর একখানা ধুতি দিস, তাই প'রে যাব এখন।"

লাবণ্য তাহার গাল টিপিয়া বলিল, "তা আর না? আমি তোমার smartnessএর এত গল্প ক'রে এলাম তাদের কাছে, আর তুমি একটি কিম্ভূতকিমাকার সেজে তাদের সামনে হাজির হও! বরং দুচারখানা গহনাগাঁটি পরিয়ে দেব এখন।"

কৃষ্ণা বলিল, "অততে আর কাজ নেই। এ ত আর আমার বিয়ের পাকা দেখা হচ্ছে না। তখন যত পারিস গয়না পরাস।"

লাবণ্য বলিল, "তুমি যা মেমসাহেব, বিয়েতেও গয়না পরলে হয়। আর বিয়ে তুই করবি কবে রে? রূপ নাহয় আছে, কিন্তু বুড়ী ত কম হোস্‌নি।"

কৃষ্ণা বলিল, "তুমিই বা আমার চেয়ে কোন্ খুকী? তুমি ক'টা বিয়ে করেছ? আমার নাহয় ও আপদ্ জুটিয়ে দেবার জন্মে মা-বাবা নেই, তোমার ত তারও অভাব নেই।"

লাবণ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "কি করব ভাই, যা চেহারা, দে'খে কোনো বরই ভেড়ে না। তোমার মতো নূরজাহান হলে কি আর এতদিন ব'সে থাকতাম?

কৃষ্ণা বলিল, "একটি ব্যক্তি-বিশেষের নাম আমার মুখ থেকে শুন্‌বার জন্মে তোর প্রাণ ছটফট করছে দেখছি। কিন্তু সেটা এখন আমি মোটেই উচ্চারণ করব না, যতই তুই ছিপ ফেল্ না কেন?"

চা এবং জলখাবার লইয়া গুটি-দুইতিন মেয়ে আসিয়া জোটাতে তাহারা এই রসাল আলোচনা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। কৃষ্ণা বলিল, "আমার আগমন-সংবাদ কি তোমাদের মাসীমা এরই মধ্যে টের পেয়ে গেছেন?" মেয়েরা হাসিয়া চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। কৃষ্ণা বলিল, "সকাল সকাল সেরে আসা যাক্, চল্। বর্ষার দিন, কখন ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় বলা যায় না। চারদিকে কাদা আর জল প্যাচ প্যাচ করছে দেখলে আমার আর ঘরের বাইরে পা দিতেও ইচ্ছা করে না।"

লাবণ্য বলিল, "তাই চল্। মুখটুখ ধুয়ে আয়, সাবান বার ক'রে দিই?"

কৃষ্ণা সাবান তোয়ালে লইয়া মুখ ধুইতে চলিয়া গেল। লাবণ্য আলমারি খুলিয়া কাপড়-চোপড় বাহির করিতে লাগিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সাজসজ্জা সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল। দীনবন্ধু-বাবুর পরিবারবর্গ হ্যারিসন রোডে এক বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং পৌছিতে তাহাদের খুব বেশী দেরি হইল না। গাড়ী বাড়ীর সামনে দাঁড়াইতেই লাবণ্য বলিল, "ঐ যে ছোট বৌটি জানলায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে, আমাদের আর আগমন-সংবাদ দিতে হবে না। তোকে দেখবার জন্মে কেমন হা-পিত্যেশ করে আছে ছাখ্।"

কৃষ্ণা নামিতে-নামিতে বলিল, "আশা করি তাদের expectationটা তৃপ্ত করতে পারব।"

একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য সিঁড়ির গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গেসঙ্গে কৃষ্ণা ও লাবণ্য দোতলায় আসিয়া উঠিল। সামনের ঘরের আধা-ভেজানো দরজা খুলিয়া মেয়েটি বলিল, "আসুন।"

ঘরখানি সম্ভবতঃ বাড়ীর কোনো বধূর শয়নকক্ষ। দামী আসবাব দিয়া ফিটফাট করিয়া সাজানো। দেখিলেই বোঝা যায়, জিনিষপত্র ভাঙিয়া-চুরিয়া, ধূলা কাদা ছড়াইয়া ঘর নোংরা করিবার মানুষ এখনও আসিয়া জোটে নাই। আলনার উপরের কাপড় জামা ধুতি প্রভৃতিও খুব গুছাইয়া রাখা হইয়াছে।

কৃষ্ণা ও লাবণ্য বসিতে না বসিতেই, পাশের ঘরে বেশ একটা চাপা গলায় কথা বলার শব্দ তাহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল এবং দরজা খুলিয়া দুটি তিনটি মেয়ে আসিয়া ঢুকিল। পুর্ব্ব হইতেই, তাহারা বোধহয় কি কি করিতে হইবে, সে বিষয় উপদেশ পাইয়া থাকিবে, কারণ তিনজনেই আসিয়া কৃষ্ণা ও লাবণ্যকে অবনত হইয়া এক-একটা নমস্কার করিল।

লাবণ্য দুইটি বৌকে দেখাইয়া কৃষ্ণাকে বলিল, "এই দুটি তোর ছাত্রী। এইটি বড় বৌ, নাম অমিয়া, এর গান শিখবার সখ ভয়ানক, গলাও আছে বেশ। এটি ছোট বৌ প্রতিভা, পড়াশুনাই বেশী ভালোবাসে, তোর খুব বাধ্য ছাত্রী হবে।"

অমিয়া এবং প্রতিভা একটু বিনীতভাবে হাসিয়া তাহাদের কাছেই বসিয়া পড়িল। অমিয়া দেখিতে ফরসা লম্বা এবং রোগা, স্বভাবটা কিছু গম্ভীর বলিয়া বোধ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই বেশী মাখামাখি করিতে যেন সে প্রস্তুত নয়। প্রতিভা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গোলগাল, খুব হাসিখুসী মানুষ। মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে, সে কৌতূহলে ফাটিয়া পড়িবার জোগাড়

করিতেছে, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে চুপ করিয়া আছে। অমিয়ার দৃষ্টি অন্যদিকে, প্রতিভা কিন্তু কৃষ্ণাকে আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছে। সে কেমন করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, কি শাড়ীজামা পরিয়াছে, কোথায় কেমন করিয়া ব্রোচ লাগাইয়াছে, কিছুই তাহার নজর এড়াইতেছে না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কই, এঁদের শাশুড়ী-ঠাকরুণ কোথায়?"

অমিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এখনি আসছেন।" বলিতে-বলিতেই গৃহিণী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মস্ত মোটা মানুষ, রংটা এককালে ফরসাই ছিল বোধহয়, এখন বয়সে ভাঁটা পড়ার সঙ্গেসঙ্গে রং-এর উজ্জ্বলতায়ও ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়িতে একটা জামা গায়ে দিয়া, পাটভাঙা কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন, তাহা দেখিবামাত্র বোঝা যায়। জামাটা হয় অন্য কাহারও, নয় গৃহিণীরই অতীতকালের সম্পত্তি। তাঁহার এখনকার বিপুল দেহভারে বেচারা একেবারে ফাটিয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে।

লাবণ্য উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণা ভাবিল, মায়ের বয়সী মানুষ, ইঁহাকে একটা প্রণামই করা যাক, নমস্কার করিলে হয়ত আমাকে অত্যন্ত দেমাকে মনে করিবেন। সেও লাবণ্যের পরে গিন্নীকে একটা প্রণাম করিল।

তাহাদের চিবুকে হাত দিয়া চুমা খাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "বোস, মা-লক্ষ্মীরা বোস। আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কালীঘাটে গিয়েছিলাম কি না, ফিরে এসে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, এই উঠলাম। এই মেয়েটির কথা বলেছিলে? ওমা, এ যে রাজ-নন্দিনীর মতো চেহারা। তুমি মাষ্টারি করছ কেন গো মা? বয়সও ত নিতান্তই কাঁচা দেখছি। তোমার আত্মীয়-স্বজনে তোমায় যেতে দেবে অত দূর দেশে?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমার আত্মীয়-স্বজন জগতে কেউ নেই। আপনারা যদি নিয়ে যেতে চান ত আমি যাব ব'লেই ঠিক করেছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা নেব না কেন বাছা, আমরা ত নিতেই চাই। তা লাবণ্যর কাছে সবই শুনেছ ত মা? আমার ঘরে নিজের মেয়ের মতোই থাকবে, আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না। তবে মা, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া কেমন জানি না, আমাদের ঘরে ত ডালভাতই খেতে হবে। তোমার হয়ত অসুবিধা হবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "ডালভাত ছাড়া আমরাই বা কি খাই বলুন? তবে বোর্ডিংএর ডালভাতের যা চমৎকার স্বাদ, তা খেতে রুচি হয় না যে সেটা ঠিক। কিন্তু আপনাদের ওখানে খুব খুসী হয়েই খাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বাছা, নিজের মুখে বলতে নেই, কিন্তু আমার বাড়ীর মতো খাওয়া-দাওয়া বেশী বাড়ীতে দেখবে না। চাকর-বামুনের ওপর হুকুম ক'রে পা ছড়িয়ে ব'সে ত থাকি না? নিজে রান্না করি, সঙ্গে সঙ্গে বৌমাদের, মেয়েদেরও করাই। তাই ব'লে মনে ক'রো না যে রান্নার লোক নেই। দু'-দুটো লোককে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছি। একটা ঠাকুর এখান থেকে নিয়ে গিয়েছি, সে আমাদের দেশী রান্না সবই জানে। আর-একটা লোক আছে, সে কর্ত্তা এলে, সাহেব-সুবোর খানাটানা দিতে হলে রান্না করে। তাকে অবশ্য আমার হেঁসেলে আমি ঢুকতে দিই না। নীচে তার আলাদা রান্নাঘর আছে। সেও তোমায় রেঁধে দিতে পারবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমার খাওয়া নিয়ে যত ঝঞ্ঝাট হবে ভাবছেন, তা মোটেই হবে না। আলুভাতে ভাত হলেই আমার দিব্যি খাওয়া হয়ে যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, আলুভাতে ভাত খাবে তুমি কোন্ দুঃখে? বললে হয়ত বিশ্বেস করবে না বাছা, ভাববে মাগী জাঁক করছে, কিন্তু আমার বাড়ীতে বাজার-খরচই রোজ চার-পাঁচ টাকা। বাজারের সেরা মাছটুকু, তরকারীটুকু না হলে আমার ছেলেমেয়েদের মুখেই রোচে না। সব কর্ত্তার ধাত পেয়েছে, তা না হ'লে আমার নিজের অত খাওয়া-দাওয়ার ফরফটি নেই। কর্ত্তা এদিকে ত মাটির মানুষ, কিন্তু খাওয়া-দওয়ায় বড় খুঁতখুঁতে।

পান থেকে চুণটি খসেছে কি অমনি রেগে আগুন হয়ে উঠেছেন। তাঁর ঘরে আসার জন্যেই না এত রান্নাবান্না শেখা?"

কৃষ্ণা বলিল, "বেশ ভালোই হয়েছে, আপনার কাছে আমিও ভালো ভালো রান্না শিখে নেব।"

গৃহিণী মহা খুসী হইয়া বলিলেন, "ও মা, তোমরা আবার এ-সব শিখবে কি? তোমরা হ'লে সব লেখাপড়া-জানা মেয়ে, তোমরা হয়ত এ-সব কাজ ঘেন্নাই করবে। তবে আমি বৌ-বেটীদের খুব শেখাচ্ছি, ছেলেদের মুখ জানি ত! শেষে আমার মতো নাকের জলে চোখের জলে হবে? কম গঞ্জনা পেয়েছি প্রথম প্রথম? পড়া-শোনাই শিখুক, আর গান-বাজনাই শিখুক, ঘরের গিন্নী হতে হলে, আমাদের বাঙালী হিন্দুঘরে রান্না না শিখলে চলে না।"

লাবণ্য বলিল, "কোনো ঘরেই চলে না, মাসীমা। খায় যখন সব ঘরেই, তখন রান্নাও জানতে হয় সব ঘরের মেয়েদের।"

কৃষ্ণা আলোচনাটা ফিরাইবার জন্য বলিল, "আপনারা যাওয়া ঠিক করেছেন কবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কর্ত্তা ত চিঠি দিয়েছেন খুব শীগ্‌গির যেতে। তা বাছা, হুট করতেই কি আর অত বড় সংসার নিয়ে যাওয়া যায়? তাছাড়া ছোট বৌমার মা-বাবা আসছে পশ্চিম থেকে, একবার মেয়েটিকে দেখবে ব'লে। তাদের ঐ একমাত্তর মেয়ে কিনা? তাদের জন্যেও দিন দশ-বারো দেরি হবে। তারপর বর্ষাকাল, আমার ত জাহাজে উঠতেই মরণ-দশা ধরে। না-পারি জলটুকু খেতে, না-পারি মাথা তুলতে। সেইজন্যে ইংলিশ মেলের জাহাজ ছাড়া চড়ি না, তবু তিন দিনের দিন পৌঁছে দেয়।"

কৃষ্ণা বলিল, "তা হ'লে যাবার তিন-চার দিন আগে আমায় জানাবেন, জোগাড়-জাগাড় ক'রে নেব। জিনিষ-পত্রও কিছু কিছু কিনে নেব।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা জানাব বৈ কি মা? তবে যা কিনবার কাটবার তা এখন থেকেই কিনে রাখ না? আমরা সুবিধামতো জাহাজ পেলেই ছাড়ব কি না?"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, তাই রাখব। ওখানে শীত বেশী নাকি? গরম কাপড়-চোপড় কিছু নিতে হবে?"

প্রতিভা আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা, শীত ব'লে কোনো জিনিষই নেই সেখানে। আমি ত এই তিন বছর আছি, একদিনও লেপ গায়ে দিতে হয় নি।"

কৃষ্ণা বলিল, "ভালোই। আমার আবার বেশী শীত মোটেই সহ্য হয় না। আমরা আজ তাহ'লে উঠি? আমার ঠিকানাটা রেখে যাচ্ছি, যখনই যাওয়া ঠিক হবে, একটা পোষ্টকার্ড লিখে দেবেন, আমিও ঠিক হয়ে থাকব।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, একটু জল না খেয়ে কি ওঠা হয়? আমার ঘরে বাছা, ওটি হ'বার জো নেই। কর্ত্তার বন্ধু-বান্ধব, সরকার, পেয়াদা যে আসে, কখনও মিষ্টিমুখ না ক'রে যায় না। আর তুমি ত আমার আপনার জন হতে চললে। ঘরের মেয়ের মত ঘরে থাকবে। যাও ত বড় বৌমা, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে এস।"

অমিয়া চলিয়া গেল, গৃহিণীও কি-একটা কাজে পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। প্রতিভা তাড়াতাড়ি কৃষ্ণার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে কি ব'লে ডাকব? মিস্ রায়, না কৃষ্ণাদিদি?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "নাম-ধামও এরই মধ্যে জোগাড় ক'রে ফেলেছ দেখছি।"

প্রতিভা বলিল, "সে আমি লাবণ্যদির কাছে আগেই জেনে নিয়েছি।"

কৃষ্ণা বলিল, "কৃষ্ণাদিদিই বোলো। মিস্ রায় বলবার দরকার নেই, আমি ত আর মেমসাহেব নই?"

প্রতিভা বলিল, "আপনার রং কিন্তু মেমের মতো ঠিক। বাঙালীর ঘরে এত ফরশা হয় না। বড়দিকেই সবাই ফরশা বলে, কিন্তু আপনার

পাশে তাকেও কালো দেখাচ্ছিল। রেঙ্গুনে যে-সব আর্ম্মানী আর ইহুদী মেয়ে রাস্তায় বেড়ায়, আপনি যেন তাদের চেয়েও ফরশা। আপনার নাম কৃষ্ণা হ'ল কেন?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "পাছে কেউ নজর দেয়, তাই আমি ঐ নাম নিয়েছি।"

প্রতিভা বলিল, "ওমা, আপনারা আমাদের মতো করেন দেখছি। আমার একজন মাসী খুব সুন্দর ছিলেন, তাঁর নাম ছিল কৃষ্ণ-সোহাগিনী. সবাই কেষ্টো কেষ্টো ক'রে ডাকত।"

ইতিমধ্যে জলযোগের বিপুল আয়োজন আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণারা দেখিল যে, গৃহিণীর অহঙ্কারটা নিতান্ত মিথ্যা নয়, খাওয়া-দাওয়ার ঘটা ইহাদের আছে বটে। পাছে তাহারা ভালো জিনিষের সদ্ব্যবহার না করে এই ভয়ে গৃহিণী আসিয়া সাম্‌নে বসিলেন, এবং অনুরোধ-উপরোধ করিয়া তাহাদের বেশ-খানিকটা খাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন।

কৃষ্ণা বলিল, "যাক্, বোর্ডিংএর পচা রান্না আজ আর খেতে হবে না, এখানেই পেট ভ'রে গেল।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, এই পক্ষীর আহারেই পেট ভ'রে গেল? এমন কর্‌লে শরীর টিক্‌বে কেন? আজকালকার মেয়েদের এই এক হয়েছে ফ্যাশন্। খেতে লজ্জা কি বাছা? আমার ত এত বয়স হয়েছে, কিন্তু কেমন গতর আছে দেখ দেখি! আমাদের বয়সে তোমরা কি আর এমনটি থাক্‌বে?"

কৃষ্ণা মনে মনে বলিল, "রক্ষা কর, এমন গতরে আমার কাজ নেই।"

১৪

দারোয়ান গাড়ী ডাকিয়া আনিল। লাবণ্যকে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণা নিজের বোর্ডিংএ চলিয়া গেল।

কৃষ্ণার বাংলা দেশ ছাড়িবার দিন খুব শীঘ্রই অগ্রসর হইয়া আসিল। পাঁচ-সাত দিন পরেই সে চিঠি পাইল, যে, দীনবন্ধু-বাবুর পরিবারবর্গ যাওয়ার দিন ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, কৃষ্ণা যেন আর আট-দশ দিনের মধ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চিঠি পাইয়া হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। এখানে তাহার পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। হৃদয়ের বন্ধনেও কাহারও সঙ্গে সে এখানে বাঁধা নাই। তবু এই তার মাতৃভূমি, আজন্মের পরিচয় তাহার ইহারই সঙ্গে। ইহার আলোতেই তাহার দৃষ্টি প্রথম ফুটিয়াছিল, ইহার বায়ুই তাহার নিঃশ্বাস। ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে একটু ব্যথা অনুভব না করিয়া সে পারিল না।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে জোর করিয়া মন হইতে এসব ভাবনা দূর করিয়া দিল। যাইবেই যখন, তখন হাসিমুখেই যাওয়া ভালো। ঘরে ঢুকিয়া সে আল্‌মারী, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খুলিয়া বসিল। কি কি জিনিষ আছে, কি কি কিনিতে হইবে, সব ত দেখা দরকার?

বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি গো, আল্‌মারীর ভিতর কি এমন রস পেলে?"

কৃষ্ণা বলিল, "এই দেখছি, কাপড়-চোপড় আর কিছু করাতে হবে কিনা।"

বিদুৎ বলিল, "ও বাবা, এর উপর আবার করাবে? দিনে যদি পাঁচখানা ক'রে শাড়ী-জামা বদলাও, তাহলেও ত তোমার কম পড়বে না!"

কৃষ্ণা বলিল, "না, শাড়ীটাড়ি আর করাতে হবে না দেখছি। এক জোড়া চটি কিনতে হবে, আর বাইরে বেড়াবার এক-জোড়া জুতো। আমার

যা জুতো আছে, বড় বেশী high hillএর, প'রে খুব বেশীদূর হাঁটা যায় না।"

বিদ্যুৎ বলিল, "যাচ্ছ ত চটির দেশেই, এখান থেকে নিয়ে কি হবে? বর্ম্মার sandal ত বিখ্যাত। আমার ফরমাস রইল, সুবিধামতো আমায় এক-জোড়া চটি, একটা বর্ম্মা ছাতা পাঠিয়ে দিও। আর সুন্দর দে'খে বর্ম্মা সিল্ক যদি কিছু পাঠাতে পার, তাহ'লে ত সোনায় সোহাগা হয়।"

কৃষ্ণা বলিল, "সে আর শক্তটা কি? গিয়েই পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, ওঠা যাক, স্কুলের সময় হ'ল। আমার জায়গায় কাকে রাখা হচ্ছে, শুনেছ কিছু?"

বিদ্যুৎ বলিল, "কি জানি। পাঁচ-ছ'টা application আছে, কাকে রাখবে জানি না। বড় মেমসাহেব নাকি একটু বয়স্কা মেয়ে চান। তোমাদের মতো ছুকরী তাঁরা চান্ না, তোমরা মোটেই কাজে stick ক'রে থাক না।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "অন্যেরা যে কারণে কাজ ছাড়ে, আমি ত আর সে-কারণে ছাড়ছি না?"

বিদ্যুৎ বলিল, "ছাড়ছ ত? সেইটাই হ'ল আসল কথা।"

কৃষ্ণার মেয়ে-মহলে খুবই খাতির ছিল। তাহাকে বিদায় দিবার আয়োজন যে খুব ঘটা করিয়াই হইতেছে, সে খবর সে তলে তলে পাইতেছিল। কিন্তু ইহাতে সে মনে মনে বড়ই বাধা অনুভব করিতেছিল। নিজেকে দশের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরা, সে যে-কারণেই হোক, তাহার একেবারে পছন্দ হইত না। তাছাড়া এ সব মামুলি অভ্যর্থনা, বিদায়-অভিনন্দন প্রভৃতি তাহার হাস্যকরও মনে হইত।

কিন্তু এবিষয়ে কেহই তাহার মত জিজ্ঞাসা করিল না। এই সপ্তাহেই তাহার কাজ শেষ। তাহার পরও আর যে-ক'দিন সে কলিকাতায় থাকিবে, সে-ক'দিন বোর্ডিংএ থাকিতে পাইবে, এই অধিকারটুকু প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাহাকে দয়া করিয়া দান করিলেন। কৃষ্ণা মনে মনে কেবলই প্রার্থনা

করিতে লাগিল, যেন দুচার দিনের বেশী তাহাকে থাকিতে না হয়। অকারণ বসিয়া বোর্ডিংএর অন্ন ধ্বংস করিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

দেখিতে দেখিতে শুক্রবার আসিল এবং চলিয়া গেল। শনিবার সকালে কৃষ্ণা একবার লাবণ্যর কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এখনই সাজ করছ কেন? সভা ত সেই আড়াইটের সময়।"

কৃষ্ণা বলিল, "সভা আবার কিসের? আমি ত যাচ্ছি লাবণ্যর কাছে। তাকে নিয়ে একবার বাজার যাব।"

বিদ্যুৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আরে না, না। তার মানে তুমি একেবারে দিন কাবার ক'রে আস্‌বে? মেয়েরা যে আজ তোমার farewellএর জোগাড় করেছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "তা, আমায় না বল্‌লে, আমি কেমন ক'রে জান্‌ব বাপু?"

বিদ্যুৎ বলিল, "তুমি যে এত ন্যাকা, তা কে জানে? কোনো মেয়েকে কি কেউ তার বিয়ের তারিখ বা ঘণ্টা ঘটা ক'রে বল্‌তে আসে? অথচ কোনো ক'নে বিয়ের সময় বাজার করতে বেরিয়ে গিয়েছে ব'লে ত শুনিনি।"

কৃষ্ণা বলিল, "কিসে আর কিসে, ধানে আর তুঁষে। বিয়ের সময় আমিও বাজার যাব না, সে-বিষয় নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার। কিন্তু এটা আমার বিয়ে ত মোটেই নয়, শ্রাদ্ধের সঙ্গে বরং তুলনা হ'তে পারে।"

বিদ্যুৎ বলিল, "বালাই ষাট্, শ্রাদ্ধ হবে কিসের দুঃখে? বিয়ে না হোক, এটা গায়ে-হলুদ ত বটেই। আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশে তুমি আর মিস্ কৃষ্ণা রায় রূপে ফিরবে না।"

কৃষ্ণা বলিল, "বলিহারি তোমাদের বুদ্ধিকে! এতকাল নিজের দেশে মিস থাক্‌তে পারলাম, আর দুদিনের জন্যে মগের মুলুকে গিয়ে কা'র খাঁদা নাক আর কুৎকুতে চোখ দে'খে এমন মজব যে মিস থাকা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না?"

বিদ্যুৎ বলিল, "অত detailsএ আর ভবিষ্যৎ দর্শন করা যায় না। এই মোটামুটি বললাম। যাই হোক এখন দয়া ক'রে তুমি বেরিয়ে যেয়ো না।" এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। কৃষ্ণা অগত্যা বাহিরে যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া থাকিয়াই গেল।

বেলা দুইটার সময় একপাল মেয়ে আসিয়া জুটিল, তাহাকে ডাকিতে। কৃষ্ণাকে যাইতেই হইল। বালিকাদের এত আগ্রহ সে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

মেয়েদের হৃদয়োচ্ছ্বাস-ভরা গান, কবিতা শুনিতে শুনিতে কেবলই তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। কি বিপদেই পড়া গিয়াছে, ইহারা থামিলে যে বাঁচা যায়! মেয়েদের কিন্তু এত চট্ করিয়া থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তাহারা কৃষ্ণাকে গোটা-দশ ফুলের মালা পরাইয়া, হাতে ফুলের তোড়া দিয়া বসাইয়া রাখিল। যত ক্লাসে সে পড়াইত, প্রতি ক্লাসের মেয়ের তরফ হইতে এক-একটি কবিতা, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর বক্তৃতা, ও গোটা-চার গান শুনিয়া তবে সে নিষ্কৃতি পাইল। ধন্যবাদ-সূচক গোটা-দুইচার কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উপরে চলিয়া আসিল। মেয়েরা অনেকে সঙ্গেই আসিল, কাহারও হাতে ফুল, কাহারও হাতে খাবারের থালা। তাহাকে বিদায়োপহারস্বরূপ মেয়েরা একটা মখমলমণ্ডিত বাক্স দিয়া গেল। তাহার ভিতর ছোট, বড়, মাঝারি, নানারকম ঘর কাটা, কোনোটা গোল, কোনোটা চারকোণা। কৃষ্ণা হাসিয়া মনে মনে বলিল, "সত্যিই যেন আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, দিব্যি এক গহনার বাক্স দিয়ে গেল!"

তাহার যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। সকাল সাড়ে-আটটায় জাহাজ, আগের দিনই যা-কিছু গুছাইবার তাহা শেষ করিয়া রাখিতে হইবে। রবিবার, ইংলিশ মেলে তাহারা যাইবে। শনিবারে সে চারিপাশে জিনিষের স্তূপ লইয়া বাক্স গুছাইতে বসিয়া গেল। মেয়েরা বিষণ্নমুখে এক-একবার আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। কৃষ্ণা তাহাদের দেখিয়াও যেন

দেখিল না। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, দুচার কথা তাহাদের সঙ্গে সে বলে, কিন্তু ভাবিয়াই পাইল না, কি বলা যায়।

বিদ্যুৎও তাহার সঙ্গে বসিয়া জিনিষ গোছানোতে সাহায্য করিতেছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, "এতগুলো কাপড়-জামা আলাদা ক'রে রাখলে যে? এগুলি কি হবে আবার?"

কৃষ্ণা বলিল, "ওগুলো ছোট এই স্যুটকেসে নেব, ষ্টীমারে পরবার জন্যে। ট্রাঙ্ক হয়ত কোথায় ঠাসা থাকবে, সারাক্ষণ খুলতে পারব না।"

বিদ্যুৎ বলিল, "বাবা, তিন দিনের জন্যে এত কাপড়? এ যে honey-moon tripএরই দশা করলে?"

কৃষ্ণা বলিল, "বাপরে বাপ, তোমাদের কথার জ্বালায় গেলাম! একটি বর নেই ব'লে কি সব কিছুর কেবল কৈফিয়ৎ দিতে হবে?"

বিদ্যুৎ বলিল, "কি জ্বালা, একটু ঠাট্টাও সয় না তোমার? আচ্ছা, থাক, আর বলব না। দাও ওগুলো এগিয়ে, আমি গুছিয়ে রাখছি। খাবার-টাবার সঙ্গে নিতে চাও ত আমার একটা ছোট টিফিন বাসকেট আছে, দিতে পারি।"

কৃষ্ণা বলিল, "সে নিতান্তই 'তেলা মাথায় তেল ঢালা' হবে। যাঁর সঙ্গে যাচ্ছি, তিনি এতক্ষণ কলকাতার অর্দ্ধেক খাবার প্যাক ক'রে ফেলেছেন বোধ হয়।"

জিনিষ-পত্র গোছানো সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গেল। কলিকাতায় যে দুইচারজন বন্ধুবান্ধব ছিল, কৃষ্ণা একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। রাত্রে ছোট ঘরখানায় বাক্স-বিছানার স্তূপের মধ্যে শুইয়া কিছুতেই তাহার ঘুম আসিতে চাহিল না। কেবলই কান্না আসিতে লাগিল। অথচ কাহার জন্য এ দুঃখ? সে চলিয়া গেলে একফোঁটা চোখের জলও কি কেহ তাহার জন্য ফেলিবে?

রবিবার সকালে সে বোর্ডিংএর মেয়ে এবং শিক্ষয়িত্রীদের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদায় নিল। বিদ্যুৎ ম্লানমুখে বলিল, "তুমিই এখানে আমার একমাত্র

বন্ধু ছিলে ভাই, এর পর এখানে টেঁকাই আমার দায় হবে। আমিও অন্য কোথাও একটা চাকরি নিয়ে চ'লে যাব ভাবছি।"

দারোয়ান গাড়ী ডাকিয়া আনিল। জিনিষ-পত্র গাড়ীর ছাদে তুলিয়া আর পিছনদিকে না তাকাইয়া কৃষ্ণা গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে এতদিনের বাসস্থান বোর্ডিং তাহার চোখের আড়াল হইয়া গেল। ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস ফিলিয়া কৃষ্ণা জোর করিয়া মন অন্যদিকে দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কথা ছিল কৃষ্ণা সোজা হ্যারিসন রোডে যাইবে, সেখান হইতে অন্যদের সঙ্গে জাহাজঘাটে যাইবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ী চুপচাপ। গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, হাঁকডাকের চিহ্নমাত্র নাই। কৃষ্ণা অবাক্ হইয়া ভাবিল, ব্যাপার কি? অকস্মাৎ ইহারা তাহাকে মাঝপথে ফেলিয়া পলাইল কেন?

তাহার গাড়ী থামিবার শব্দে একটি যুবক তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। কৃষ্ণাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "ওঁরা এই পনেরো-কুড়ি মিনিট হ'ল চ'লে গেছেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি বেশী দেরি হয়ে গেছে? আটটার সময় ওঁরা ছাড়বেন ব'লেই আমায় বলেছিলেন।"

যুবকটি হাসিয়া বলিল, "না, আপনার কিছু দেরি হয়নি। আমার জ্যাঠাইমাটি একটু বেশীরকম nervous মানুষ, তাঁর কেবলই ভয় হয় যে, জাহাজ তাঁদের না নিয়েই পালিয়ে যাবে। এইজন্যে সর্ব্বদাই ঘণ্টাদুই আগে তিনি জাহাজঘাটে গিয়ে ব'সে থাকেন।"

যুবক গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, গাড়ী Outram Ghatএর দিকে চলিল। ঘাটে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাহারা এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিল। কোথাও কাহারও চিহ্ন নাই। যুবকটি বলিল, "চলুন ওঁরা নিশ্চয় উপরে ব'সে আছেন, জাহাজে এত আগে কখনও ওঠেন নি।"

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া এতক্ষণে কৃষ্ণা তাহার সহযাত্রিণীদের দর্শন পাইল। দীনবন্ধু-বাবুর পত্নী একলাই প্রায় এক বেঞ্চি জুড়িয়া বসিয়া আছেন। বৌ-ঝি সব আর-এক বেঞ্চিতে। ছেলেপিলেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দুটি যুবক, সম্পর্কে গিন্নীর দেওর-পো, মালপত্র জাহাজে তোলাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গৃহিণী বারবার উঠিয়া গিয়া, রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া তাহাদের উপদেশ দিতেছেন, এবং ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিতেছেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এস মা, এস। তোমায় রেখেই তাড়াতাড়িতে চ'লে এলাম, কিছু মনে ক'রো না। নিজে দে'খে জিনিষ-পত্তর না ওঠালে আমার আর ঝঞ্ঝাটের সীমা থাকে না, তাই সর্ব্বদাই আগে-ভাগে আসি। বেটাছেলেদের দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? এই দেখ না, গেলবার কর্ত্তা সঙ্গে ছিলেন, ব'কে-ঝ'কে কিছুতেই আমাকে আগে আস্‌তে দিলেন না। বল্‌লেন, 'তোমার সর্দ্দারি ছাড়া সারা দুনিয়া যখন চল্‌ছে, তখন ঐ ক'টা জিনিষ জাহাজে ওঠানোও চল্‌বে।' ও মা, আমি ত রইলুম ঘরে পটের বিবির মত ব'সে। এ দিকে করেছে কি, আমার মাথা খেয়ে আমার পানের বাটাটা ঘাটে ফে'লে গেছে। তারপর সারা রাস্তা আমি মরি আর-কি? শেষে ডেক্‌-এ এক খোট্টা মাগী যাচ্ছিল, তাকে দুটাকা বক্‌শিশ দিয়ে, তার কাছ থেকে পান নিয়ে, খেয়ে তবে বাঁচি। তা মা বোস, ঐ বৌমারা ওখানে আছে। ওরে ও বিপনে, ও কি করছিস্? বলি, এত ক'রে যে তোদের ব'লে নিয়ে এলুম যে গঙ্গাজলের ঘড়াটা কুলীদের হাতে দিস্‌নে, নিজেরা তুলিস, তা বুঝি আর পারলি না? ও ত হয়ে গেল। এখন ঐ ম্লেচ্ছের দেশে পুজো আচ্ছা কর্‌ব কি দিয়ে? বলি, ও হতভাগা, আক্কেল নেই একেবারে?"

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "জ্যাঠাইমা, আমি কালা নই, অত জোরে না চেঁচালেও চল্‌বে। আর তোমার গঙ্গাজলের ঘড়া এখনও মোটরেই রয়েছে, সুতরাং সেটা হয়ে যায়নি এখনও।"

জ্যাঠাইমা রাগিয়া বলিলেন, "না, চেঁচাব না! ভালো কথা তোদের

খানে যায় কি না? ঐ যে ঘড়াটা ঐ কুলী ছোঁড়ার হাতে, ওটা আমার গঙ্গাজলের ঘড়া না? আমি ত আর চোখের মাথা খাইনি। আবার বলে, মোটরে রয়েছে!"

তাঁহার দেবরপুত্রটি এবার রীতিমত চটিয়া বলিল, "ছুনিয়ায় ঘড়া আছে একমাত্র তোমার! এমন রত্ন আর কারো ঘরে নেই! বিশ্বাস না হয়, নেমে গিয়ে দেখে এসো, গাড়ীতে তোমার ঘড়া আছে কি না।"

এমন সময় তাঁহাদের বাড়ীরই চাকর উক্ত ঘড়াটি কাঁধে করিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সে তর্কটা তখনকার মত মিটিয়া গেল। কিন্তু গৃহিণী এত অল্পে হাল ছাড়িবার পাত্রী নন্। তিনি মিনিট-ছুই পরেই আবার হাঁক-ডাক সুরু করিলেন, "ওরে ও লক্ষ্মীছাড়া মেধো, বিছানা কি ঐ-রকম ক'রে বাঁধে রে? আধখানা তোষক যে বেরিয়ে পড়েছে, এখনি ছত্রিশ জাতের গায়ের ওপর দিয়ে ত নিয়ে যাবি? আর আমার জাহাজে পাতবার কম্বল আর চাদর কি হ'ল? খুইয়েছে নাকি সে-ছুটো?"

কৃষ্ণা দেখিল, সে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া যুবক-ছুটি আরো বেশী অপ্রস্তুত ও বিরক্ত হইতেছে। সে গৃহিণীর কর্ণতৃপ্তিকর বক্তৃতা শোনার লোভ ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রতিভা এবং গৃহিণীর কন্যা-ছুইটি বসিয়া ছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া, কৃষ্ণার জন্য অল্প একটুখানি জায়গা করিয়া দিল।

কৃষ্ণা বসিতেই প্রতিভা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "কৃষ্ণাদি, আপনি সিল্কের কাপড় প'রে আসেননি কেন?"

কৃষ্ণা বেশ মূল্যবান মান্দ্রাজী সূতী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল। এ প্রশ্নে কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, সিল্কের কাপড় পরার দরকার কি?"

প্রতিভা বলিল, "ষ্টীমারে উঠবার সময় আর নামবার সময় সিল্কের কাপড় পরতে হয়। আমরা একবার সূতী কাপড় প'রে নেমেছিলাম ব'লে আমাদের এক খুড়-শাশুড়ী কত বক্‌লেন। বল্‌লেন, জাহাজে যারা

কেবিনে যায় তারা নাকি সূতী কাপড় পরে না, অন্ততঃ উঠবার নামবার সময়। তা না হ'লে জাহাজের বয়, টোপাজ, ভাণ্ডারী, এরা-সব মানে না, আয়া মনে করে।"

প্রতিভার কথা শুনিয়া কৃষ্ণার অত্যন্ত হাসি পাইলেও সে গম্ভীরভাবে বলিল, "তাই নাকি? তা ত জানতাম না? আচ্ছা, নামবার সময় পরা যাবে।" সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া আণ্ডাবাচ্চা সকলেই রেশমের কাপড় পরিয়া আছে। গৃহিণী ষ্টীমারে ওঠার খাতিরে এক জোড়া জুতা সুদ্ধ পরিয়া ফেলিয়াছেন! তাহাতে অবশ্য তাঁহাকে খুব খোঁড়াইয়া চলিতে হইতেছে, এবং খুব আঁট করিয়া পার্শী শাড়ী পরার জন্য তাঁহাকে ঠিক একটি পাটের বস্তার মতো দেখাইতেছে। যাহা হোক, কারণে এবং অকারণে অনেক হাঁকডাক গালিগালাজের পর জিনিষপত্র অবশেষে ষ্টীমারে উঠিল। কৃষ্ণা ততক্ষণ বসিয়া বসিয়া চরিদিকের যাত্রী-সমাগম দেখিতে লাগিল। যাত্রীদলের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বড় কম নয়। গুজ্‌রাটি, পার্শী, মারাঠা, ব্রহ্মদেশী, চীনা, জাপানী, কিছুরই অভাব নাই। বাঙালী সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। ছোট ছোট কোডাক্ ক্যামেরা লইয়া গুটি-তুইতিন যুবক নির্ব্বিচারে ছবি তুলিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা কাছে আসিবা মাত্র প্রতিভা আর অমিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। কৃষ্ণা তাহা না করিলেও, মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল, হয়ত তাহার ছবিই ছেলেগুলি কখন অলক্ষ্যে তুলিয়া বসিবে। গৃহিণী তাহাকে রক্ষা করিলেন। মোটা গলায় এক হাঁক দিয়া বলিলেন, "আ মর্ ছোঁড়ারা! রকম দেখ-না? বৌমা, তোমরা ভালো ক'রে ঘোমটা দিয়ে বোসো।" যুবকত্রয় তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিয়া গেল।

ষ্টীমারের শিঙা হঠাৎ ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নীচে ডেক্-এর যাত্রীদের মধ্যে মহা তাড়াহুড়া বাধিয়া গেল। পুলিশ সার্জেণ্টের গুঁতা, এবং খালাসীদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ির দিকে দৌড়িল। তুচারজন আছাড় খাইল, কেহ বা গড়াইয়া নীচে পড়িল,

অনেকেরই জিনিষপত্র হস্তচ্যুত হইল, কিন্তু সেদিকে তাহাদের লক্ষ্য দেখা গেল না।

বিপিন নীচ হইতে ডাকিয়া বলিল, "জ্যাঠাইমা, তোমারা নেমে এস, উঠবার সময় হয়েছে।"

গৃহিণী তাঁহার আণ্ডাবাচ্চা লইয়া গজেন্দ্রগমনে নীচে নামিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিভা কৃষ্ণার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আপনার কষ্ট হচ্ছে না, দেশ ছেড়ে যেতে?"

কৃষ্ণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল, "দেশে আমার কেই বা আছে যে কষ্ট হবে?"

অমিয়া এতদিনে প্রথম তাহার সঙ্গে কথা বলিল, "রেঙ্গুন আপনার ভালোই লাগবে, খুব বেড়াতে পারবেন।"

বিপিন বলিল, "শীগ্‌গির ক'রে এস। জ্যাঠাইমা, দাঁড়াও, আগে যেয়ো না, লোকের ধাক্কা খাবে। মেধো, আগে যা, খুকীকে নিয়ে। বড় বৌদি, তোমরা যাও। জ্যাঠাইমা, এইবার তুমি যাও।"

সকলে কোনো গতিকে উঠিয়া পড়িল। উপরের ডেক্ একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাহার ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়াই দুষ্কর। সকলে ঠেলাঠেলি মারামারি করিয়া একটুখানি ভালো জায়গা দখল করিবার চেষ্টায় আছে। কেহ কোনোমতে একটা মাদুর বা শতরঞ্চি বিছাইয়া ফেলিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত, সেখানে তাহার অখণ্ড রাজত্ব। কৃষ্ণা দেখিল, হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকগুলি এবিষয়ে বেশ মজবুত। ঠেলাঠেলি এবং গলাবাজি করিয়া তাহারা মস্ত মস্ত পালোয়ান ভোজপুরী, মাদ্রাজী প্রভৃতিকে হঠাইয়া দিব্য ভালো জায়গা দখল করিয়া বসিতেছে। "ইয়ে হামারা ইলাকা," বলিয়া তাহারা যেরূপ জোরের সহিত চাপিয়া বসিতেছে, ততখানি জোর ঝাঁশীর রাণীও প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

শাম্‌লা মাথায়, চোগা-চাপকান পরা, জাহাজের 'বয়'-এর দল সার দিয়া প্রবেশ-পথের কাছে দাঁড়াইল। বিপিনের কাছে কেবিনের নম্বর দেখিয়া

লইয়া, একজন 'বয়' তাহাদের দলটিকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। দলটি ছোট-খাটো নয়, দুটি কেবিন পুরা, এবং অন্য একটি কেবিনেও একটা 'বার্থ' তাহাদের লাগিবে।

কেবিন দেখিয়া ত কৃষ্ণার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। এতটুকু ঘরে, এই একপাল লোকের সঙ্গে তাহাকে তিনদিন বাস করিতে হইবে? তাহার উপর এই জিনিষপত্রের রাশ। কিন্তু পথে-ঘাটে বেশী খুঁৎখুঁতে হইয়া লাভই বা কি? যেমন করিয়া হোক, যাইতে হইবে। এ ত আর বোর্ডিং বা বাপের বাড়ী নয়, যে, একটি ঘর কেহ তাহাকে একেলা ছাড়িয়া দিবে? তবে কেবিন ছোট হইলেও খুব তক্‌তকে পরিষ্কার এবং বিছানা চাদর তোয়ালে বালিশের-ওয়াড় সবই সদ্যধৌত দেখিয়া সে একটু খুসী হইল।

কেবিনের ভিতর জিনিষপত্র সন্নিবেশ লইয়া আর-একপালা ঝগড়া-ঝাঁটি হইয়া গেল। যাহা হউক, অবশেষে গৃহিণীর পছন্দমতো সব জিনিষ রাখা হইল। কৃষ্ণা তখন তাকাইয়া দেখিল, গৃহিণী চীৎকার করেন বটে, কিন্তু কাজও করাইয়া লইতে জানেন। কেবিন এখন আর তেমন বাসের অযোগ্য দেখাইতেছে না, অত জিনিষ ঠুশিয়াও চলিবার-ফিরিবার জায়গা আছে।

সে একটা বার্থের উপরকার পোর্টহোল্ দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। জাহাজের শিঙা তীব্র স্বরে বাজিয়া চলিয়াছে, এখনই ছাড়িবে বোধ হয়। ডেকের উপর মহা ভিড়, সকলে চীৎকার করিয়া ডাঙার মানুষের সঙ্গে কথা বলিতেছে! কেহ বা প্রিয়জনকে বিদায় দিতে আসিয়াছে, তাহার চোখ সজল, কোনো-গতিকে মুখে হাসি আনিয়া কথা বলিতেছে। কেহ বা উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার ব্যথা বুঝি বলিয়া বুঝাইবার নয়! অনেকেই হাসি-তামাসা দিয়া আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে।

কৃষ্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "ভালোই যে আমার কেউ নেই। এ-রকম ক'রে ছেড়ে সাগর-পারে যেতে হ'লে বুক ফেটে যেত।"

খালাসীরা চীৎকার করিয়া সিঁড়ি তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের চীৎকার শুনিবামাত্র যাত্রী ভিন্ন আর যাহারা উপরে উঠিয়াছিল, সব দৌড়িয়া নামিয়া পড়িল। ষ্টীমারের লৌহ-অঙ্গ হেলিয়া-দুলিয়া উঠিল, বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত তাহার ভিতর স্পন্দন সুরু হইল।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। যাত্রীতে আর ডাঙার মানুষে চীৎকার করিয়া যাহা-কিছু বলিবার ছিল তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লইতে লাগিল। অনেকেই চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল, ছোট ছেলেমেয়ে দু-চারিটি উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

ষ্টীমার অল্পে অল্পে সরিয়া চলিল। জেটীর দোতলা হইতে রুমাল ছাতা ছড়ি ঘুরাইয়া সকলে যাত্রীদের বিদায় দিতে লাগিল, উচ্চকণ্ঠে বিদায়সম্ভাষণ করিতে লাগিল। জাহাজের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে তীর দূরে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণা বার্থ হইতে নামিয়া পড়িল। অজানা দেশের পথে ত চলিল সে, এখন, দেখা যাক, অদৃষ্টের গর্ভে তাহার জন্য কি নিহিত আছে।

১৫

জাহাজ মাঝ-গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেই গৃহিণী বলিলেন, "নাও, এখন আবার দুদিনের জন্যে এখানেই ঘরকন্না পেতে বস্‌তে হবে; সেই রান্নার জোগাড় কর, সেই লোকজনের সঙ্গে বকাবকি কর। ওরে, এই ছোঁড়া, ভাণ্ডারীটাকে ডাক্‌-না?"

গৃহিণীর ভৃত্য ভাণ্ডারী-নামধারী জাহাজের হিন্দু পাচকের সন্ধানে চলিল। গৃহিণী কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সকালে কিছু খেয়ে বেরিয়েছ মা? এখনও ত রান্নাবান্না হতে ঢের দেরি হবে। ভাঁড়ার দেব, সে কুটবে, বাছবে, মশলা বাঁটবে, তবে গিয়ে রান্না হবে। ততক্ষণে তোমার বোধ হয় নাড়ী হজম হবার জোগাড় হবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "সকালে চা খেয়ে ত বেরিয়েছি; একেবারে ক্ষিদেয় মারা যাব না। ছুটির সময় খেতে ত খুবই বেলা হয় মাঝে মাঝে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, চা খেয়ে এসেছ ত বড়ই খেয়েছ। ওতে আছে কি? আমি বাছা, পথে-ঘাটে বেরোবার সময় সর্ব্বদা তৈরী খাবার কিছু সঙ্গে নিয়ে বেরোই। ক্ষিদেয় ছেলেপিলে মুখ শুকিয়ে ব'সে থাকে, এ আমি দেখতে পারি না। ছোট বৌমা, টিফিন-কেরিয়ারটা বার কর ত ঐ কোণ থেকে। মেয়েকেও কিছু দি, তোমরা সকলেও কিছু কিছু খাও। সেই সকালে কখন খেয়েছ!"

ছোট বৌ অনেক কষ্টে, বাক্স-বিছানার স্তূপের আড়াল হইতে প্রকাণ্ড এক টিফিন-কেরিয়ার বাহির করিল। একটা বেতের ঝুড়ি হইতে প্রায় এক ডজন কাঁসার রেকাবী বাহির করিয়া গৃহিণী খাবার সাজাইতে বসিলেন। কৃষ্ণা দেখিল জাহাজে ওঠার গোলমালেও গৃহিণী খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন সংক্ষেপে সারেন নাই। লুচি, বেগুন-ভাজা, মাংস, চাট্‌নী, বড় বড় লালমোহন সন্দেশ, একটিও বাদ পড়ে নাই। ছেলে মেয়ে বৌ সকলেই খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে গৃহিণীর আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া চলে দেখা গেল।

কৃষ্ণা খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া বলিল, "এত খেলে ত আর ভাত খাওয়ার কিছু দর্‌কার হবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "শোন কথা, এই চারখানা লুচি খেয়ে সারাদিন থাক্‌বে? আজকালকার মেয়েদের এই এক ঢং হয়েছে বাপু। আমার বৌগুলোও ঠিক এই রকম। খাওয়াটা যেন ভারি একটা লজ্জার বিষয়। না খেলে চল্‌বে কেন? এরপর ছেলেপিলের মা হবে, ঘর-সংসার করতে হবে। চিরকাল ত আর শাশুড়ী-মাগী বেঁচে থাকবে না? এখন এমন ফিনফিনে সৌখীন শরীর করলে চল্‌বে কেন?"

বৌ-দুটি নীরবে খাইতে লাগিল। কৃষ্ণা দেখিল এ বিষয়ে কিছু বলিলে গৃহিণীর বক্তৃতা আজ আর বন্ধ হইবে না। আধুনিক মেয়ে এবং তাহাদের

কম খাওয়া ভদ্রমহিলার কাছে অত্যন্ত একটা বড় জিনিষ। এ বিষয় নিজের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ তিনি কখনও ত্যাগ করেন না।

কেবিনের দরজায় ঠক্‌ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। গৃহিণীর ছোট একটি ছেলে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভাণ্ডারীকে লইয়া চাকর ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৃহিণী তাহার সঙ্গে দর-কষাকষি আরম্ভ করিলেন। তিনি কতবার রেঙ্গুন গিয়াছেন এবং আসিয়াছেন, কোন্ কোন্ জাহাজে আসিয়াছেন, কোন্ ভাণ্ডারীকে কত দিয়াছেন, সব তাহাকে শুনাইয়া, তারপর মাঝামঝি একটা রফা করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর আসিল ভাঁড়ার দেওয়ার পালা। মস্ত বড় টিফিন-বাস্কেট খুলিয়া, বড় বড় এল্যুমিনিয়মের ডেক্‌চি বাহির করা হইল। ডাল, চাল, গৃহিণী টিনে করিয়া মাপিয়া দিলেন। ডিম, আলু, পেঁয়াজ সব গণিয়া গণিয়া দিলেন। ঘি, তেলও মাপিয়া দিলেন। ভাণ্ডারীটা একটু হাসিয়া জিনিষপত্র লইয়া প্রস্থান করিল। কৃষ্ণা কখনও রীতিমত সংসারের মধ্যে প্রতিপালিত হয় নাই। শৈশবে যে মহিলার কাছে সে ছিল তাঁর ঘরকন্নাটা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। তাহাতে খুঁটিনাটির ব্যবস্থা করা, তাহা লইয়া ভাবা এবং সে-ভাবনা ব্যক্ত করা, এসব কোনো বালাই ছিল না। একটা ঝিতে সকালে পয়সা লইয়া বাজারে যাইত, যাহা-খুসি কিনিয়া আনিয়া, যেমন-খুসি রান্না করিয়া দিত। নিতান্ত অখাদ্য না হইলে কৃষ্ণার পালিকা মাতা এসব লইয়া কোনো উচ্চবাচ্য করিতেন না। নির্ব্বিবাদে, নীরবে তাহাদের দিন কাটিয়া যাইত। তাহার পর, একটু বড় হইয়া অবধি ত বোর্ডিংএ বোর্ডিংএই ঘুরিয়াছে। সেখানে সংসার করার কোনো উৎপাতই নাই, কারণ সেটা কাহারও নিজের সংসার নয়। মাইনে-করা লোকে কোন-গতিকে দিনে চারবার খাবার জোগাড় করে, টাকা দিয়া মেয়েরা সেই খাদ্য বা অখাদ্য খাইয়া আসে। বেশী জ্বালাতন হইলে নিজেদের মধ্যে বকাবকি করে, আবার পূর্ব্বের মতোই দিন চলিতে থাকে। সুতরাং এই গৃহিণীটিকে কৃষ্ণার বেশ ভালোই লাগিতেছিল। ঠিক এই

ধরণের মানুষের সঙ্গে সে কখনও থাকে নাই। ঘরসংসার, ছেলে-মেয়ে, বৌ, ভাঁড়ার, রান্নাঘর লইয়া ইহার যে জগৎটি, তাহা ইহার কাছে স্পষ্ট জিনিষ, কোথাও তাহার আব্‌ছায়া নাই। আর এগুলির বাহিরের কোনো জিনিষের অস্তিত্বকে তিনি একরকম অস্বীকার করিয়াই চলেন। এ সংসারের সব তাঁহার নখদর্পণে, কোথাও পান হইতে চুণ খসিলে তাঁহার চোখ এড়ায় না। ইহার কিছুই তাঁহার কাছে তুচ্ছ, ফেল্‌না নয়। বাহিরের জগতের অতিবড় সব সমস্যা তাঁহার মনোজগতের সীমানায় কখনও আসিয়া পৌছায় না, তিনি তাহার একান্ত নিজস্ব এই জগতের মধ্যেই নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া রাখেন। তাঁহার অবসর নাই, সারাক্ষণ ইহার ভালোমন্দ লইয়াই তিনি আছেন। মানুষ কত অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া জীবন কাটায়, কিন্তু এই মানুষটিকে ঠিক এই অবস্থা ছাড়া আর-কোনো অবস্থার মধ্যে কৃষ্ণা কল্পনাও করিতে পারিল না।

খাওয়ার পালা চুকিয়া গেল। ছোক্‌রা চাকরটি কেবিনের ভিতর মুখ ধুইবার নলের কাছেই সাবান দিয়া বাসন-কোসন ধুইয়া আবার ঝুড়ির ভিতর গুছাইয়া রাখিল। তাহার পর আণ্ডা-বাচ্চা যতগুলি ছিল, সব চাকরের সঙ্গে ডেকের উপর বেড়াইতে চলিল। তাহারা বাহির হইয়া যাইতেই গৃহিণী বলিলেন, "বাবা, এগুলো একটু সরলে যেন কানদুটো জুড়োয়। লক্ষীছাড়ারা বাড়ীর ত্রিসীমানায় কাগ চিল বস্‌তে দেয় না।"

অতঃপর নিজের রেশমী কাপড়-চোপড়ের বন্ধন মোচন করিতে করিতে বলিলেন, "বড় বৌমা, আমার চামড়ার বাক্সটা থেকে একখানা আটপৌরে শাড়ী বার ক'রে দাও ত। এসব ধড়াচূড়া এঁটে আমি আবার বেশীক্ষণ থাকতে পারি না, প্রাণ যেন আইঢাই করে। বয়সকালে অবিশ্যি সেমিজ সায়া, বডি সব খুবই পরেছি, এদানীং আর পারি না, বড় মোটা হয়ে প'ড়েছি। ছোট বৌমা, আমার কাপড়চোপড়গুলো ঐ ছোট চামড়ার বাক্সে পাট ক'রে রাখ, আবার নাম্‌বার সময় পরতে হবে। জুতো-জোড়া, বেঞ্চির নীচে রেখে দাও এক কোণায়।"

বধূরা তাঁহার আদেশ পালন করিল। তাহার পর কৃষ্ণা এবং অমিয়া ও প্রতিভাও মূল্যবান্ কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, আটপৌরে শাড়ী পরিয়া বসিল। বধূরা জুতা ছাড়িয়া খালি-পায়েই থাকিয়া গেল। কৃষ্ণা একজোড়া চটি পায়ে দিয়া বসিল।

গৃহিণী বলিলেন, "ছেলেপিলেগুলোকে ত চান করিয়েই এনেছি, আমাদের আর কাজের তাড়ায় চান হয়নি। নাও এক এক ক'রে সেরে। এখানে আবার সব-সময় বাথরুম্ খোলা পাবার জো নেই। তার ওপর পশ্চিমে-মাগীরা যদি একবার ঢুকল ত বেরোবার আর নাম করে না। আর যা পিচেশ মাগীরা। দরজার গোড়ায় সুদ্ধ ছেলেপিলেকে হাগিয়ে রাখবে। টোপাজটাকে ত ডাকতে হয়। বড় বৌমা, ঘণ্টাটা বাজিয়ে দাও ত।"

অমিয়া উঠিয়া গিয়া চাকর-বাকর ডাকার বোতামটা টিপিয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের কেবিনের 'বয়' আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে জাহাজের মেথর, ওরফে টোপাজের সন্ধানে প্রেরণ করা হইল। বৌরা ততক্ষণ শাশুড়ীঠাকুরাণীর ও নিজেদের স্নানের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সব বাহির করিয়া ঠিকঠাক করিতে লাগিল। দেখাদেখি কৃষ্ণাও শাড়ী, সাবান, তোয়ালে, চিরুণী প্রভৃতি সব বাহির করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল।

টোপাজ আসিয়া উপস্থিত হইল কয়েক মিনিটের মধ্যে। তাহার সঙ্গেও একটু দর-কষাকষি হইল। আর কেহ যাইয়া বাথরুম নোংরা করিবার আগেই সে ইঁহাদের স্নান করিবার সুবিধা করিয়া দিবে, তাহার জন্য ইহাকে কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। বাচ্চা-কাচ্চাদের কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া দিবার ভারও সে গ্রহণ করিল। গৃহিণী বলিলেন, "এসব কাপড় ডাঙায় নেমে একেবারে দেব ধোপার বাড়ী চালিয়ে। এ ক'টা দিন নানা জাতের সঙ্গে ছোঁয়া-ন্যাপা ক'রে একাকার হবে। কিন্তু কি আর করা যায় বল? উপায় ত নেই? কথাই আছে, বৃহৎ কাষ্ঠে গজপৃষ্ঠে দোষ নাস্তি!"

টোপাজ জানাইল, এখন স্নানের ঘর পরিষ্কারই আছে, তাঁহারা এখন ইচ্ছা করিলে গিয়া স্নান সারিয়া আসিতে পারেন। ইহার পর ছত্রিশ জাতের ভিড় লাগিয়া যাইবে, তখন বিপদে পড়িতে হইবে।

গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া পড়িলেন। নিজের কাপড়-চোপড় হাতে লইয়া বলিলেন, "বড় বৌমা তুমি চল আমার সঙ্গে। তুমি আবার ভীতু মানুষ। ছোট বৌমা ও কৃষ্ণা পরে যাবে, ওরা চটপটে আছে।" অমিয়া কাপড় গামছা লইয়া নীরবে শাশুড়ীর অনুগমন করিল।

কৃষ্ণা পোর্টহোল দিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। জাহাজ এখনও গঙ্গায়, কিন্তু এ গঙ্গা প্রায় সমুদ্রের মতোই বিস্তৃত। দূরে, অতি দূরে তীরের অস্পষ্ট আভাস, তরুশ্রেণীর নীলাভ ছায়ামূর্ত্তি। জাহাজের 'প্রপেলারে'র শব্দ ভিন্ন আর কোনও শব্দ নাই। তাহার পরিচিত জগৎও এমনই ছায়ার মতোই হইয়া আসিল, ইহার পর একেবারেই মিলাইয়া যাইবে। যেখানে সে চলিয়াছে, তাহার সহিত পরিচয় কতদিনে এত গভীর হইবে জানা নাই, সে-পরিচয় সুখের হইবে কি দুঃখের হইবে, তাহাই বা কে জানে?

অমিয়া এবং তাহার শাশুড়ী স্নান সারিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন। ভিজা চুল আঙুল দিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া দিতে দিতে গৃহিণী বলিলেন, "যাও এবার তোমরা, তা না হ'লে কে না কে ঢুকে খিল দিয়ে বসবে।"

কৃষ্ণা ও প্রতিভা স্নান করিতে চলিল। কেবিন হইতে বাহির হইয়াই জাহাজের 'প্যাসেজ' বা রাজপথ, তাহার দুধারেই প্রায় কেবিন। কিছুদূরে গিয়াই মেয়েদের স্নানাগার।

অনেকবার এই লাইনে যাতায়াত করিয়া প্রতিভা সত্যই বেশ চটপটে হইয়া উঠিয়াছিল। জাহাজে ভ্রমণ কৃষ্ণার কোনোদিনই অভ্যাস ছিল না, কাজেই কয়েকটা ব্যাপার তাহার কাছে একটু নূতন নূতন ঠেকিতেছিল। প্রতিভা তাহাকে সব দেখাইয়া-শোনাইয়া দিল।

কৃষ্ণার স্নান প্রায় মাঝামাঝি হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় তাহার দরজায় ঘা পড়িল। বাহির হইতে কে একজন কাংস্যকণ্ঠে বলিল, "খোলো না, দরওয়াজা কাহেকো বন্ধ্ করা?"

কৃষ্ণা বুঝিল, পশ্চিমদেশীয়া অধিবাসিনীদের শুভাগমন সুরু হইয়াছে। সুখের বিষয় টোপাজটা তখনই নবাগতাকে অন্যদিকে লইয়া গেল। স্নানাদি সারিয়া আসিয়া, কেবিনে বসিয়া গল্প করা ছাড়া আর-কিছু কাজ রহিল না। বৌরা শাশুড়ীর সামনে ভাল করিয়া কথা বলে না, চুপচাপ থাকে। গৃহিণী অবশ্য কথা বলিতে খুবই প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার গল্পের বিষয় বড়ই সীমাবদ্ধ। দু'চারিটি জিনিষ ছাড়া তিনি আর কোনো বিষয়ের বড় ধার ধারেন না। তাহা ছাড়া বয়সেও তিনি মায়ের বয়সী। কাজেই দুইচার কথা কওয়ার পর কৃষ্ণাও চুপ করিয়া গেল। জাহাজের গতির একটানা সঙ্গীতে তাহার যেন কেমন ঘুম আসিতে লাগিল। পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি একখানা মাসিক-পত্র বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

ভাণ্ডারী খানিক পরেই রান্না করিয়া সব জিনিষ দিয়া গেল। অল্পক্ষণ আগেই সুপ্রচুর জলযোগ করাতে কৃষ্ণার একটুও আর খাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গৃহিণীর বকুনি শুনিবার ভয়ে সেও তাঁহার বধূদের মতোই নীরবে খাইতে বসিয়া গেল। ডাল-তরকারি সব ডগডগে লাল রঙের। মুখে দিয়াই কৃষ্ণার প্রায় চোখের জল বাহির হইয়া আসিল। অমিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বেশী ক'রে লেবু দিয়ে খান। জাহাজের ভাণ্ডারীগুলো বড় বেশী লঙ্কা-বাটা দেয়, হাজার বারণ করলেও শোনে না।"

সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ করা, বাসন প্রভৃতি ধুইয়া আবার যথাস্থানে রাখা প্রভৃতি সারিতে সারিতে ঘণ্টা-দেড় কাটিয়া গেল। গৃহিণীর ছোট ছেলেমেয়েরা এবং তিনি নিজে ঘুমাইয়া পড়িলেন। অমিয়া একটা সেলাই লইয়া বসিয়া গেল। প্রতিভা একখানা উপন্যাস বাহির করিয়া পড়ায় মন দিল। কৃষ্ণা ইংরেজী মাসিকপত্র লইয়া খানিক নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু তাহার মন কিছুতেই বসিতে চাহিল না। কেবিনের ঘুলঘুলি দিয়া আবার উঁকি

মারিয়া দেখিল, তাহারা প্রায় তটভূমির শেষ সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর তীরহীন অকূল সাগর। প্রতিভা তাহাকে দেখাইয়া দিল, "এইটাকে সাগর-দ্বীপ বলে, কৃষ্ণাদি। দেখুন, কত নারকেল গাছ।"

জলের ভৈরব কল্লোল ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। ঢেউগুলি লাফ দিয়া যেন ঘুল্‌ঘুলির ভিতর দিয়া কেবিনে আসিয়া ঢুকিতে চায়। জলের রংও গাঢ়তর নীল হইতে হইতে কালির মত কালো হইয়া উঠিল। কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, কালাপানি নামটা সার্থক বটে!"

প্রতিভা বলিল, "আচ্ছা, কৃষ্ণাদি, আপনার মাথা ঘুরছে না?"

কৃষ্ণা বলিল, "কই, না ত? তোমাদের ঘুরছে নাকি?"

প্রতিভা বলিল, "এখন আর ঘোরে না, অনেকবার যাওয়া-আসা ক'রে ক'রে সয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমবার, বাপরে! মনে করলে এখনও আমার গা কাঁপে। যেই না সমুদ্রের জলের আঁসটে গন্ধ নাকে আসা অমনি যে আমার বমি সুরু হ'ল, চারদিন আর মাথা তুলতে পারলাম না! ভয়ানক কষ্ট পেয়েছিলাম, সেবার।"

কৃষ্ণা বলিল, "এখন অবধি ত বেশ আছি। জাহাজ বেশী দুললে কি হয় বলতে পারি না।"

সমুদ্রের অবিশ্রাম গর্জ্জন আর জাহাজের দোলানিতে তাহার কিন্তু ঘুম আসিয়া গেল। সরু বেঞ্চে কোনোরকমে গুটি-সুটি মারিয়া সে শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ যে সে ঘুমাইল তাহার ঠিকানা নাই, অমিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। কৃষ্ণা চোখ মেলিতেই বলিল, "বেলা প'ড়ে গেছে আপনি উঠুন। 'বয়' চা রেখে গিয়েছে আপনার জন্যে।"

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল। মুখ ধুইয়া, চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বলিল, "এ কি, মাত্র এক-পেয়ালা যে? তোমরা খাবে না?"

অমিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমরা বড়-একটা খাই না। শাশুড়ীঠাকরুণ পছন্দ করেন না।"

গৃহিণী এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলেন। এই সময় তাঁহার ছোট মেয়ে ঘুমের ঘোরে এক গুঁতা দেওয়াতে, তিনি হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিলেন। বাচ্চার দলও দেখিতে দেখিতে উঠিয়া পড়িল।

আবার সুরু হইল, চ্যাঁ, ভ্যাঁ, হুড়াহুড়ি, মারামারি। "মা খিঁদে পেয়েছে," "বৌদি জল খাব," "ওমাঁ ওপরে যাব", ইত্যাদি চীৎকারে কেবিন মুখরিত হইয়া উঠিল। গৃহিণী আবার টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া বসিয়া গেলেন। এবার আর রেকাবীতে সাজাইবার তর সহিল না, হাতেহাতেই লুচি, তরকারি, মিষ্টি লইয়া ছেলেমেয়েরা খাইতে লাগিয়া গেল। বক্তৃতা শোনার ভয়েও কিন্তু কৃষ্ণা আর খাইতে রাজী হইল না, একটা মাত্র সন্দেশ মুখে দিয়া চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া ফেলিল।

খাওয়া শেষ হইবামাত্রই ছেলেপিলের দল আবার ডেকের দিকে দৌড়িল। দুই দেবর-পুত্রের জন্য অন্য কেবিনে খাবার সাজাইয়া পাঠাইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এবার আর বিপিন, নবীনের এমুখো হবার নাম নেই, মেয়ে রয়েছে কিনা! তা না হ'লে এতক্ষণ বিশবার বৌদের সঙ্গে সুখুন্ করতে এসে হাজির হ'ত।"

কৃষ্ণা মনে মনে ভাবিল, ছেলে-দুইটি নিশ্চয়ই তাহার উপর চটিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত তাহারা আসিতে পারে। সে ত সম্পর্কে তাহাদের ভাদ্রবৌ হয় না, যে, তাহার মুখ দেখিলেই জাত যাইবার সম্ভাবনা?

এমন সময় জাহাজের 'বয়' পেয়ালা লইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আরো জলের প্রয়োজন, ঘরটা আর-একবার ঝাঁট দিতে হইবে, ইত্যাদি হুকুম জারি করিয়া গৃহিণী দেবরপুত্রেরা ভালো করিয়া খাইল কিনা তাহার সংবাদ লইতে অন্য কেবিনে চলিয়া গেলেন। 'বয়' পেয়ালা লইয়া চলিয়া গেল এবং মিনিট-পাঁচ পরেই জলের পাত্র এবং ঝাঁটা হস্তে ফিরিয়া আসিল। জল যথাস্থানে রাখিয়া, কেবিন ঝাড়িয়া মুছিয়া ঝাঁট দিয়া ঠিক করিতে লাগিল।

কৃষ্ণা, অমিয়া এবং প্রতিভা অপেক্ষা করিতেছিল, কতক্ষণে 'বয়'টি বিদায় হয়। তাহাদের ইচ্ছা ছিল একবার ডেকে গিয়া বেড়াইয়া আসে। চাকর

অথবা বৌদের দেবররা কেহ সঙ্গে থাকিলে ইহাতে গৃহিণীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু ডেকে যাইতে হইলে খানিকটা বেশভূষা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। কাজেই 'বয়' বিদায় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার যে চট্ করিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে, তাহা মনে হইল না। সে অত্যন্তই ধীরেসুস্থে কাজ করিতে লাগিল। একটা জায়গা পাঁচবার মোছে, দশবার ঝাড়ে। কৃষ্ণা ভাবিয়াই পাইল না, ব্যাপার কি। অমিয়া ও প্রতিভা বেশ খানিকটা করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

লোকটা হঠাৎ কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুর বাড়ী কোথায় ?"

কৃষ্ণা ত অবাক্! বাবু আসিল কোথা হইতে ? প্রতিভা খুক্ খুক্ করিয়া ঘোমটার মধ্যেই হাসিতে আরম্ভ করিল।

'বয়', হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকেই তাকাইয়া আছে দেখিয়া কৃষ্ণা বুঝিল প্রশ্নটা তাহাকেই করা হইয়াছে। যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া সে বলিল, "কলকাতাতেই।"

'বয়' বলিল, "আমি ছ'মাস কল্‌কাতায় ছিলাম। খাসা মুলুক। এ জাহাজে কাম ক'রে ক'রে দেশের কথা ত এক রকম ভুলেই গেছি। কথা কইবার লোকই মেলে না।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

লোকটা বলিল, "চাটগাঁয়ে। কিন্তু বিশ বচ্ছর আমি দেশ-ছাড়া।"

এমন সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই মহা তাড়াহুড়া বাধাইয়া দিলেন। "কাপড় ছাড়, চুল বাঁধ, হাতমুখ ধোও। ওপরে একটু যাবে না? সারাটা দিন এই খুপরীর মধ্যে ব'সে থাকলে মাথা ধ'রে উঠবে যে ?"

'বয়' বেচারা অগত্যা তাহার গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া ঝাঁটা বাল্‌তি প্রভৃতি লইয়া প্রস্থান করিল। কৃষ্ণা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাবেন না ওপরে বেড়াতে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "যাব, আগে ভাণ্ডারীটাকে জিনিষপত্র বার ক'রে দিই। বিপ্‌নেকে ব'লে এলাম, সে তোমাদের নিয়ে যাবে। কাপড়-চোপড় প'রে তৈরি হয়ে নাও।"

গৃহিণী হাঁড়ি ডেক্‌চি লইয়া ভাঁড়ার বাহির করিতে বসিলেন। বড়-বৌ ছোট-বৌয়ের চুল বাঁধিয়া দিতে লাগিল। কৃষ্ণাও বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকাল হইতে এই সিন্দুকের মত কেবিনে বসিয়া বসিয়া তাহার মাথা সত্যই ভারী হইয়া উঠিয়াছিল!

চুল বাঁধার পর্ব্ব শেষ হইতেই প্রতিভা কৃষ্ণার কাছে আসিয়া কানে কানে বলিল, "কৃষ্ণাদি, খুব ভালো শাড়ী পর্‌বেন।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, কোথায় কখন কি পর্‌তে হবে, সব ব'লে-ট'লে দিও।"

সে এবার খুব বাহারের সাজসজ্জা করিয়াই বসিল। হাল্কা নীল রঙের ক্রেপের শাড়ী ও জামাতে তাহার ইন্দ্রাণীর মতো রূপ আরো যেন দ্বিগুণ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। তাহার ছাত্রীদুইটি বেনারসী শাড়ী পরিতে পরিতে কেবলই তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল। ইহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে টাকা-পয়সা খরচ কম হয় নাই, কিন্তু কৃষ্ণা দেখিল রুচির অভাব যথেষ্টই আছে। এ বিষয়েও তাহাকে শিক্ষয়িত্রী হইতে হইবে সে তাহা ধরিয়াই লইল। সম্প্রতি গৃহিণীর সাম্‌নে আর-কিছু বলিল না।

বাহির হইতে দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া ঘা দিয়া বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "হ'ল তোমাদের সাজগোজ, বৌঠান?"

গৃহিণীর কিশোরী কন্যা তড়িৎ বৌদিদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল। সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "হয়ে গেছে বিপিন দা, কেবল ছোট বৌদির জুতোর ফিতে বাঁধা বাকি।"

কেবিনের ভিতরে চাহিতেই বিপিনের দুই চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া গেল। এমন শরীরিণী বিদ্যুতের মতো রূপ সে আর কখনো দেখে নাই। নিজের

অজ্ঞাতসারেই সে মিনিট-দুয়েক একদৃষ্টে কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সচেতন হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

কৃষ্ণা ব্যাপারটা বিশেষ লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু প্রতিভা অমিয়াকে টিপিয়া কি-একটা ইসারা করাতেই সে ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝিয়া লইল। পাছে অপ্রস্তুতে পড়িতে হয়, এই ভয়ে সে আর কেবিনের দরজার দিকে তাকাইল না। প্রতিভার জুতার ফিতা বাঁধা এবং অমিয়ার মাথায় ব্রোচ গোঁজা সমাপ্ত হইতেই তাহারা বাহির হইয়া পড়িল।

ডেকের উপর উঠিয়া কৃষ্ণা দেখিল, সেখানে যাত্রীর ভিড় এত যে, বেড়াইবার সুবিধা খুব বেশী নাই। তবু বদ্ধ কেবিনের বাহিরে আসিয়া জলকণাস্পৃষ্ট বাতাসের ঝাপ্‌টায় তাহার মাথা-ধরাটা অনেকখানি ছাড়িয়া গেল। ডেকের রেলিংএর ঠিক ধারটা অপেক্ষাকৃত যাত্রীহীন, সেইখানেই কৃষ্ণা তাহার ছাত্রীদুটিকে লইয়া একটু ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। তড়িৎও বড় মেয়ে হওয়ার গৌরবে তাহাদের সঙ্গেই থাকিয়া গেল। অন্য ছেলেমেয়েরা যাত্রীদের মধ্যেই মহা হুড়াহুড়ি করিয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিল। বিপিন কিছুদূরে একটা খালি বেঞ্চে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণা বেড়াইতে বেড়াইতে যাত্রীর দলকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। তাহারাও অবশ্য কৃষ্ণাকে দেখিল তার চেয়ে ঢের বেশী খোলাখুলি মনোযোগের সহিত। পাঞ্জাবী, কাবুলী, মারাঠী, গুজরাটী, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, কিছুরই অভাব নাই। বাঙালী যাত্রীও এধার ওধার খুঁজিলেই চোখে পড়ে। স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, নির্ব্বিচারে গোরু-ভেড়ার মতো গাদাগাদি করিয়া কিভাবে যে দিনরাত কাটাইতেছে, মনে করিতেই কৃষ্ণার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকগুলির কি দুর্গতি! এই পশুর ন্যায় লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে চব্বিশটা ঘণ্টা তাহারা বসিয়া, কোথাও নিজেকে আড়াল করিবার উপায় নাই।

যাত্রীদের পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি সব তাহাদের সঙ্গেই। মাদুর বা শতরঞ্চি

বিছাইয়া, তাহার চারিপাশে বাক্স-প্যাটরা সাজাইয়া, এক-এক দুর্গ রচনা করিয়া তাহারা বসিয়া আছে। হিন্দুস্থানীদের ভিতর কেহ বা সুর করিয়া তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছে, কয়েকটি জাতভাই তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া শুনিতেছে। কোথাও বা উড়িয়া-নন্দন প্রকাণ্ড চিত্র-বিচিত্র 'বটুয়া' খুলিয়া নানা সরঞ্জাম লইয়া পান সাজিতে ব্যস্ত। পান খাইবার উমেদারও চারপাশে অনেক হাজির। রমণীরা আপন-আপন সাময়িক ঘরকন্না গুছাইতেছে, ছেলেপিলে সাম্‌লাইতেছে, বা স্বামী-পুত্রের আহারের জোগাড় করিতেছে। তাহাদের জলে স্থলে একই অবস্থা। তবে বাঙালী মেয়ে যে দুই-চারিটি আছে, তাহারা এত লোকের ভিড়ে কেমন যেন একটুকু জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুস্থানী বা গুজরাটী মেয়েগুলি দিব্য সপ্রতিভ। শ'দুই পুরুষ মানুষ যে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে, সেটা তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই যেন আনিতেছে না। ডেকের এক কোণে ভাণ্ডারীর দোকান। সেখানে পুরী, ঝাল তরকারী, আটার হালুয়া খুব চড়া দামে বিক্রী হইতেছে। ফল-ফলারিও দুচারটা আছে। হিন্দুস্থানী প্যাঁড়া ও বুটের মিঠাইও বিরাজমান। তবে তাহাদের কৌলীন্য অবিসংবাদী হইলেও তাহাদের বয়স সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বেশী লোকে সেগুলি কিনিতেছে না। কাবুলীরা সঙ্গে প্রচুর মেওয়া, কমলালেবু, নাসপাতি প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে, এবং বসিয়া বসিয়া সেগুলি সজ্জিত করিতেছে। তামিল ক্রোরপতি চেট্টি হাঁটু-অবধি ময়লা কাপড় এবং কাঁধে পাড়ওয়ালা গামছা লইয়া স্বজাতীয় ব্যক্তির সহিত হাত নাড়িয়া গল্প করিতেছে। ইচ্ছা করিলে এমন জাহাজ সে দু-দশখানা কিনিতে পারে, কিন্তু চলিয়াছে পনেরো টাকা ভাড়ায় ডেক্ প্যাসেঞ্জার হইয়া।

সূর্য্য অস্ত যাইবার উপক্রম দেখা গেল। মসীকৃষ্ণ জলরাশির উপর হঠাৎ যেন হোলি খেলা সুরু হইয়া গেল। রঙে রঙে জলধির ঘন শ্যাম-লতাকে রাঙাইয়া দিয়া ক্ষণেকের মধ্যেই তপনদেব অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। হাওয়া যেন কিছু ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তাহার প্রবলতাও একটু বাড়িল।

নীচের ঘনকৃষ্ণ তরঙ্গদলের উপর আকাশ হইতে গাঢ়তর অন্ধকারের যবনিকা নামিয়া আসিতে লাগিল। দিক্‌চক্রবালের এক প্রান্তে সোনার খড়্গের মতো চন্দ্রের দীপ্তি দেখা দিল।

প্রতিভা বলিল, "হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে ত পা ব্যথা কর্‌ছে। কেবিনে ফির্‌বেন কৃষ্ণাদি?"

কৃষ্ণা বলিল, "বেশ ত ঠাণ্ডার মধ্যে আছি। এখনই ঐ গরমের মধ্যে আর ফির্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না। দু-একটা চেয়ার পেলে বসা যেত। একটা ডেক্‌-চেয়ার আমিই আন্‌ব ভেবেছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়িতে আর হয়ে উঠল না।"

অমিয়া বলিল, "ঠাকুরপো যে একেবারে এধার মাড়াচ্ছেন না, তা না হ'লে তাঁকে বল্‌তাম চেয়ার জোগাড় কর্‌তে।"

ঠাকুরপোকে আর ঘটা করিয়া ডাকিতে হইল না। সে আন্দাজেই ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। মিনিট পনেরো পরে দুইখানা ডেক্‌-চেয়ার সে কোথা হইতে যে জোগাড় করিয়া আনিল, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। চেয়ার-দুখানা পাশাপাশি রাখিয়া সে অমিয়াকে বলিল, "একটা মিস্‌ রায়কে দাও, আর একটাতে তোমরা পালা ক'রে বোস, চেয়ার আর পাওয়া গেল না। এ দুখানা জাহাজের এক বাঙালী কর্ম্মচারীর ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি।"

রেলিংএর ধারে চেয়ার টানিয়া লইয়া কৃষ্ণা ও অমিয়া বসিয়া পড়িল। তড়িৎ এবং প্রতিভা বিপিনের সঙ্গে হাওয়া খাইতে অন্য একদিকে চলিয়া গেল। জাহাজের বৈদ্যুতিক আলোগুলি হঠাৎ একসঙ্গে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র আলোর দ্বীপটি ভাসিয়া চলিল বিশ্বজোড়া নিকষ কালোর বুকের উপর দিয়া।

সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়া গর্জ্জন করিয়া জাহাজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। এক-একবার কৃষ্ণার মাথার কাপড়ে এমন সজোরে টান পড়িতে লাগিল, যে, তাহার ভয় করিতে লাগিল, চুল সুদ্ধ শাড়ীর

আঁচলটা ছিঁড়িয়া চলিয়া যায় বা। অমিয়া বলিল, "ব্রোচ-ট্রোচ শক্ত ক'রে আটকে নিয়েছেন ত? আমার একটা দামী পাথরের ব্রোচ একবার জাহাজে হারিয়েই গেল। যেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছি, এমন এক দম্‌কা হাওয়া এল, যে, মাথার কাপড়টা ফটাস্ ক'রে চুল থেকে ছেড়ে গেল। ব্রোচটা যে কোথায় ছিট্‌কে পড়ল, আর সন্ধানই পেলাম না।"

কৃষ্ণা বলিল, "না, আমার পিন্‌গুলো খুব শক্ত, সহজে ছেড়ে যাবে না।"

এমন সময় প্রতিভা আর তড়িৎ ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণা দেখিল, এখন তাহার ওঠা নিতান্তই উচিত, প্রতিভা এবং তড়িৎ দুজনেরই নিশ্চয় পা ব্যথা করিতেছে। অমিয়াকে বলিল, "চল, আমরা উঠে একটু বেড়াই, ওরা দুজন খানিক ব'সে নিক্, পায়ে ওদের খিল ধ'রে গিয়েছে বোধহয়।"

তাহারা উঠিতেই প্রতিভা আর তড়িৎ টপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। স্পষ্টই বোঝা গেল, যে, তাহাদের আর হাঁটিবার মতো অবস্থা নাই। কৃষ্ণা আর অমিয়া উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যাত্রীরা সব ক্রমেই ডেকের মাঝে সরিয়া গিয়া তাল পাকাইতেছিল। এতটা প্রবল হাওয়ার মধ্যে ঘুমানোও শক্ত। কাজেই তাহারা একটু আড়াল খুঁজিতেছিল। ইহারই মধ্যে অনেকে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ডেকের কিনারাগুলি অপেক্ষাকৃত খালি হইয়া যাওয়ায় কৃষ্ণাদের বেড়াইবার বেশ সুবিধাই হইল।

দুই-চারি পাক ঘুরিবার পর অমিয়া কৃষ্ণার কানের কাছে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আপনারা ত সকলের সাম্‌নে বেরোন? সকলের সঙ্গেই কথা ক'ন?"

কৃষ্ণা একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ। এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

অমিয়া বলিল, "ঠাকুরপোর খুব ইচ্ছে, যে, আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আপনি কি করবেন?"

কৃষ্ণা দেখিল, মেয়েটি মুখে যতই গম্ভীর হউক, ভিতরটা বালিকার মতো কাঁচা। চালাক মেয়ে হইলে দেবরের মনোগত ইচ্ছাটা এমন করিয়া তাহার সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া দিত না, কথাটা অন্য রকমে পাড়িত। মুখে সে বলিল, "তা বেশ ত। এক-বাড়ীতে যখন থাক্‌ব, তখন কথা-বার্ত্তা বলার দর্‌কারও ত হবে মাঝে মাঝে।"

অমিয়া বিপিনকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া খুব নত হইয়া কৃষ্ণাকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার কিছু দর্‌কার হ'লে আমাকে জানাবেন। কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "না, আপনার জ্যাঠাইমার তত্ত্বাবধানে অসুবিধা হবার জো কি? বরং তিনি সকলকে এতটা সুবিধা ক'রে দিতে চেষ্টা করেন, যে, তাতেই একরকম অসোয়াস্তি লাগে!"

বিপিন বলিল, "হ্যাঁ, সকলকে ধ'রে-বেঁধে পাঁচবার খাওয়াবার চেষ্টাটা তিনি একটু কম কর্‌লে পারেন।"

তাহার পর সকলে নীরবেই এক-রকম বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণা ভাবিয়াই পাইল না, ইহার সহিত সে কি বিষয়ে কথা বলিবে। বিপিন কথা বলিবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই করিল না। কৃষ্ণার পাশে পাশে ঘুরিয়াই যেন তাহার বুকের ভিতরটা তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। অমিয়া একবার তাহাকে ফিশফিশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ ঠাকুরপো, গল্প ত কর্‌লে না কিছু? আমাদের ত কান ঝালাপালা ক'রে দাও, বক্‌বক্ ক'রে।"

বিপিন বলিল, "তুমি আর উনি এক হ'লে নাকি? বেশী বক্‌বক্ কর্‌লে উনি কি মনে কর্‌বেন?"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিপিন বলিল, "ডিনারের ঘণ্টা পড়ছে। চলুন, আমরাও এবার বিদায় হই। ভাণ্ডারীটা নিশ্চয়ই এর আগে খাবার দিয়ে গেছে। বেশী দেরি করলে জ্যাঠাইমা আবার বকুনি সুরু কর্‌বেন।"

সকলে মিলিয়া নামিয়া চলিল। কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "বাচ্চার দল গেল কোথায়? তাদের ত দেখছি না?"

বিপিন বলিল, "তারা খাবার সন্ধানে অনেক আগেই কেবিনে ফিরে গেছে।"

কেবিনে ঢুকিয়াই কৃষ্ণার মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এতটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলি মানুষ! তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ডেকে এতক্ষণ বেশ ছিল সে।

খাওয়াদাওয়ার পালা এখনই সুরু হইবে। আটটার ভিতর জাহাজের সব কাজকর্ম্ম চুকাইয়া ফেলা নিয়ম। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, কৃষ্ণা তাহার চুলের রাশ খুলিয়া আঁচড়াইতে লাগিল। তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সুন্দর খোঁপাটা এখুনি খুলে ফেল্‌ছেন যে?"

কৃষ্ণা বলিল, "খোঁপা বেঁধে আমি শুতে পারি না। ছাড়া-বিনুনী ক'রেই শুই।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, এখনি শোবে কি? আগে খাও-দাও। আমি ত খেয়েই কিছুতেই শুতে পারি না, সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখি। খাওয়ার পর ঘুর্‌ব, ফির্‌ব, গল্পসল্প কর্‌ব খানিক, তারপর শোওয়া।"

বিপিন, নবীন, এবার এই কেবিনেই খাইতে আসিল। কৃষ্ণার সহিত পরিচয় হইয়া যাওয়াতে তাহারা এখন আর সঙ্কোচ করা প্রয়োজন বোধ করিল না। নবীন বিপিনের ছোট ভাই, সে কৃষ্ণার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা মাত্র করিল না, একটা নমস্কার করিয়াই সারিয়া দিল। বিপিনের মুগ্ধ দৃষ্টিটা একবার কৃষ্ণারও চোখে পড়িল। মনে মনে কিছু অস্বস্তি বোধ করিয়া সে একেবারে কোণে ঢুকিয়া বসিল।

খাওয়ার পালা শেষ হইতেই, শোওয়ার পালার আয়োজন আরম্ভ হইল। ছোট ছেলেমেয়ে-কয়টি বিপিনদের কেবিনে চালান হইল। বাকি রহিলেন গৃহিণী, তাঁহার দুই বৌ, তড়িৎ, কৃষ্ণা এবং গৃহিণীর কোলের মেয়ে। সেও যদিও ছয় বৎসর পার করিয়া সাতে পা দিয়াছে, তবু মাকে

াড়িয়া শুইতে একান্তই নারাজ। তিনটি 'বার্থে' এতগুলি জীবকে কুলানো ।ক্ত। কাজেই জিনিষ-পত্র ঠেলিয়া-ঠুলিয়া বার্থের নীচে গুঁজিয়া কেবিনের মাঝখানটা খালি করিতে হইল। সেখানে ঢালা বিছানা করিয়া প্রতিভা আর তড়িৎ শুইল। অমিয়া ক্ষুদ্র ননদিনীকে লইয়া একটি বেঞ্চে শুইল। কারণ গৃহিণীর আয়তনেই একটি বিছানা এমন ভরিয়া ওঠে যে, তাহাতে একটি কুটাও আর ধরানো দুঃসাধ্য। বাকি রহিল কৃষ্ণা। তাহাকে উপরের বার্থে উঠিয়া শুইতে হইবে। এ ছাড়া আর স্থান নাই।

গৃহিণী বলিলেন, "দেখ মা, উঠতে পারবে ত? প'ড়ে-ট'ড়ে ত যাবে না? তড়িৎটা একবার প'ড়ে গিয়ে যা কাণ্ড করল! যদি অসুবিধা হয়, না-হয় নীচেই শোও খুকীকে নিয়ে। বড় বৌমা এদের সঙ্গেই শোবে এখন ঠেশাঠেশি ক'রে।"

কৃষ্ণা জন্মে কখনও কাহারও সঙ্গে শোয় নাই, একান্ত শিশু-বয়সেও সে স্বতন্ত্র একটা লোহার খাটে শুইয়া থাকিত। মাতৃবক্ষের মধুর উত্তাপের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার সৌভাগ্য তাহার কোনো দিন হয় নাই। সুতরাং এখন খুকীকে সঙ্গে লইয়া শোওয়ার প্রস্তাব তাহার কাছে মোটেই লোভনীয় বোধ হইল না। তাছাড়া, এ মেয়েটির ঘুমের ঘোরে 'উইণ্ড্ মিল্'-এর মতো হাত-পা ঘুরানোটা তাহার কাছে খুবই ভীতিজনক বোধ হইতেছিল। কাজেই সে বলিল, "ট্রেনে উপরের বিছানায় শোওয়া আমার খুবই অভ্যাস আছে, কোনো অসুবিধা হবে না।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ নীরব হইয়া গেল। বাকি রহিল কেবল সাগরের কলগান আর জাহাজের বিরাট্ হৃৎস্পন্দন। কৃষ্ণা কিছুক্ষণ মাসিক-পত্রিকা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্তরাত্রি তাহার স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাটিয়া গেল। জলধিজননীর বিশাল বক্ষে, তাহার মৃদু মৃদু দোলানিতে, আর ঘুম-পাড়ানিয়া গানে এই মানব-সন্তানগুলি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

ভোর হইতেই কেবিনের দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হইল। তড়িৎ উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

বিপিন বাহির হইতে বলিল, "আমি রে আমি। বৌঠানরা উঠেছে নাকি? ডেকে যাবে বেড়াতে? এখনও লোকজন ওঠেনি, বেশ নিশ্চিন্তে বেড়াতে পার্‌বি। সমুদ্রে সূর্য্য ওঠা বোধহয় তোরা একবারও দেখিস্‌ নি? চল্‌ না, একটু দে'খে আস্‌বি।"

বধূরাও দেবরদের কণ্ঠস্বরে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কৃষ্ণারও ঘুম ভাঙিয়া গেল। কেবল নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে লাগিলেন গৃহিণী আর তাঁহার ছোট মেয়ে খুকী। প্রতিভা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "অতবার এলাম গেলাম, ঠাকুরপোর এত দরদ ত কোনোবারে দেখিনি?"

কৃষ্ণা মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "বয়সে ছোট হ'লেও, তুমিই দেখছি চালাক বেশী।"

তখনও সকালের চা খাইতে দেরি ছিল। কাজেই গৃহিণীকে জাগাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িল। এখন আর কেহ রেশমী জামা, বেনরসী শাড়ী পরার ঘটা করিল না। কোনোমতে একটা শাড়ী পরিয়া পাদুটা জুতা-জোড়ার মধ্যে গলাইয়া ডেকে যাইতে প্রস্তুত হইল।

এভাবে বাহির হওয়া কৃষ্ণার কুষ্ঠিতে লেখে না। সে কেবিনের ভিতরেই থাকিয়া গেল দেখিয়া বিপিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাবেন না?"

কৃষ্ণা বলিল, "আমার অল্প একটু দেরি হবে। আপনারা যান, আমি পরে যাব।"

বিপিন বলিল, "আচ্ছা, আমি বৌঠানদের ওপরে নবীনের জিম্মায় রেখে আস্‌ছি। ষ্টীমারের লোকজনেরা মাঝেমাঝে অভদ্র ব্যবহার করে, একলা যাওয়া-আসা করা ঠিক নয়।"

অমিয়া-প্রতিভার দল চলিয়া গেল। কৃষ্ণা চুল বাঁধিয়া, মুখ ধুইয়া, শাড়ী ব্লাউজ সব বদ্‌লাইয়া পরিল। গৃহিণীর দেবরপুত্রটি যে তাহার প্রতি

খানিকটা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। ইহাতে নারী হিসাবে তাহার বিজয়গর্ব্ব অনুভব করিবার অধিকার থাকিলেও, সে বড় বেশী খুসী হইল না। ইহারা হিন্দু, সে অন্ততঃ নামে খ্রীষ্টান। ইহারা প্রভু, সে বেতনভোগী। কাজেই এ ধরণের কোনো কথা না ওঠাই ভাল। কাজ আরম্ভ করিবার গোড়ায়ই যদি কোনো কারণে ইহাদের মন তাহার প্রতি বিরূপ হয় তাহা হইলে কৃষ্ণার পক্ষে বড়ই বিপদ্ ঘটিবে। সে স্থির করিল বিপিনকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে।

ইতিমধ্যে বিপিন আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। একাকী তাহার সঙ্গে যাইবে না ঠিক করিয়া কৃষ্ণা খুকীকেই টানিয়া লইয়া চলিল। খুকী ইহাতে বিশেষ খুসী হইল না। তবে কৃষ্ণা নূতন মানুষ, কাজেই সে ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

১৬

ডেকের উপরের জগৎটি তখন সুপ্তিমগ্ন। দু-চারিটি খালাসী এধার-ওধার যাওয়া-আসা করিতেছে, দুই-একটি হিন্দুস্থানী উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিতেছে। ডেকের একটা কোণে যাত্রীর ভিড় কিছু কম, কারণ, সেখানটা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য রক্ষিত ডেকে যাইবার পথ। অমিয়া, প্রতিভা আর তড়িৎ সেখানে একটা বেঞ্চ টানিয়া লইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। কৃষ্ণাকে দেখিয়া তড়িৎ চীৎকার করিয়া বলিল, "কৃষ্ণাদি, এদিকে আসুন।"

কৃষ্ণা খুকীর হাত ধরিয়া সন্তর্পণে ঘুমন্ত যাত্রীর দল এবং তাহাদের পোট্‌লা-পুঁটুলী বাঁচাইয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "খুকীকে নিয়ে এলেন যে? ওর ত সকালে উঠে নিয়মিত

এক ঘণ্টা চেঁচানো ঠিক আছে। মা ছাড়া সকালে ওর কাছে কেউ ঘেঁসে না!"

খুকী এতক্ষণ কৃষ্ণার ভয়েই বোধহয় চুপ করিয়া ছিল। তাহার আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্যে ভয়টা অনেকটাই কাটিয়া যাওয়াতে হঠাৎ সে "ওঁ মা-আ-আ" করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ঘুমের দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। এ-হেন কীর্ত্তির যশ অর্জ্জন করিতে বিপিনের বোধহয় একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। সে খুকীর হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা টান দিয়া বলিল, "চল্ শীগগির নীচে, লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে। তোর নাম যে কেন শান্তি হয়েছিল তা জানি না, এমন মূর্ত্তিমতী অশান্তি জীবনে আর আমি কখনো দেখিনি। জ্যাঠাইমার নাম নির্ব্বাচনের আমি মোটেই প্রশংসা করি না। এটার নাম শান্তি, আর তোর নাম কি না তড়িৎ। তড়িৎ না হয়ে কাদম্বিনী হ'লে তোর চেহারার সঙ্গে বেশী মিল থাকৃত।"

তড়িৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "নামের সঙ্গে সর্ব্বদাই বুঝি চেহারার মিল থাকে? তোমার নাম যে বিপিন, তোমার গা-ময় কি গাছ আর ঝোপ আছে? কৃষ্ণাদি যে মেমের মত ফরসা, তাঁর নাম কৃষ্ণা হ'ল কেন?"

বিপিন অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "তোরা দুজনের নাম অদলবদল ক'রে নিলে ভালো হয়। যাই, এই পেত্নীটাকে নীচে দিয়ে আসি।" সে খুকীকে টানিয়া লইয়া গেল।

প্রতিভা তাহার মন্তব্য শুনিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এত হাসির কথা কি মনে পড়ল?"

প্রতিভা বলিল, "ঠাকুরপোর যা কথা! ব'লে গেল আপনাকে আর তড়িৎকে নাম অদল-বদল করতে।"

কৃষ্ণা একটু হাসিয়া চুপ করিয়া গেল। এ ছেলেটি এত চট্ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া তাহার বিপদ্ না ঘটায়। কিন্তু তাহার তরুণ মন এই অতি স্পষ্ট পুজা-নিবেদনে একটু যে বিচলিত না হইল তাহাও নয়। এতকাল

যদিও সে অন্তঃপুরচারিণী হইয়া কাটায় নাই, তবুও পুরুষজাতির সহিত তাহার সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। বোর্ডিংএই তাহার দিন কাটিয়াছে। সেখানে পুরুষের মধ্যে প্রফেসার, হেডমাষ্টার, ছাত্রীদের অভিভাবক, না-হয় ইন্‌স্পেক্টার। তাহারা কাহারও রূপের বা গুণের ভক্ত হইবার জীবই নয়। পড়ানো এবং পড়ানোর ভুল ধরা পর্য্যন্ত তাহাদের গতি। সুতরাং তাহার মনের একটা দিক্ উপবাসীই থাকিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ অজানা হইতে একদিনের মধ্যে এই যুবকটি তাহার মনোমন্দিরের দ্বারে ভক্ত পূজারীর বেশে দেখা দিল।

এধার-ওধার বেড়াইতে বেড়াইতে অমিয়া হঠাৎ বলিল, "কাল 'বয়'টা খুব হাসিয়েছে যা-হোক।"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, আমাকে হঠাৎ সে বাবু মনে কর্‌ল কি ক'রে জানি না। এ পর্য্যন্ত আমাকে ত কেউ পুরুষ ব'লে ভুল করেনি।"

প্রতিভা বলিল, "আহা, তা মোটেই নয়। আপনি মেম নন, অথচ ঠিক সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতোও নন। কাজেই বেচারা আপনাকে কি বলবে ঠিক করতে পারেনি। 'মা' বল্‌লে আপনাকে ঠিক মানাবে না মনে ক'রে 'বাবু' বলেছে।"

ডেকে এখন ক্রমে কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছিল। হিন্দুস্থানীরা চীৎকার করিয়া বেসুরা ভজন গাহিতে গাহিতে 'লোটা' মাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকযাত্রীরা উঠিয়া বসিয়া বাচ্চাকাচ্চা, পোঁটলা প্রভৃতি গুণিয়া-গাঁথিয়া মিলাইয়া দেখিতেছিল সব ঠিক ঠিক আছে কি না। পূর্ব্বদিগন্ত রঙের প্লাবনে রঞ্জিত হইয়া দিবাকরের আগমন সূচনা করিতেছিল।

বাঙালীর মেয়েও ডেকে দুই-তিনটি যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্কুচিত ম্রিয়মাণ চেহারার দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণা বলিল, "আমায় যদি ডেকে যেতে হ'ত, তাহ'লে প্রথম দিনই বোধহয় আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম।"

তড়িৎ কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া বলিল, "কেন কৃষ্ণাদি?"

জলে ঝাঁপ দিবার কারণ এই বালিকাকে বিশদ-ভাবে বোঝানো কষ্টকর হইত, কাজেই কৃষ্ণা বলিল, "এত লোকের মাঝে যেতে কষ্ট হয় না খুব ?"

হিন্দুস্থানীদের ভজন এতক্ষণ একটানা চলিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের সুরের জালের উপর, বন্ধ হারমোনিয়মের তীব্র চীৎকার শাণিত খড়্গের মত আসিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে মিহি নাকি সুরে গান আরম্ভ হইয়া গেল, "পরাণে না জাগে যদি আকুল পিয়াসা, পায়ে ধরি ভালোবেসো না।"

ডেক-সুদ্ধ ছত্রিশ জাতের মানুষের চোখ এক মুহূর্ত্তে একটা বিশেষ জায়গায় গিয়া পড়িল। দেখা গেল, এক কোণে একটা আধা-ময়লা মশারি টাঙানো। তাহারই ভিতর হইতে এই রাগিণীর উৎপত্তি। কণ্ঠটি যে রমণীর এবং তিনি যে বঙ্গরমণী সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ ছিল না। কৃষ্ণা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ছি, ছি, এ কি কাণ্ড! এদের কি আক্কেল ব'লে জিনিষ নেই ?"

প্রতিভা বলিল, "এদিকে আবার মশারি টাঙানো হয়েছে। একেই বলে, ঘোম্‌টার ভিতর খ্যাম্‌টা নাচ।"

বিপিন ঠিক এই সময় ডেকে আসিয়া জুটিল। তড়িৎ বলিল, "বিপিনদা, দেখেছ কাণ্ড।"

বিপিন চটিয়া বলিল, "বাঙালী না হ'লে আর এত বড় গাধা কোন্ জাতে মিলবে ? দাঁড়াও আমি গান গাওয়াচ্ছি।"

মশারির বাহিরে বসিয়া একটি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক বিজয়গর্ব্বে চারিদিকে তাকাইতেছিল। বিপিন তাহার কাছে গিয়া বলিল, "মশাই, এটা কি রকম হচ্ছে ?"

লোকটি একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে মশায় ? আমি স্ত্রী-স্বাধীনতার খুব পক্ষপাতী।"

বিপিন বলিল, "তা হোন্, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ কেলে মশারিটা তাহ'লে খুলে ফেলুন। মশারির ভিতর থেকে গান গাইয়ে স্ত্রীর

কোনো মর্য্যাদার বৃদ্ধি হবে না, মাঝ থেকে ডেক-সুদ্ধ লোক এই দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে আর হাসি-তামাসা করবে।"

যুবকটি কিছু অপ্রস্তুতভাবে মশারির ভিতর ঢুকিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হারমোনিয়মের শব্দ ও গান বন্ধ হইয়া গেল। কৃষ্ণা বলিল, "বাঁচা গেল বাবা, আচ্ছা গানই সুরু করেছিল।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আপনি গান করতে পারেন?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "পারি কিছু কিছু। তবে আজীবন ফিরিঙ্গি স্কুলে প'ড়ে বাংলা গান বেশী শিখবার সুবিধা পাইনি।"

তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদের কি ইংরিজী গান শেখাবেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "তার দরকার হবে না। কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারব, তারপর শিখে নিলেই হবে।"

প্রতিভা বলিল, "শিখবেন কার কাছে? মানুষ থাকলে ত? ওখানে গিয়ে রবিবাবুর গানের এমন চমৎকার সুর শুনবেন যে, আপনার পিলে চমকে যাবে। কল্‌কাতায় গান করতে বললে, আমি পারতপক্ষে কখনও গাই না, জানি যে সুর ভুল হবে আর সবাই হাসবে।"

এমন সময় বিপিন তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল, "এখনি ঝাঁটা হাতে খালাসীদের আবির্ভাব হবে ডেক ধুতে। তার আগে স'রে পড়া ভালো।"

যাত্রীর দলও ব্যস্ত ভাবে জিনিষপত্র উঠাইতেছিল। বিছানা প্রভৃতি যাহাতে জলের ছিটায় ভিজিয়া না যায় এজন্য সেগুলি বাক্সের উপর উঠাইয়া রাখিতেছিল। কৃষ্ণারা সদলবলে নীচে নামিয়া চলিল। যাইবার সময় কৃষ্ণা দেখিল, মশারি উঠাইয়া সেই সঙ্গীতকারিণী স্বাধীনা বঙ্গললনাটি তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছে। তাহার আর কিছু না থাক, চোখে একজোড়া চশমা আছে দেখিয়া কৃষ্ণা ভাবিল, 'যাহোক, উন্নতিশীলতার একটা লক্ষণ অন্ততঃ আছে।'

নীচে নামিয়া দেখিল, গৃহিণী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম আহারের জোগাড়ে ব্যস্ত। আর কেহ হাতের কাছে না থাকাতে খুকীর উপরই তাঁহার সব মনটা গিয়া

পড়িয়াছে। সেও তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়, মা যত খাওয়াইতেছেন, সে ততই খাইয়া চলিয়াছে।

ঠিক আগের দিনেরই ছন্দানুসরণ করিয়া দিনটা কাটিয়া চলিল, মাঝে একটুখানি ব্যতিক্রম একবার দেখা দিল। স্নানের সময় হঠাৎ ঘোররবে একটা ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। জাহাজের খালাসী, কর্ম্মচারী, 'বয়', প্রভৃতির ভিতর মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'লাইফ বেল্ট্' পরিয়া সব চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে সুরু করিল। গৃহিণী যদিও অনেকবার ব্রহ্মদেশ যাতায়াত করিয়াছেন, তবু এ ব্যাপারটা তাঁহার দেখা ছিল না। তিনি ভীত হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? জাহাজ টাহাজ ডুবছে নাকি? এমন ত কখনও দেখিনি।"

কেহ কিছু বলিবার আগে তাহাদের কেবিনের 'বয়' ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বার হও গো, শীগ্গির বার হও। কেবিনের দরজায় তালা দিতে হবে।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হয়েছে কি?"

'বয়' বলিল, "শুনছ না, পাগলা ঘণ্টা দিয়েছে। সবাইকে বাইরে দাঁড়াতে হবে। শীগ্গির বার হও।"

অগত্যা সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীরা সবাই যে বাহিরে আসিবার উপযুক্ত বেশে ছিল, তাহা নয়। দুই-চারিজন বালকবালিকা ত্রস্ত মুখে, প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও অপ্রস্তুতে পড়িবার কারণের অভাব ঘটিল না।

অমিয়া ফিশ্ ফিশ্ করিয়া কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে কৃষ্ণাদি?"

কৃষ্ণা বলিল, "কোনো-রকম একটা alarm bell, কি ঠিক বুঝলাম না।"

ইতিমধ্যে ব্যাপারটা অকস্মাৎ কখন চুকিয়া গেল। দেখা গেল, কর্ম্মচারীরা লাইফ্ বেল্ট্ খুলিয়া ফেলিয়া যে-যার ঘরে ফিরিতেছে। 'বয়'ও আসিয়া চট্‌পট্ সব কেবিনগুলার তালা খুলিয়া দিতেছে।

এমন সময় নবীন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া জুটিল। বলিল, "কি জ্যাঠাইমা, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছ নাকি? কি রে খুকী, এমন অভদ্র অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিস কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "মা দুর্গা এ-যাত্রা খুব রক্ষা করেছেন বাবা। কি হয়েছিল?"

নবীন বলিল "মা দুর্গাকে তলব করবার মতো কিছুই ঘটেনি। হঠাৎ কোনো বিপদ্ ঘটলে, জাহাজ-ডুবি হ'লে কি আগুন লাগলে, কি করতে হবে সেটা পাছে খালাসীরা ভুলে যায়, সেইজন্যে মাঝেমাঝে ঘণ্টা দিয়ে তাদের একটু দৌড় করায়। যাও এখন ঘরের ভেতর যাও।"

যাত্রীর দল যে-যার স্থানে ফিরিয়া গেল। প্রতিভা বলিল, "বাপ রে বাপ! আমার বুকের ভিতরটা এখনও ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা ক'রে আজকের দিনটা কেটে গেলে বাঁচি। কাল ত নেমে যাব। ডাঙার জীব জলের ওপর চব্বিশ ঘণ্টাই একটা অসোয়াস্তিতে আছি।"

খাওয়া-দাওয়া যথানিয়মে হইয়া গেল, দুপুরটা ঘুমাইয়া বই পড়িয়া কৃষ্ণা কোনোমতে কাটাইয়া দিল। বৌ-দুটি শাশুড়ী ঘুমাইতেছেন দেখিয়া এক-জোড়া তাস বাহির করিয়া এক পত্তন খেলিয়া লইল।

বিকালে আবার সাজগোজ করিয়া ডেকে ঘুরিতে যাইতে হইল। সমুদ্রের কালো জলের নৃত্য বেশীক্ষণ দেখিতে ভালো লাগিল না বলিয়া কৃষ্ণা খানিক পরেই নামিয়া গেল। বিপিন তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া গেল। কেবিনের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত শীগ্গির চ'লে এলেন যে?"

কৃষ্ণা বলিল, "অত হাওয়ার ঝাপটা ভালো লাগছে না।"

বিপিন ফিরিয়া ডেকের উপর চলিয়া গেল। কৃষ্ণা আবার বই লইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটু উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে দেখা গেল। দুই দিন কেবল জল দেখিয়া দেখিয়া ইহাদের প্রাণ বোধহয় হাঁফাইয়া

উঠিয়াছিল, এখন ডাঙা দেখিবার প্রত্যাশাতেই তাহাদের দেহ-মনের জড়তা কাটিয়া গেল। এখনও তীরভূমি বহু দূর, তবু তাহারা মানসচক্ষে শ্যামলা ধরণীর সবুজ অঞ্চলের আভাস দেখিতে লাগিল। পোঁটলাপুঁটলি বাঁধা, জিনিস-পত্র গুছানোর মহা ধুম লাগিয়া গেল।

কৃষ্ণাদের কেবিনেও চারদিকে ছড়ানো জিনিষের রাশ একত্রিত হইতে লাগিল। সব গুছাইয়া এর পর বাক্স প্যাঁটরায় ভরিতে হইবে। গৃহিণী বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া আজ সকাল সকাল চুকোতে হবে, তারপর বাসন-কোসনের কাঁড়ি আছে। ধুয়ে মুছে তুলতে হবে। বৌমা, এ-সব জাহাজে পরা কাপড়-চোপড় আলাদা রাখ, রেঙ্গুনে নেমে সব ধোপার বাড়ী দিতে হবে।"

কৃষ্ণা ঘুলঘুলি দিয়া বাহিরে চাহিয়া আছে দেখিয়া তড়িৎ বলিল, "জলের রং কেমন বদলে গিয়েছে দেখেছেন? কেমন সবজে, শ্যাওলা-গোলা রং! আমরা এখন Gulf of Martabanএ এসেছি কিনা।"

কৃষ্ণার ছেলেবেলায় পড়া ভূগোল মনে পড়িল, Gulf of Martaban তখন প্রাণপণে মুখস্থ করিয়াছে, সেটা সাপ না ব্যাঙ তাহা জানিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। আজ তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিল, জিনিষপত্র সব গুছানো হইয়া গেল, এখন জাহাজ কূলে ভিড়িলেই হয়। 'বয়' 'টোপাজ' প্রভৃতি সব বখ্‌শিশ আদায় করিতে আসিয়া জুটিল। কাহাকে কি দিতে হইবে তাহা গৃহিণীর নখদর্পণে ছিল, তিনি সেই-মতো সকলের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে জাহাজ সমুদ্র ছাড়িয়া ইরাবতী নদীতে আসিয়া পড়িল। ক্রমে ব্রহ্মদেশের রাজধানী চোখের সীমানায় ধরা দিল।

প্রতিভা বলিল, "কৃষ্ণাদি, ঐ দেখুন, বড় প্যাগোডা। ঐ গাছগুলোর উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।"

কৃষ্ণা তাকাইয়া দেখিল, সোনালী রঙের চূড়াটা গাছের সারের উপর ঝক্ ঝক্ করিয়া জলিতেছে, শ্যামাঙ্গ নৃপতির মাথার মুকুটের মত। এই

সোয়ে ডাগন প্যাগোডা! ইহার নামও সে কম শোনে নাই। কিন্তু কল্পনায় তাহাকে সে যত সুবিপুল, মহিমাময় ভাবিয়াছিল, এ যেন তেমন নয়।

সে বলিল, "এই নাকি? আমি ভেবেছিলাম, এর চেয়ে বড় হবে।"

অমিয়া বলিল, "কাছ থেকে দেখতে ঢের ভালো লাগবে। দূর থেকে ছোটই দেখায় বটে।"

রেঙ্গুনের বন্দর আসিয়া পড়িল। তাহার কদর্য্য, পঙ্কিল চেহারা দেখিয়া কৃষ্ণার মনের ভিতরটা যেন মুষড়াইয়া গেল। এই নাকি বিলাসের লীলাভূমি, রঙীন ব্রহ্মদেশের প্রবেশদ্বার? ভাঙা কাঠের ঘর, টিনের ছাউনির সার, সরু লম্বামুখো 'শাম্পান' নৌকা, আর তার ময়লা কাপড় পরা চট্টগ্রামবাসী মাঝি, এই কেবল চোখে পড়ে! আশেপাশের ঘরগুলির স্থাপত্য অভিনব, এইটুকুই যা। জলের রং কাদামাখা ঘোলা, ইহার পঙ্কিল আবিলতার নীচে কত নাজানি বিভীষিকা লুকানো আছে। সমুদ্রের উজ্জ্বল লাবণ্যের তুলনায় ইহা কি কুৎসিত!

তারপর লাগিয়া গেল ডাঙায় নামার হুড়াহুড়ি। খালাসীর হাঁক, কুলির চীৎকার, যাত্রীদের কোলাহলে কানে তালা লাগিবার জোগাড় হইল।

হুড়্ হুড়্ করিয়া জাহাজ আসিয়া জেটিতে ভিড়িয়া গেল। তুমুল শব্দে জাহাজের সিঁড়ি নামিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ডাঙার কুলির দল এক দৌড়ে উপরে আসিয়া পৌছিল। তারপর যাত্রীদের মোট-ঘাট লইয়া মারামারি কাড়াকাড়ি। কুলির দল মান্দ্রাজী, তাহাদের ভাষার এক অক্ষরও কৃষ্ণার বোধগম্য হইল না। বিপিন, নবীন, চাকর-বাকর সব আসিয়া জুটিল এবং মারামারি ধাক্কাধাক্কি করিয়া কুলির হাত হইতে জিনিষ-পত্র রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। আধঘণ্টা-খানেক যেন ঝড় বহিয়া গেল, তারপর আস্তে আস্তে সচল এবং অচল মাল কোনপ্রকারে গুছাইয়া লইয়া সকলে ডাঙায় নামিয়া পড়িল।

তারপর গাড়ী ঠিক করা, কে কোন্ গাড়ী চড়িবে, কোন্ জিনিষ গাড়ীর ছাদে যাইবে, কোন্‌টাই বা ঠেলা গাড়ীতে যাইবে, ইহা নিরূপণ করিতে

আরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। বিপিন শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "জ্যাঠাইমা, মোটরটা এসে রয়েছে, আর একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে দিচ্ছি, তুমি তোমার ছানা-পোনা আর বৌ নিয়ে বিদায় হও। পোঁটলা-পুঁটলি, চাকর-বাকর নিয়ে আমরা পিছনে পিছনে আসছি।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "তা আর নয়? অর্দ্ধেকগুলো জিনিষ এইখানেই ফে'লে রেখে যাবে ত?"

বিপিন বলিল, "তবে তুমি থাক এখানে, নবনের সঙ্গে, জিনিষ তদারক কর। আমি ওদের পৌঁছে দিয়ে আসি। যত রাজ্যের ভূত-বাঁদরের ভিড়ের মধ্যে কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে?"

বাস্তবিকই মেয়েদের অসুবিধা হইতেছিল। গৃহিণী সম্মতি দিলেন কিনা তাহা ভাল করিয়া খোঁজ না করিয়াই বিপিন তাহাদের টানাটানি, ঠেলাঠেলি করিয়া ভিড়ের বাহিরে আনিয়া ফেলিল। বাড়ীর মোটর একটা ছিল, ট্যাক্সিও একটা শীঘ্রই জোগাড় হইয়া গেল। অমিয়া, প্রতিভা, কৃষ্ণা আর খুকী ঘরের গাড়ীতে উঠিল, বাকি আণ্ডা-বাচ্চার দল এবং তড়িৎকে লইয়া ট্যাক্সি হাঁকাইয়া বিপিন বাহির হইয়া পড়িল।

জেটি হইতে ইহাদের বাড়ী বেশী দূর নয়। মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গেল। বাড়ীখানির নীচের তলায় সবই দোকান মনে হইল। প্রতিভা বলিল, "নীচটা এখন আমাদের কোনো কাজে লাগে না ব'লে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোতলায় আর ভাড়াটে টাড়াটে নেই, আমরাই আছি।"

সকলে নামিয়া পড়িয়া উপরে চলিল। ঘরগুলি সব আধা-পার্টিশন করা, দেশের বাড়ীর মত পুরা দেওয়াল নয়।

সাম্‌নের ঘরখানা বোধ হয় বসিবার। ঢুকিয়া প্রতিভা ধপ্‌ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঁচলাম বাবা! এখনও মনে হচ্ছে জাহাজে আছি। ঘরখানা যেন দুল্‌ছে।"

১৭

পূজার ছুটির আর বেশী দেরি নাই। যাহারা কলিকাতাতেই থাকিবে তাহারা মহোৎসাহে নূতন কাপড়-জামা করাইতেছে, কিনিতেছে, ছুটির কোন্ দিন কোথায় কেমনভাবে কাটাইবে তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। যাহারা কাজের দায়ে এখানে বাস করে, তাহাদের মন পড়িয়া আছে দেশে, আত্মীয়স্বজনের কাছে। তাহারাও জিনিষপত্র কিনিতেছে আর দিন গণিতেছে।

ভানুমতীদের দেশের বাড়ীতে এখনও জ্ঞাতিগোষ্ঠী যাহারা বাস করে, তাহারা কোনো গতিকে নমোনমো করিয়া পূজাটা সারিয়া লয়। ইহার জন্য জমিদারী হইতে খরচ বরাদ্দ করা আছে। অস্বাস্থ্যের জন্য ভানুমতী বহুদিন দেশে যান নাই। সুবীরের পূজা সম্বন্ধে কোনোই উৎসাহ নাই, সুতরাং সেও প্রয়োজন বোধ করে নাই। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে দেশের বাড়ীতে সে মাঝে মাঝে গিয়াছে, কিন্তু সেখানের স্মৃতি তাহার কাছে বিশেষ-কিছু লোভনীয় নয়। কলেজে ঢুকিবার পর সে আর যায় নাই। বৃদ্ধ দেওয়ান জমিদারী চালাইতেন, এবং জমিদারের সহি লইবার জন্য ও তাঁহাকে আবশ্যকমতো টাকা জোগাইবার জন্য বছরে বারকয়েক কলিকাতা ঘুরিয়া যাইতেন।

তবু বনিয়াদী হিন্দুবংশ, পূজার সময় একটু সাড়া না পড়িয়াই যায় না। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ লোকজনকে নূতন কাপড় ত দিতে হইবে? আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে, সকলকেই ভানুমতী পূজার সময় কাপড় দিতেন। শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতে তিনি মাঝে মাঝে যে হাতখরচ পাইতেন, পুত্রের রাজত্বে তাহা ত তাঁহার আছেই, উপরন্তু বিপুল সম্পত্তি হইতে যে আয় হয়, সবই তাঁহার হাতে। বিধবা মানুষ তিনি, কি আর খরচ করিবেন? বৎসরে একবার এই সময় তিনি বেশ-কিছু সখ মিটাইয়া খরচ করেন।

আজ বাড়ীতে কাপড়ওয়ালী আসিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া ভানুমতী কাপড় বাছিতেছেন। ভবানী দেওয়ালে ঠেশ দিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। মাধবী, তুলসী, প্রভৃতি অন্য দাসীর দল আশেপাশে দাঁড়াইয়া কাপড়ের এবং কর্ত্রীর পছন্দের তারিফ করিতেছে।

ভানুমতী ঢাকাই ধুতি বাছিতেছেন। আগে আগে তিনি সুবীরের জন্য পূজার সময় বেনারসী ধুতি-চাদর রাখিতেন, কিন্তু হাজার কান্নাকাটি করিলেও ছেলে রেশমী কাপড় পরিতে রাজী হইত না বলিয়া এখন তিনি ঢাকাই ধুতি-চাদরই দেন, পাঞ্জাবীটা কেবল গরদ কি মুগার করান।

অনেক বাছাবাছির পর ছেলের কাপড় পছন্দ হইল। তারপর শোভাবতীর ছেলেদের, তাঁহার আর এক দিদির ছেলেদের, এবং শ্বশুর-বাড়ীর দিকে পুত্রস্থানীয় যাহারা ছিল সকলের ধুতিচাদর বাছা হইয়া গেল। ইহার পর মেয়েদের পালা। কাপড়ওয়ালী এবার রঙের বাজার খুলিয়া বসিল। এ কাপড়ওয়ালীটি এ বাড়ীতে এই প্রথম আসিয়াছে, এতকাল যে কাপড় দিত, সে বুড়ী এবার পীড়িত থাকায়, ইহাকে বদলি দিয়াছে। জমিদারবাড়ী কাপড় দিতে হইবে শুনিয়া সে আর কম দামী শাড়ী একখানাও আনে নাই, দেড়শ, একশ, আশী টাকার শাড়ীতেই পুঁটলি ভরিয়া আসিয়াছে।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "এত দামের কাপড় সব দাম দিয়ে কিনেছ নাকি বাছা? কম হ'লেও ত এর ভেতর দেড়-হাজার দু-হাজার টাকার কাপড়।"

কাপড়ওয়ালী বিনীত হাসি হাসিয়া বলিল, "না, দিদি, এত টাকার কাপড় কি আর আমরা দাম দিয়ে কিন্‌তে পারি? চেনা দোকানদারের কাছে নিই, বিক্রী কর্‌তে পার্‌লে তারা আমাদের কিছু ধ'রে দেয়। এ কি আর হাব্‌ড়া হাটের কাপড়? সে না-হয় পঞ্চাশটা টাকা খরচ কর্‌লেই এক পুঁটলি পাওয়া যায়। আগে আগে তাই কর্‌তুম। মাঝে মায়ের অনুগ্রহ হয়ে কত দিন প'ড়ে রইলুম, ঘরে যা কাপড় ছিল, ম্যুনিশিপালের

লোকেরা এসে ওষুধজল দিয়ে ধুয়ে সব নষ্ট ক'রে দিলে। সে কাপড় কি আর ভালো দামে বিক্রী হ'ল? দশ-টাকার কাপড় সব দু-টাকায় দেড়-টাকায় ছেড়ে দিলুম। সেই থেকে আর গুছিয়ে উঠতে পারিনি। এখন পরের কাপড় বিক্রী ক'রেই যা দুচার টাকা পাই।"

ভানুমতী তাহার বক্তৃতায় কর্ণপাত না করিয়া এতক্ষণ শাড়ীর বোঝা ঘাঁটিতেছিলেন। প্রতিটি শাড়ীর গায়েই মূল্যের টিকিট আঁটা। কাপড়-ওয়ালীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া হঠাৎ তিনি বলিলেন, "এত দামী কাপড়ে ত আমার দরকার নেই বাছা, কাল কিছু কম দামের কাপড় এনো, এই বিশ-পঁচিশ টাকার কয়েকখানা রাখব।"

কাপড়ওয়ালী বলিল, "একখানাও রাখবেন না, মা? এ-সব কাপড় ত আপনাদের বাড়ীতে বিকোবার জন্যেই। এ কি আর কেরাণী-বাড়ীতে বিকোবে? কাল আমি অন্য কাপড় আন্‌ব এখন, কিন্তু আজ একখানা অন্ততঃ রাখুন। তা না হলে দোকানদার মুখপোড়ার কাছে আমার মান থাকবে না।"

ভানুমতী বলিলেন, "কার জন্যে রাখব বাছা? আমার ঘরে কি মেয়ে-বৌ আছে? থাকলে একখানা কেন, দশখানা রাখতুম।"

ভবানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। কোন এক নবজাত শিশুর পরমসুন্দর মুখ এতকাল পরে তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর কেমন যেন করিতে লাগিল। হায়, কালের স্রোতে সেই অস্ফুট কুসুমকোরককে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, নহিলে আজ তাহার সৌন্দর্য্য সৌরভে দিক্ আলোকিত আমোদিত হইয়া থাকিত।

কাপড়ওয়ালী কিছুতেই ছাড়ে না। ভানুমতী অগত্যা একখানা সত্তর টাকা দামের চাঁপাফুলের রঙের শাড়ী বাছিয়া লইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এইখানা রাখলুম। বড়দির নূতন বৌকে দেওয়া যাবে। এর পরের বছর ভগবান যদি দয়া করেন ত ঘরের বৌয়ের জন্যেই কাপড় রাখব। তখন কত দামের শাড়ী আন্‌তে পার এনো বাছা।"

কাপড়ওয়ালী শাড়ীগুলি গুছাইয়া বাঁধিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড় টানিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তবে কোন্ সময় আস্‌ব, মা?"

ভানুমতী বলিলেন, "সকালেই এসো। দুপুরে আমি আবার বেরিয়ে যাব।"

মাধবী বলিল, "কাল বেরোবেন নাকি, মা? কোথায় যাবেন, গঙ্গা নাইতে?"

ভানুমতী বলিলেন, "না, কাল একবার মেজদির বাড়ী যাব। ভালো কথা, কাল কতকগুলো হাবড়া হাটের শাড়ীও এনো, দাসীদেরও ত দিতে হবে?"

মাধবী, তুলসী, এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঢাকাই বেনারসীর বহর দেখিয়া তাহাদের ভয়ই হইতেছিল, গিন্নী বুঝি তাহাদের কাপড়ের কথা ভুলিয়াই গেলেন।

কাপড়ওয়ালী পুঁটলি লইয়া চলিয়া গেল। ভানুমতী বলিলেন, ভবানীকে ডেকে দে ত, তুলসী। আর মাধী, দে'খে আয় খোকা ফিরেছে নাকি।"

ঝিরা চলিয়া গেল। ভানুমতী কাপড়ের রাশ উঠাইয়া খাটের উপর রাখিয়া জান্‌লার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ভবানী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্‌ছ কেন গা?"

ভানুমতী বলিলেন, "কাপড়গুলো আলমারীতে তুলে রাখ্। দেখ্, কাল একবার মেজদির ওখানে হয়ে আসি, মিত্তিরদের সে মেয়েটার খোঁজ নিতে হবে। মেয়ে নাকি খুবই সুন্দর, ঘরও বড়, সম্বন্ধটা হাতছাড়া করতে চাই না।"

ভবানী বলিল, "তোমার ছেলে যে ছোট মেয়ে বিয়ে করবে না ব'লে পণ নিয়ে বসেছে! তুমি শুধু শুধু খোঁজ নিয়ে করবে কি? সে মেয়ের বয়স ত আর বাড়িয়ে দিতে পার্‌বে না?"

ভানুমতী বলিলেন, "সেদিন আমি ঢের কান্নাকাটি কর্‌লুম, তাতে খোকা বল্‌লে, ওরা মেয়েকে যদি আরও চার-পাঁচ বছর রাখে, আর স্কুলে পড়ায়,

তাহ'লে না-হয় সে রাজী হবে। দেখি ওদের কাছে কথাটা পেড়ে, রাজী হতেও পারে। নিজের ছেলে, বল্‌তে নেই, কিন্তু এমন সম্বন্ধ আর তাদের পেতে হচ্ছে না।"

ভবানী বলিল, "তা আর বল্‌তে!" সে কাপড়গুলি তুলিয়া লইয়া আল্‌মারীতে তুলিতে লাগিল। আল্‌মারীটি মেহগনি কাঠের, দুই ধারে আয়না লাগানো। ইহার ভিতর ভানুমতীর সধবা-জীবনের যত-কিছু সাজসজ্জার জিনিষ ঠাসা। খোলা আল্‌মারীর দিকে তাকাইয়া ভানুমতী বলিলেন, "বৌ এলে সব প'রে শেষ করতেই তার বিশ বছর কেটে যাবে, তারপর নূতন জিনিষ কিনবে। মাত্র একটা ছেলে, বৌ ত একটার বেশী দশটা আসবে না? মেয়েও যদি একটা থাকত! নিজের ত সাধ-আহ্লাদ সবই বাকি রইল, মেয়ে থাকলে তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে মিটিয়ে নিতে পারতুম। পরের মেয়ে বৌ, তার পছন্দ আবার কেমন হবে কে জানে?"

ভবানীর মুখ পাংশু হইয়া উঠিল। তাহার বিগত জীবনের নিদারুণ অপরাধ আজ কেবলই যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ভানুমতীর কন্যার সখ হইল শেষে? তবে সে আর বিধাতার বিধান উল্টাইতে গিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারি করিল কেন? কিন্তু সেদিন ত কন্যা-সন্তান কেহ চাহে নাই? এত বড় পরিবারের ক্ষুদ্রতম দীনতম ভৃত্য পর্য্যন্ত পুত্র-সন্তানের প্রত্যাশায় উৎসুক হইয়াছিল। তাহাদিগকে ঘৃণিত শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সকলেই সমস্ত প্রাণের আগ্রহ দিয়া শিশু-পুত্রকেই কি আহ্বান করে নাই?

সে শিশুকন্যাটি কি এখনও বাঁচিয়া আছে? কোথায় কেমনভাবে সে বর্দ্ধিত হইতেছে? কোনো উপায়ে তাহার খোঁজ কি পাওয়া যায় না? তাহার জন্মাধিকারের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে খানিকটা স্থানও কি তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না? ভবানীর দিন ত শেষ হইয়া আসিতেছে। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছু না করিয়াই কি তাহাকে জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে?

ধাত্রী মিসেস্ মিত্র বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত ভবানী তাঁহাকে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিত, ভানুমতীর কন্যাটির খোঁজখবরও মাঝে মাঝে পাইত। কিন্তু তিনি মারা যাইবার পর আর সে কোনো উপায়েই বালিকার সহিত যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। ধরা পড়িবার ভয়ে এই বিষয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করিতেও সে ভরসা পায় নাই। বিশাল বিশ্বজগতে এই বালিকা সঙ্গীহীন সহায়হীন হইয়া কোথায় কেমনভাবে যে দিন কাটাইতেছে, সে বাঁচিয়া আছে, না নাই, ভাবিতে গেলে তাহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত। উপায় খুঁজিয়া পাইলে সে বালিকাকে ফিরাইয়া আনিতে চায়। নিজের তাহার শাস্তি হয় হইবে। ক'টা দিনই বা তাহার আর বাকি আছে, যেমন ভাবে হউক কাটিয়াই যাইবে।

কালের প্রভাবে তাহার মনের প্রবল প্রতিহিংসাবৃত্তিও ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। আগে আগে উদয়ের নাম শুনিলেই সে ব্যাঘ্রীর মতো গর্জ্জিয়া উঠিত, পাইলে যেন নখে তাহার গলা ছিঁড়িয়া ফেলে। এখন আর বিদ্বেষের সে তীব্রতা তাহার মনে নাই। উদয় এখনও বাঁচিয়া আছে, যদিও বহুবৎসর সে আর ভবানীর চোখে পড়ে নাই। দেওয়ানজীর কাছে মাঝে মাঝে তাহার খবর পাওয়া যায়। নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সে এখন দায়ে পড়িয়া তপস্বী হইয়াছে! সুবীরের কাছেও মাঝে মাঝে অনেক হাহুতাশ ভরা চিঠি আসে। সে কখনও বা দুদশ টাকা পাঠায়, কখনও বা চিঠি না পড়িয়াই ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ফেলিয়া দেয়।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া ভানুমতী বলিলেন, "নে, নে, ওটা বন্ধ ক'রে ফেল্। খোকা এল কিনা, দেখ্ গিয়ে। তার সঙ্গে একটু পাকাপাকি কথা না ব'লে, আমি ত মিত্তিরদের কোনো কথা বলতে পারব না?"

ভবানী আল্মারী বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এসেছে, এই মাত্তর এল। জামা-জুতো ছেড়ে আসছে।"

ভানুমতী বলিলেন, "তার জলখাবার এই ঘরে দিতে বল্।"

সুবীর আসিয়া ঢুকিল। ভবানী জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল।

ভানুমতী বলিলেন, "ও রে, কাল ত মেজদির বাড়ী যাচ্ছি। পুজো এসে পড়ল, কথাটা একটু পাকাপাকি করতে চাই, এর পর ত কে কোথায় চ'লে যাবে। ওরা যদি মেয়েকে রাখতে রাজী হয়, তা'হলে তুই রাজী ত?"

সুবীর বলিল, "রাজী না হয়ে আর করি কি? তোমার নাকে-কান্না যে কিছুতেই থামে না। একটা বৌ ঘাড়ে চাপলে যদি তুমি খুসী হও, তবে তাই আন। কিন্তু অন্তত ম্যাট্রিক পাশ না করলে, আমি বিয়ে করব না। আর বয়সও ষোলো পার হওয়া চাই।"

ভানুমতী বলিলেন, "এই আবার এক নূতন ফ্যাশাদ বাধালি। কেন, পাশ না করলে কি হবে? ঘরে পড়লে কি চলে না? তোর বৌকে ত আর চাকরী ক'রে খেতে হবে না। আমিও ত ঘরে পড়েছিলাম, তোর বাবার কাছে, মন্দ ত শিখিনি? এখন না-হয় চর্চ্চা রাখি না ব'লে সব ভুলে গেছি।"

সুবীর বলিল, "হবে না কেন ঘরে পড়লে? কিন্তু বাঙালীর হালচাল আমার জানা আছে ত? মুখে বলবে পড়াচ্ছি; মেয়ে দেখতে গেলে শোনা যাবে, যে, তিনি বাংলা, ইংরেজী যত বই আছে সবই প'ড়ে ফেলেছেন। কিন্তু বাড়ী আসবার পর দেখা যাবে, তাঁর বিদ্যে কথামালা আর ফার্ষ্ট বুক পর্য্যন্ত। এক লাইন চিঠি লিখতে হ'লে তিনি বারোটা ভুল করবেন এবং তাঁর হাতের লেখার পাঠোদ্ধার করতে মিশরের পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাকতে হবে। ম্যাট্রিক পাশ করতে বললে আর ফাঁকি চলবে না।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা ধর্, তারা তোর কথায় মেয়েকে বড় ক'রে রাখল, স্কুলে পড়ালও, কিন্তু মেয়ে যদি পরীক্ষায় পাশ না করতে পারে?"

সুবীর বলিল, "যে কলকাতা ইয়ুনিভার্সিটির ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারবে না, এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি বিয়ে করব না। সব জিনিষের জগতে যোগ্যতা-অযোগ্যতার* বিচার আছে; কেবল যেটার উপর মানুষের

ভালোমন্দ সবচেয়ে নির্ভর করে বেশী, তাতেই বুঝি কোনো পরীক্ষা চলবে না? শুধু বাপের টাকা থাকাটাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।"

ভানুমতী বলিলেন, "তারা আমাদের কথায় মেয়ে অতবড় ক'রে রাখবে, তারপর পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে তুই বিয়ে করবি না, তখন মেয়ে অতবড় ক'রে রাখার জন্যে সমাজে তাদের নিন্দে হবে না? ওদের ঘরে সর্ব্বদাই বারো-তেরো বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়।"

সুবীর বলিল, "আমি ত তাঁদের সাধছি না? খুসী হয় তাঁরা মেয়ে রাখুন, না-হয় অন্য পাত্র দে'খে বিয়ে দিয়ে দিন।"

ভানুমতী বলিলেন, "মেয়েটি সুন্দরী ছিল, ভালো ঘরেরও বটে। বিয়ে ক'রে তারপর না-হয় যত ইচ্ছে পড়াতিস্।"

সুবীর বলিল, "সে হয় না, মা। অনেকেই তাই মনে করে বটে, কিন্তু বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্ত্রী যত বিদ্যে নিয়ে ঢোকেন, তাও হজম ক'রে ফেলেন। বিদ্যে বাড়তে বিশেষ দেখা যায় না।"

ভানুমতী বলিলেন, "তবে তাই বলব তাদের। তোর জেদ ত তুই ছাড়বিই না। যাক, আমি ত মেজদির সঙ্গে পুরী যাব এবার। তুই ত যাবি না?"

সুবীর বলিল, "না, পুরী ছাড়াও দুনিয়ায় দেখবার জায়গার অভাব নেই। এইবার সেইগুলো সব দে'খে বেড়াব। হাত-পা থাকতে থাকতে ঘোরাঘুরির পালা চুকিয়ে নিই, তারপর একজায়গায় গিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকব।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই একমাস তুই টো টো ক'রে একলা ঘুরবি! অসুখ-বিসুখ করে যদি? একটা চাকর অন্ততঃপক্ষে সঙ্গে নিস্!"

সুবীর বলিল, "আর কিছু না? চন্দ্র আর তার ভাই আমার সঙ্গে যাবে, অসুখ হ'লে তারা কিছু আমায় রাস্তায় ফে'লে দেবে না। এক চাকর নিয়ে সংএর মতো আমি ঘুরতে পারব না।"

ভানুমতী বলিলেন, "সব-তাতে জেদ। কেন, চাকর নিলে সং হতে যাবে কেন? তোর বাপ-ঠাকুরদাদা ত চিরকাল তাই করেছেন। কোথায় কোথায় যাবি?"

সুবীর প্রথম-কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "প্রথমে যাব রাজপুতানা। তারপর যেদিকে দু চক্ষু যায়।"

ভবানী খাবার লইয়া আসিল। সুবীর খাইতে বসিয়া গেল।

পরদিন ছেলে কলেজ চলিয়া যাইতেই ভানুমতী তাড়াতাড়ি নাওয়া-খাওয়া চুকাইয়া ফেলিলেন। ভবানীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মেজদির বাড়ীর জন্যে যে নূতন কাপড়গুলো রেখেছি, তা একটা ব্যাগে ভ'রে দেত রে, একেবারে ওগুলো দিয়েই আসি।"

শোভাবতী তখন কাজে মহা ব্যস্ত। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, এত বড় সংসারের গৃহিণী তিনি, তাঁহার আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। ভানুমতীকে দেখিয়া বলিলেন, "ওমা, ভানু যে! বোস্, বোস্। ও বড় বৌমা, মাদুর দিয়ে যাও একখানা। ব্যাগে কি আন্‌লি?"

ভানুমতী বলিলেন, "এই পূজার কাপড়-চোপড়গুলো।"

শোভাবতী বলিলেন, "ওমা, এরই মধ্যে কেনা হয়ে গেছে? আমি শুধু মেয়েদের বৌদের কাপড় কিনেছি, ছোট ছেলেপিলেদের পোষাক, ছেলেদের বাবুদের কাপড় সব বাকি।"

ভানুমতী বলিলেন, "দেখ ভাই মেজদি, অনেক কান্নাকাটি ক'রে ছেলেটাকে বিয়েতে রাজী করেছি। মিত্তিরদের মেয়ে দেখতেও ভালো শুনি। এখন তুমি যদি ব'লে কয়ে তাদের রাজী করাতে পার ত দেখ।"

শোভাবতী বলিলেন, "তাদের আবার রাজী করাব কি রে? তারা ত মেয়ে দিতে পেলে ব'র্তে যায়। তোরা মুখ থেকে কথা খসা না, একমাসের মধ্যে বৌ এসে ঘরে বস্‌বে।"

ভানুমতী বলিলেন, "খোকার যে আবার কত ফরমাস আছে। সেই মতো না হ'লে সে বিয়েই কর্‌বে না।"

শোভাবতী বলিলেন, "তা দেনাপাওনাও ঠিক কর্‌তে হবে বৈকি? খোকা আবার কি চায়?"

ভানুমতী হাসিয়া বলিলেন, "সে-রকম দেনাপাওনার কথা না, দিদি। আমার এক ছেলে, রাজ্যেশ্বর চিরজীবী হয়ে থাক্, তার অভাব কিসের যে সে শ্বশুরবাড়ী থেকে চাইবে? কিন্তু ছোট মেয়ে সে চায় না। বলছে, মেয়ে ওরা যদি ষোলো বছর অবধি রাখে, আর ম্যাট্রিক পাশ করায়, তবে সে বিয়ে করবে, নইলে নয়।"

শোভাবতী বলিলেন, "কেন, ঘরে এনে তারপর বি-এ, এম-এ যত খুসি পাশ করাও না? ওরা কি মেয়ে অতবড় ক'রে রাখতে রাজী হবে?"

ভানুমতী বলিলেন, "ছেলের জেদ। দেখ ব'লে, রাজী হয় ভালো, না হয় কি আর কর্‌ব?"

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বোন্‌পো, বোন্‌ঝি, বৌমা, নাতি, নাতনী, সকলকে কাপড় বিতরণ করিয়া, তাহাদের প্রণাম লইয়া, ভানুমতী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

দিন-দুই পরে ভানুমতী বোনের চিঠি পাইলেন। মিত্ররা এই সর্ত্তেই রাজী।

ভানুমতী আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছেলেকে খবর দিতে গেলেন। সুবীর তখন কাগজ কলম লইয়া কি একটা আঁকিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। মাকে দেখিয়া বলিল, "কি ব্যাপার? মহা খুসী যে?"

ভানুমতী বলিলেন, "ও রে, তারা তোর কথাতেই রাজী হয়েছে।"

সুবীর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বাধিত হলাম। এখন দেখছি, ম্যাট্রিক না বলে বি-এ বললে পার্‌তাম।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা যা, অত আবার ভালো নয়। যা সয়, তাই রয়, জানিস্? পুরুষ হয়ে জন্মেছিস ব'লে অত বাড় আবার ভালো নয়। তোর বিয়েটা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারি।"

সুবীর বলিল, "আমার বিয়ে হবামাত্র তুমি মরবে নাকি? বেশ আছ! আমি তা হলে বিয়ে করলে ত!" ভানুমতী হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

১৮

কয়েকদিন জাহাজ বাস করিয়া বাড়ীর সকলেই এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, খাওয়া আর ঘুমানো ভিন্ন তাহাদের আর কোনও লক্ষ্য ছিল না। কোনো-গতিকে স্নান করিয়া মুখে দুইটা গুঁজিয়া, যে যেখানে পাইল, শুইয়া পড়িল।

কৃষ্ণা ঘুমাইয়া যখন উঠিল, তখন বেলা প্রায় গড়াইয়া অসিয়াছে। চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিতেই প্রতিভা বলিল, "কৃষ্ণাদি, চা খাবেন চলুন। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছি আমি, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন ব'লে আর জাগাইনি।"

কৃষ্ণা খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। হাত-মুখ ধুইয়া, প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মুখের জায়গাটাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটি নিতান্ত ছোট নয়, মাঝারি একখানি ঘরের সমান। এইখানে টেবিলচেয়ার সাজাইয়া চায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অমিয়া আর তড়িৎ কৃষ্ণাদের অপেক্ষায় চুপচাপ বসিয়া আছে।

কৃষ্ণা আসিতেই তড়িৎ বলিল, "চা-টা খেতে হলে আমরা এখানেই খাই। আবার ঘরে এসব নিয়ে গেলে, মা এত ধোয়া মোছার ঘটা লাগান, যে আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠি।"

কৃষ্ণা বলিল, "ভালোই, সিঁড়ির মুখে হ'লে চাকর-বাকরেরও সুবিধা।"

চা পানের পালা শীঘ্রই চুকিয়া গেল। তখন প্রতিভা বলিল, "চলুন না, কৃষ্ণাদি, বাড়ীটা একটু ঘুরে দেখবেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা চল। কিন্তু ঘর না দে'খে, এখন ঘরের জিনিষপত্র-গুলো গুছিয়ে নিলে হ'ত। একেবারে হাট হয়ে রয়েছে।"

অমিয়া বলিল, "বাড়ী দেখতে আর কতক্ষণই বা লাগবে? তারপর ঘর গোছাবেন এখন।"

কৃষ্ণা বৌদের এবং তড়িৎকে লইয়া ঘরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীখানি বড় বটে, ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত, তবে সবই আধাআধি পার্টিশন করা, পুরা দেওয়াল একটিরও নয়। গৃহসজ্জার জিনিষপত্রের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই, কিন্তু সেগুলি বেশ সুরুচি-সঙ্গত ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হয় নাই। অমিয়া এবং প্রতিভার ঘরের এক এক টুক্রা স্থান লইয়া পার্টিশন্ দিয়া কৃষ্ণার জন্য একটা ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতে খাট, আলনা, ড্রেসিং টেবিল, রাইটিং ব্যুরো, চেয়ার, সব গাদা করিয়া ঠাসা। তাহার উপর কৃষ্ণার ট্রাঙ্ক, বিছানা, স্যুট্‌কেস প্রভৃতি জুটিয়া ঘরের চেহারা অতি অপূর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। সেই ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই প্রতিভা বলিল, "কৃষ্ণাদি, যদি দেওয়ালে টাঙাবার জন্যে ছবি চান, ত আমার ঘর থেকে দেব। অনেকগুলো বিলাতি ছবি আছে, আমার মোটেই ভালো লাগে না।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল "ছবি একরাশ আমারও ট্রাঙ্কে আছে। সেগুলি টাঙিয়ে যদি আর জায়গা খালি থাকে ত তোমার কাছে থেকে নেওয়া যাবে।"

কৃষ্ণাকে ঘর গুছাইতে রাখিয়া দিয়া অমিয়ারা চলিয়া গেল। জিনিষপত্র টানাটানি করিবার জন্য শীঘ্রই একটি চট্টগ্রামবাসী চাকর আসিয়া দেখা দিল। তাহার সাহায্যে আসবাবপত্র যাথাস্থানে সরাইয়া রাখিয়া, কৃষ্ণা বাক্স-বিছানা খুলিয়া, যেখানের জিনিষ সেখানে সাজাইতে লাগিল। বিছানাটা একেবারে পাতিয়া ফেলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিল। ট্রাঙ্ক স্যুট্‌কেসের জিনিষও বেশীর ভাগ বাহির করিয়া ফেলিল। বই, কাগজ, প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিবার যথেষ্ট স্থান আছে দেখিয়া, প্রথম সেইগুলি গুছাইবার দিকেই মন দিল।

হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, তড়িতের সঙ্গে চীনামাটির পুতুলের মতো একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথার চুল পার্শী টুপির মত উঁচু করিয়া বাঁধা, খোঁপার এক পাশে ফুলের ঝাপটা। মুখে চন্দনের গুঁড়ার মত কি একটি চূর্ণ প্রচুর ভাবে মাখান। পরণে চক্‌চকে গাঢ় নীল রঙের রেশমী কাপড় এবং লেস-বসানো মিহি

সূতার ঢিলা আস্তিনের জামা। তাহার বোতামগুলি বড় বড় লাল পাথরের। কানে লাল পাথরের ফুল। গলায় একটি সরু চেন হার, তাহারও মাঝে মাঝে লাল পাথর বসানো। পায়ে মখ্‌মলের চটির উপর, সরু সরু পাকানো মল, দেখিতে সোনার মতোই বোধ হয়, ঠিক সোনা কিনা কৃষ্ণা বুঝিতে পারিল না। স্থূলাঙ্গী, শ্যামবর্ণা, এবং অর্দ্ধমলিনবসনা তড়িৎকে মেয়েটির পাশে বড়ই মজার দেখাইতেছিল।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে, তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "এরা আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকে। আমরা ফিরে এসেছি শুনে দেখতে এসেছে। আমার সঙ্গে খুব ভাব কি না?"

কৃষ্ণা বলিল, "কোন্ ভাষায় তোমরা কথা বল? তুমি কি বর্ম্মা ভাষা বলতে পার?"

তড়িৎ বলিল, "না, কিন্তু এই মেয়েটি হিন্দিও জানে, ইংরিজিও জানে, কাজেই কথা বলার কোনো অসুবিধা নেই।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটির নাম কি?"

তড়িৎ বলিল, "মা শোয়ে।"

মেয়েটি বুঝিতে পারিতেছিল, যে, তাহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে। সে কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণা বুঝিল, মেয়েটির ইচ্ছা তাহার সঙ্গে একটু ভাব-সাব করে। কিন্তু তাহার হাতে তখনও প্রচুর কাজ। সেগুলি সাঙ্গ না করিয়া নূতন আলাপ-পরিচয় করার দিকে তাহার তত উৎসাহ বোধ হইতেছিল না। তাহার ধরণ-ধারণেই বোধ হয় তড়িৎ সেটা বুঝিতে পারিল। মা শোয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি সব গুছিয়ে নিন্। আমরা ছোট বৌদিদির ঘরে একটু গল্প-সল্প করিগে।"

মেয়েগুলি চলিয়া গেলে, কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম চুকাইয়া ফেলিল। তাহার পর মুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া, বৌদের আড্ডায় গিয়া দেখা দিল। পাশের বাড়ীর মেয়েটি তখন চলিয়া গিয়াছে। বৌ দুইজন ননদের সঙ্গে

গল্প করিতেছে। গৃহিণী আসিয়াই কর্ম্ম-সাগরে এমন ডুব দিয়াছেন যে, তাঁহার আর সন্ধানই মিলিতেছে না।

কৃষ্ণা ঢুকিয়াই বলিল, "তোমাদের অভ্যাগতটি চ'লে গেছে নাকি? বেশ পুতুলের মত দেখতে।"

প্রতিভা বলিল, "কাল দেখবেন-এখন কত লোক আসে। আপনি এসেছেন, সে খবরটা একবার পেলেই হয়।"

কৃষ্ণা বলিল, "বাপ রে, আমি এমন কি একটা মহা বিখ্যাত মানুষ যে, আমাকে দেখতে আবার লোক আসবে?"

তড়িৎ বলিল, "আহা, বিখ্যাত নয় বুঝি! আশে পাশে যত বাঙালী আছে, সবাই আসবে। কতদিন থেকে সব জানে, যে আপনি আসবেন। বাঙালীর মেয়ে, বি-এ পাশ, সবাই দেখতে ব্যস্ত।"

কৃষ্ণা বলিল, "বি-এ পাশ মেয়ে ত এখন গলিতে গলিতে পাওয়া যায়। তারা কি আর এখনও দেখবার জিনিষ আছে?"

অমিয়া বলিল, "এখানে বেশী কেউ নেই, কাজেই সবাই ভাবে, তারা না জানি কি রকম!"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিল। গৃহিণীর দেখা পাওয়া গেল এতক্ষণ পরে। তিনি চাকর-বাকর শাসন করা, ভাঁড়ারের কি কি জিনিষ চুরি হইয়াছে তাহার তদারক করা এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই বৌ-দুটি ঘোমটা টানিয়া চুপ হইয়া গেল। তিনি কৃষ্ণাকে বলিলেন, "কি মা, বিদেশে এসে মন কেমন কর্‌ছে না ত?"

কৃষ্ণা বলিল, "আমার স্বদেশ-বিদেশ দুইই সমান। সেখানেই বা আমার কে আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে কথা সত্যি। আত্মীয়-স্বজন না থাকলে, স্বদেশ বিদেশে তফাৎই বা কি? এখানেও পাঁচজনের সঙ্গে দেখাশোনা হোক, বেড়িয়ে চেড়িয়ে এদিক্ ওদিক্ দেখ, তখন আর অতটা খারাপ লাগবে না!"

তখনও সকলের ক্লান্তি দূর হয় নাই। সকাল সকাল খাইয়া, যে যাহার ঘরে শুইবার চেষ্টায় প্রস্থান করিল। কৃষ্ণা ঘরে ঢুকিয়া আর একটু ঘর গুছাইবার চেষ্টায় লাগিল। বেশীক্ষণ কাজ করিবার উৎসাহ রহিল না। বাতি নিবাইয়া দিয়া সেও শুইয়া পড়িল।

ভোরে উঠাই তাহাদের চিরকালের অভ্যাস। বোর্ডিংএই জীবন কাটানোর দরুণ, ইচ্ছামতো নিদ্রাসুখ উপভোগ করার সুবিধা তাহার কোনোদিনই হয় নাই। কাজেই ভোর বেলাই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ, আর কেহ যে এখন অবধি উঠে নাই, তাহা সে বুঝিতেই পারিল। খানিকক্ষণ জাগিয়া জাগিয়াই বিছানায় শুইয়া রহিল, তাহার পর আর না-পারিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মুখ-হাত ধুইয়া চুল ঠিক করিয়া, খোলা জানলার ধারে দাঁড়াইয়া রাস্তার পথিক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ব্রহ্মদেশের মানুষগুলি ঠিক যেন পুতুলের মতো। ফিট্‌ফাট, ঝক্‌ঝকে রঙীন পোষাক পরা, মুখে হাসি। জগতের দুঃখ-ক্লেশের সহিত ইহাদের যেন পরিচয়ই নাই। পুরুষগুলি সবাই যেন রাজপুত্র, সংসারের জীবন-সংগ্রামে ইহাদের কোনো স্থান নাই, পারিলে তাহারা পায়ে হাঁটাও ত্যাগ করে। মেয়েগুলিকে ততটা অকর্ম্মণ্য লাগে না, কিন্তু তাহারাও যেন সখ করিয়া কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় মানুষগুলিকে ইহাদের পাশে কি মলিন শ্রীহীন চিন্তাভারাক্রান্ত বোধ হয়!

চ্যাপ্টা গোল ডালায় বিচিত্র রংএর ফুল সাজাইয়া ব্রহ্মদেশীয় ফুলওয়ালী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। উপর হইতে তাহার ফুলের ডালাটি দেখাইতেছে যেন একটি আল্‌পনার রঙীন ছবি। বাড়ীর নীচে আসিয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "পাঁ, পাঁ।" তড়িৎ একটা জানলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া হাততালি দিতেই ফুলওয়ালী তাহার পণ্যসম্ভার লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড শোলার টুপি পরা চীনদেশীয় মানুষ একটি বিপুল বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। লম্বা বাঁশের দুধারে বড় বড় কাঠের বাক্সের মত

ঝোলানো। তাহার ভিতর লোহার তোলা উনানে না-জানি কি অপূর্ব খাদ্যই পাক হইতেছে। চীনা মুখে কিছুই বলিতেছে না, দুই টুকরা বাঁশ লইয়া ক্রমাগত বাজাইয়া চলিয়াছে, খট খট খট খট। রিক্‌শওয়ালা নিজের চারগুণ ওজনের দুইটি করিয়া মানুষকে পিছনের গাড়ীতে বসাইয়া সলম্ফে হরিণের মত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিছু যে তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাহা মনেই হয় না। ঘোড়ার গাড়ীগুলি কলিকাতারই মতো, তবে মাত্র তিনজন মানুষ বসিবার স্থান। রাস্তায় ব্রহ্মদেশীয় মানুষ চলাফেরা করিতেছে, আর দুই-চারিটা কাঠের বাড়ীর স্থাপত্য একটু অভিনব। তাহা না হইলে কৃষ্ণা স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারিত, যে, সে কলিকাতারই কোনো গলির মধ্যে বাস করিতেছে।

খুকীকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণা সিঁড়ির গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। নীল রংএর ফুলের গুচ্ছ হাতে লইয়া, তড়িৎ ফুলওয়ালীর সঙ্গে মহা দর্‌দস্তুর সুরু করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিল, "কৃষ্ণাদি, আপনার এ ফুলগুলো পছন্দ হয়?"

কৃষ্ণা বলিল, "রংটা ত বেশ। তবে গন্ধ ব'লে কিছু নেই দেখছি। ঐ প্রজাপতি লিলিগুলির গোছা কত ক'রে?"

তড়িৎ বলিল, "ওগুলোও বেশ সস্তা। কিন্তু কালকের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। এই নীল ফুলগুলো দেখবেন-এখন কতদিন থাকে। আর এক-রকম ফুল আছে, দেখতে ঠিক কাগজের ফুলের মতো, সেগুলোকে 'মেমিয়ো ফ্লাওয়ার' বলে। দেখতে ভালো নয়, গন্ধও বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু পাচ মাস রেখে দিলেও, তার কিছু ইতর-বিশেষ দেখবেন না।"

খানিক দরদস্তুর করিয়া কয়েক আনায় প্রচুর ফুল বিক্রয় করিয়া ফুলওয়ালী সিঁড়ি দিয়া হেলিতে দুলিতে নামিয়া গেল। কৃষ্ণা এক-গোছা শাদা এবং এক-গোছা নীল ফুল লইয়া ঘরে ঢুকিল ফুলদানীতে সাজাইবার জন্য। তড়িৎ তাহার পিছন পিছন আসিয়া বলিল, "এখানে অল্প পয়সায় ফুল যত খুসি পাবেন, কিন্তু কলকাতার মতো ভালো ফুল এখানে হাজার দাম দিলেও

মিলবে না। যত-সব বাজে জংলী ফুল। বর্ম্মারা ফুল খুব ভালোবাসে কিন্তু ভালো ফুলের আদর জানে না।"

কৃষ্ণা ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিয়া বলিল, "আজ থেকে আর শুধু গল্প নয়, পড়া-শোনা সব রুটিন্ ক'রে আরম্ভ করতে হবে। তুমি ত স্কুলে যাও, না?"

তড়িৎ বলিল, "হ্যাঁ, খুকীটাকে এবার ভর্ত্তি করার কথা আছে। কিন্তু এমনই ভীতু, স্কুলের নাম শুনলেই ভ্যাঁ ক'রে চীৎকার সুরু ক'রে দেয়। মা বল্‌ছিলেন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে ওকেও কয়েক মাস আপনার কাছে পড়াবেন।"

কৃষ্ণা মনে মনে গৃহিণীর বিষয়বুদ্ধির তারিফ করিয়া মুখে বলিল, "না, মনে আর কি করব? ঐটুকু ত বাচ্চা মেয়ে, তাকে পড়িয়ে দিতে আর কত সময় লাগবে?"

হঠাৎ বিপিন আসিয়া তাহার ঘরের সামনে দাঁড়াইল। কৃষ্ণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমি কলকাতায় টেলিগ্রাফ করতে যাচ্ছি। আপনার যদি কাউকে খবর দেবার থাকে ত এই সঙ্গে দিয়ে আসতে পারি।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমার টেলিগ্রাফ করার দরকার কিছু নেই। চিঠি লিখলেই হবে। এখানে মেল ডে' কোন্ কোন্ দিন?"

বিপিন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তড়িৎ বলিল, "আজই ত একটা 'মেল ডে।' সকাল-সকাল চিঠি দিয়ে দেবেন, তা না হ'লে এখানকার যা চমৎকার ডাকের ব্যবস্থা, চিঠি হয়ত কালকের জাহাজে যাবেই না।"

কৃষ্ণা বলিল, "তাই নাকি? এখনি তা হ'লে লিখে ফেলি। টেলিগ্রাফও করব না, আবার চিঠিও যদি আট-দশ দিন পরে পৌছায়, তাহ'লে সবাই ভাববে আমি জাহাজ-ডুবি হয়ে একেবারে ভবসাগর পার হয়ে গেছি।"

বিপিন বলিল, "আচ্ছা, তাই লিখে ফেলুন তা হ'লে। আর এক ঘণ্টা পরে গেলেও ক্ষতি নেই, একেবারে আপনার চিঠিগুলি নিয়েই যাব।" বিপিন ফিরিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বাড়ীতে চাকর-বাকরের অভাব নাই, তাহারা স্বচ্ছন্দে চিঠি ক'খানা ডাকঘরে দিয়া আসিতে পারে। কৃষ্ণা যত চেষ্টা করে বিপিনকে এড়াইয়া চলিতে, এই ছেলেটি তত প্রাণপণে যেন তাহার ঘাড়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করে। অথচ তাহার মধ্যে কোনো অভদ্রতা নাই, তাহাকে নিষেধ করিবারও কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।

চিঠির কাগজের প্যাড লইয়া কৃষ্ণা চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল। তড়িংকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি?"

তড়িং বলিল, "৪৫নং,—29th Street"।

কৃষ্ণা বলিল, "বাবা, এ যে একেবার New York হয়ে উঠল। একটা Fifth Avenue নেই এখানে?"

তড়িং বলিল, "তা ত জানি না, কিন্তু এখানকার প্রায় সব রাস্তার নামই এমনি নম্বর দিয়ে দিয়ে।"

কৃষ্ণা চিঠি লিখিতে স্বরু করায়, তড়িং সেখান হইতে চলিয়া গেল। লাবণ্যকে একটা, গিরিধির মামীমাকে একখানা, বিদ্যুৎকে একখানা লিখিয়া কৃষ্ণা চিঠি লেখার পর্ব্ব সমাপন করিল। মুখ তুলিয়া চহিয়া দেখিল, বাড়ীর সব লোকজনগুলিই উঠিয়া পড়িয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে। শীঘ্রই চা খাওয়ার ডাক পড়িল।

প্রাতঃকালের পালা চুকাইয়া ফেলিয়া, অমিয়া-প্রতিভাকে ডাকিয়া কৃষ্ণা বলিল, "এখন পড়াশোনার একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলা ভালো। চল দেখা যাক, তোমাদের ঘরে গিয়ে, কার কতখানি বিদ্যে। খুকীও পড়বে শুনেছি, তাকেও নিয়ে চল।"

তাহার ছাত্রীগুলি সলজ্জ হাসিয়া অগ্রসর হইল। পড়ার নাম শুনিবামাত্র খুকী সলম্ফে অদৃশ্য হইয়া গেল। তড়িং ছুটিল তাহাকে ধরিয়া আনিতে।

অমিয়া-প্রতিভার বিদ্যা বেশী কিছু অর্জ্জন হয় নাই, দেখা গেল। প্রতিভা প্রায় কিছু শিখে নাই, গানবাজনা লইয়া দিন কাটাইয়াছে। অমিয়া

নিতান্ত নিজগুণে পূর্ব শিক্ষয়িত্রীর অমনোযোগ সত্ত্বেও কিছু কিছু শিখিয়াছে, সেলাই অবশ্য শিখিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রতিভার গলাটা ভাল, কাজেই গানের সুর অধিকাংশ ভুল শেখা সত্ত্বেও তাহার গান শুনিতে নিতান্ত মন্দ লাগে না।

কি কি পড়িতে হইবে, কোন্ বিষয়ে কত সময় দেওয়া হইবে, কৃষ্ণা কাগজ-কলম লইয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতে বসিল। যা বই আছে তদুপরি আর কি কি আনিতে হইবে, তাহারও একটি তালিকা করিয়া দিল।

তড়িৎ খুকীকে টানিয়া লইয়া আসিল। সে ত টানাটানি হ্যাঁচ্‌ড়া-হেঁচ্‌ড়ি করিয়া মহা ধুম বাধাইয়া দিল। কৃষ্ণা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুকী, তুমি কি বই পড়েছ?"

খুকী এক পায়ে নাচিতে নাচিতে বলিল, "বই ভালো না। কিছু পড়িনি।"

কৃষ্ণা বলিল, "তোমায় বেশ ভালো ছবিওয়ালা বই দেব। কাল থেকে তুমি সকালে একঘণ্টা ক'রে পড়বে।"

"না—আ" বলিয়া এক ঝট্‌কায় দিদির হাত ছাড়াইয়া খুকী এক দৌড়ে পলায়ন করিল।

কৃষ্ণা বলিল, "ছোট ছাত্রীকে দে'খে উৎসাহ বোধ হচ্ছে না; তোমাদেরও কি মন পালাই-পালাই কর্‌ছে নাকি?"

প্রতিভা বলিল, "মোটেই না; তবু ত কর্‌বার কিছু পাব। হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌তে বুঝি মানুষের ভালো লাগে?"

কৃষ্ণা বলিল, "তা হ'লে কাল থেকেই নিয়ম মতো আরম্ভ করা যাবে।"

১৯

বাক্স-প্যাঁটরা লইয়া ইরাবতীর তীরে অবতরণ করিয়া, চন্দ্র সুবীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এর পর যাওয়া যাবে কোথায়? এখানে কারো সঙ্গে জানাশোনাও ত নেই?"

সুবীর বলিল, "জানাশোনা নিয়ে কি হবে? আমেরিকানরা যে বিশ্বের সব পাড়ায় ঘুরে আসে, সব জায়গায় কি তাদের চাচা খুড়ো কেউ ব'সে থাকে? দিশি বিলাতি কোনও একটা হোটেলে সন্ধান ক'রে উঠে পড়া যাক্ চল্। গাড়োয়ানকে বল্‌লেই সে নিয়ে যাবে এখন।"

একখানা গাড়ী জোগাড় করিয়া তাহারা ত উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান তাহাদের পাঞ্জাবী একটা হোটেলে তুলিয়া দিয়া ন্যায্য পাওনার তিনগুণ পয়সা আদায় করিয়া অতি আনন্দিত চিত্তে প্রস্থান করিল। বাঙালী ভ্রমণকারীদের সৌভাগ্যক্রমে হোটেলে লোক বেশী ছিল না, একখানা ঘর তাহারা তিনজন পাইয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। অজ্ঞাত-কুলশীল কাহারও সহিত রাত্রিবাস করিতে হইলে তাহাদের আর অস্বস্তির সীমা থাকিত না।

নাওয়া-খাওয়া সারিয়া লইয়া চন্দ্রের ছোট ভাই ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তবে বেরিয়ে পড়া যাক্, কি বলেন? এ ঘরটি ত বেশী লোভনীয় বোধ হচ্ছে না? এটার মধ্যে যত কম থাকৃতে হয় ততই ভালো।"

সুবীর বলিল, "গাইড্‌বুক, এবং মাসিকপত্রের ভ্রমণকাহিনী প'ড়ে যতদূর বোঝা যায়, এখানে ঘটা ক'রে দেখতে যাবার জায়গা বেশী কিছু নেই। উঠ্‌তে বসতে এক শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা। আর-একটা চলনসই গোছের লেক্ আছে ব'লে শুনেছি। সে-সব দেখার চেয়ে আমার অখ্যাত জায়গাগুলো দেখারই ঝোঁক বেশী, তাতে জাতটাকে ঢের বেশী চেনা যায়। চল, একখানা গাড়ী ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ক'রে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে ঘোরা যাক্। শো প্লেসগুলি কাল দেখতে যাওয়া যাবে।"

তাহাই হইল। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী একখানা ডাকিয়া 'কোডাক' এবং নোটবুক লইয়া তাহারা তিনজনে বাহির হইয়া পড়িল। জিনিষপত্র ঘরেই রহিল, টাকাকড়ি শুধু ম্যানেজারের কাছে গচ্ছিত হইয়া রহিল।

এখানকার পথঘাট কিছুই তাহাদের জানা নাই, কাজেই গাড়োয়ানকে কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া দিবার কোনো উপায় ছিল না। সুবীর

কেবল তাহাকে বলিয়া দিল যেন সহরের সব বড় রাস্তাগুলি তাহাদের ঘুরাইয়া আনে। গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া দিল।

রেঙ্গুনের ভিতর ব্রহ্মদেশীয়ত্ব বিশেষ কিছু নাই। বাড়ীগুলির স্থাপত্যের মাঝেমাঝে তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়, আর রাস্তায় ঘাটে বর্ম্মা স্ত্রী-পুরুষ খানিক খানিক দেখা যায়। কিন্তু ভিন্নদেশীয় নরনারীও নিতান্ত কম চোখে পড়ে না, বিশেষ করিয়া মান্দ্রাজী। ইংরজেদের এবং অন্যান্য বিদেশীদের বড় বড় দোকান খুব রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া আছে, ব্রহ্মদেশীয় দোকান প্রায় চোখে পড়ে না। তবে রাস্তাগুলি তাহারা সাজাইয়া রহিয়াছে বটে। রংএর বাহার যাহা কিছু, রেশমের চাকচিক্য যাহা-কিছু সব তাহাদের অঙ্গে। ভারতবর্ষীয়গুলি দেশেও যেমন মাটির সন্তান, এখানেও তাই। মাটিকে তাহারা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াই আছে।

ডালহাউসী ষ্ট্রীট, ফ্রেসার ষ্ট্রীট, মণ্টগোমারী ষ্ট্রীট, সুলে প্যাগোডা রোড, মার্চ্চেণ্ট ষ্ট্রীট, প্রভৃতি অনেক নামই তাহাদের চোখে পড়িল। চন্দ্র বলিল, "মহা রাজভক্ত জাত দেখছি, দেশী নাম রাস্তা-ঘাটে একটাও নেই! কিন্তু এত কষ্ট ক'রে এই মিনিয়েচ্যার্ নকল কলকাতা দেখতে আসবার দরকার ছিল কি? এর ভিতর ত বর্ম্মার কিছু দেখছি না?"

সুবীর বলিল, "বড় রাস্তায় ঘুরে তুমি দেশটার কোনো সন্ধান পাবে না। অলি-গলিতে ঢুক্‌লে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

গাড়োয়ানের কাছে খবর লইয়া তাহারা জানিল, সহরতলির দিকে গেলে দেশী বস্তি, চীনা বস্তি, এসব দেখা যাইতে পারে। নিম্নশ্রেণী গরীব বর্ম্মাদের বস্তিও আছে।

চন্দ্র বলিল, "রোদে ঘুরে ঘুরে ত মাথার চাঁদি উড়ে গেল। এখন হোটেলে ফিরে একটু নিদ্রা দেওয়া যাক, আবার বিকেলের দিকে বেরোলেই হবে। গাড়োয়ানটাকে ব'লে দাও বিকেলে আবার আসতে।"

ষ্টীমারের খুপরির ভিতর তাহারা যে বেশী সুখে আসিয়াছিল তাহা নয়। আহার নিদ্রা কিছুই খুব ভাল হয় নাই। কাজেই অন্য দুজনের

চোখেও নিদ্রাদেবীর তাগিদ আসিয়া পৌঁছিতেছিল। সুতরাং গাড়ী ফিরাইয়া তাহারা হোটেলেই ফিরিয়া গেল এবং গাড়োয়ান যাহা চাহিল, নির্ব্বিচারে তাহাই দিয়া, ঘরে ঢুকিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিকালেও গাড়ী চড়িয়া তাহারা যত গলিঘুঁজি ও বস্তি ঘুরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, মানুষের প্রীতি উৎপাদন করিবার মত কিছু সেগুলির মধ্যে ছিল না। পথে নামিয়া কিছু ব্রহ্মদেশীয় খাবার খাইবার চেষ্টাও তাহারা না করিয়া ছাড়িল না। কিন্তু বাঙালীর ঘ্রাণেন্দ্রিয় লইয়া এক্ষেত্রে তাহারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। বর্ম্মার চটি, বর্ম্মার ছাতা, বর্ম্মার বেতের বাক্স প্রভৃতি কিনিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে খাওয়া সারিয়া ইন্দ্র বলিল, "এখানে পাঁচ দিন থাকব ঠিক ক'রে এসেছিলাম, কিন্তু আর একদিন কাটাবার মতোও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কাল প্যাগোডা দে'খে পরশুর ষ্টীমারেই রওনা হ'লে হয়। এবার না-হয় ডেকেই যওয়া যাবে, কেবিনে যাওয়ার সুখ ত খুব উপভোগ করা গেল।"

চন্দ্র বলিল, "আরে অত তাড়া কিসের? না-হয় মান্দালে ঘুরে আসা যাবে। সেখানে শুন্‌ছি ব্রহ্মদেশীয় পুরাকীর্ত্তি কিছু কিছু আছে।"

সুবীর বলিল, "এখন ত ঘুমোনো যাক্, তারপর কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে। আর কিছু করবার না থাকে, কাল কিছু ছবি নিয়ে বেড়ানো যাবে, দেশে ফিরে গিয়ে সচিত্র ভ্রমণকাহিনী লেখার একটা সুবিধা হবে। কাল মনে ক'রে চিঠিপত্রও লিখতে হবে, তা না হ'লে মা একদিস্তা টেলিগ্রাম ঝাড়বেন এখন।"

পরদিন সকালে তাহারা এখানে-সেখানে কয়েকটা খ্যাত-অখ্যাত স্থানের ছবি লইয়া বেড়াইল। বর্ম্মিণী ফুলওয়ালী, মান্দ্রাজী রিক্‌শওয়ালা, চট্টগ্রামের শাম্পানওয়ালাও বাদ পড়িল না। দুপুর বেলাটা সকলে মিলিয়া চিঠিপত্র লেখার কাজেই কাটাইয়া দিল। চন্দ্র এবং ইন্দ্র দুজনেরই বিবাহ হইয়াছিল, কাজেই তাহাদের চিঠি লিখিবার লোকের অভাব হইল

না। সুবীর অগত্যা মাকে এবং বন্ধুবান্ধবকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া নিজের আত্মাভিমান বজায় রাখিল।

বিকাল বেলা বেশ রোদ থাকিতে থাকিতে তাহারা প্যাগোডা দেখিতে বাহির হইল। গাড়ী চলিয়াছে ত চলিয়াইছে। চন্দ্র বলিল, "রেঙ্গুন ত পার হয়ে এলাম, এখন অবধি প্যাগোডার চিহ্ন নেই। ব্যাপারটা কি ?"

ইন্দ্র বলিল, "গাড়োয়ানটা রাস্তা চেনে ত ?" গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে এমন মুখভঙ্গী করিল যেন এমন অনধিকার-চর্চ্চা ঘটিতে সে আর কখনও দেখে নাই। অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া সে তাহাদের জানাইল যে 'বড় ফায়া' সহর হইতে অনেকটাই দূর, বাবুরা অজ্ঞতা বশতঃ এত অধৈর্য্য হইতেছেন। আর মিনিট-দশের মধ্যেই তাঁহারা পৌছিয়া যাইবেন।

সব শ্রেণীর বস্তিই প্রায় তাহারা পার হইয়া আসিয়াছিল। এখন ঘাসে ঢাকা খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে দুইচারিটা ঘর। গাড়ীটা এখন একটু উপর দিকে উঠিতেছে বোঝা গেল। গোরা পল্টনের ছাউনি যে কাছাকাছি আছে তাহাও খাকি পোষাকপরা মনুষ্যমূর্ত্তির এদিক্ ওদিক্ ঘুড়িয়া বেড়ান দেখিয়া অনুমান করা শক্ত হইল না। চারিদিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের সার, তাহাদের শ্যামলতা অতিক্রম করিয়া প্যাগোডার চূড়াটা এতক্ষণ পরে নবীন ভ্রমণকারীদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রকাণ্ড এক সোপানশ্রেণীর নীচে আসিয়া তাহাদের গাড়ী থামিল। চারিদিকে গাড়ী ঘোড়া এবং মানুষের মহা ভিড়। নীচের সিঁড়িগুলির উপর গৈরিক-পোষাক-পরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী অনেকগুলি দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের ভিতর জুতা পায়ে দিয়া কাহারও গমন নিষেধ; যাহাতে কোনো যাত্রী এই নিয়ম ভঙ্গ না করে, তাহার দিকে ইহারা কড়া দৃষ্টি রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া গাড়ীর ভিতর রাখিয়া সুবীর এবং তাহার দুই বন্ধু উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। প্রথম বড় বড় সিঁড়ি-কয়টা অতিক্রম করিয়া ছোট একটু চত্বরের মত। তাহার পর আবার সিঁড়ি। এ সিঁড়ির আর

যেন শেষ নাই, উঠিতে উঠিতে তাহাদের পা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল তবু ইহার আর অন্ত দেখিতে পাওয়া গেল না। এগুলি মন্দিরেরই অংশ, উপরে ছাদ আছে, এবং দুই পাশে ছোট ছোট খুপরী ঘরে হরেক রকমের দোকান। উপরটা ঢাকা বলিয়া, এই জায়গাগুলি কিছু অন্ধকার, তাহার ভিতর স্তম্ভগাত্রে বিভিন্ন রঙের পাথরের কাজ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। বিকটদংষ্ট্রা ব্যাঘ্র, সিংহ, মকর, সব এদিক্ ওদিক্ থাবা পাতিয়া বসিয়া অছে। কতকাল হইতে এইখানেই তাহাদের বাস, কিন্তু এখনও রং জ্বলিয়া নষ্ট হয় নাই, বা হাত পা লেজ ভাঙিয়া যায় নাই।

নানারকম জিনিষই এখানে বিক্রয় হইতেছে। মণিহারির দোকানই বেশী, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ফুল ও বাতির দোকান। ইহার বিক্রেত্রী অধিকাংশই যুবতী ব্রহ্মদেশীয়া রমণী। তাহারা যত ভাষা জানে, সব ভাষাতেই যাত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, ফুল বাতি কিনিতে, জুতা রাখিতে, বসিয়া বিশ্রাম করিতে আহ্বান করিতেছে। যাহারা বৌদ্ধ, সকলেই ফুল এবং বাতির অর্ঘ্য লইয়া চলিয়াছে; যাহারা বৌদ্ধ নয়, এমন অনেকেও লইতেছে।

কত দেশের, কত ভাষার, মানুষ-সব সারি সারি সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিয়া চলিয়াছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু, অশীতিপর বৃদ্ধ কেহই বাদ যায় নাই। কিন্তু গোলমাল নাই, বাক্‌বিতণ্ডা নাই। তীর্থের মর্য্যাদা রাখিতে ইহারা জানে। হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্যে তাহারা দীন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বাহিরের সশ্রদ্ধ ব্যবহারে তাহাদের কোনো দৈন্য নাই। ক্ষুদ্র শিশু, প্রগল্‌ভ বালকবালিকা পর্য্যন্ত নীরবে চলিয়াছে। সচল রামধনুর মত উজ্জ্বল নয়নাভিরাম রঙের স্রোত সিঁড়ি বাহিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সংসারত্যাগীর গৈরিকও তাহার মধ্যে মিশিয়াছে।

নবীন ভ্রমণকারীর দল যখন প্রায় বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, তখন হঠাৎ সোপানশ্রেণী শেষ হইয়া গেল। তাহারা প্রকাণ্ড একটি বাঁধানো আঙিনার মত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার মধ্যদেশে প্রধান প্যাগোডা

উন্নত স্বর্ণরঞ্জিত চূড়া লইয়া সগৌরবে দাঁড়াইয়া, তাহার চারিদিক্ ঘেরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। এই মন্দিরগুলির ভিতর সবই প্রায় বুদ্ধ-মূর্ত্তি। শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ, অধরোষ্ঠ তাম্বূলরঞ্জিত, মস্তকে রাজমুকুট। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের মূর্ত্তি এ নয়, এ রাজপুত্রেরই মূর্ত্তি! চারিদিকের চাকচিক্য নয়নকে তৃপ্ত করে বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ, মস্তক অবনমিত হয় না। কেবল রূপের ছটা, রংএর ঘটা। যাত্রিদল নীরবে চলিয়াছে, ফুল ও বাতির অর্ঘ্য রাখিয়া নিঃশব্দে নিজ নিজ পূজা সমাপন, করিতেছে, তারপর উঠিয়া অন্য এক বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া অবনত হইতেছে। প্রধান মূর্ত্তিটির সামনে মানুষের ভিড় লাগিয়াই আছে, ফুলে ফুলে ভিত্তিতল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে! নানা রং-বেরংএর ছোট ছোট মোমবাতি কয়েক সার সম্মুখে নিরন্তর জ্বলিতেছে। অল্পবয়স্ক যাত্রীরা দু'মিনিট দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে, প্রৌঢ় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হইয়া বসিয়াই আছে। একদিকে প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা, কোনো কোনো যাত্রী সেখানে দাঁড়াইয়া সেটা দুএকবার বাজাইয়া যাইতেছে। ইহাদের ধারণা, যে-মানুষ যতবার বাজাইবে, তাহাকে ততবার এই মন্দিরে আসিতে হইবে।

আঙ্গিনাটি ঘিরিয়াও হয় মন্দির নয়, বৌদ্ধ চিত্রশালা বা প্রাচীন ব্রহ্মদেশীয় মণিরত্ন, তৈজস প্রভৃতির ম্যুজিয়ম্; ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকন সব এক জায়গায় রক্ষিত।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ আর কথা বলে না। তাহার পর ইন্দ্র বলিল, "এখানে কি কথা বলা বারণ? সব যে একেবারে মুখে খিল এঁটে রইলে?"

সুবীর বলিল, "কেউ যেখানে কথা বলছে না, সেখানে নিজের গলার স্বরটা নিজের কানেই খট্ ক'রে লাগে। অনেক তীর্থ ঘুরেছি, কিন্তু তীর্থের মর্য্যাদা রক্ষা হ'তে এই প্রথম দেখলাম। না আছে নোংরা কিছু, না আছে চীৎকার গালাগালি, না আছে কুষ্ঠরোগী বা ভিখিরি। বাংলাদেশের অর্দ্ধেক লোক ত একে তীর্থ ব'লে স্বীকার করতেই চাইবে না।"

চন্দ্র বলিল, "তা বটে, এই একটা জিনিষ দেখছি, যাতে ব্রহ্মদেশ বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বটে।"

সুবীর বলিল, "রোজই এইরকম লোক আসে, না আজ কিছু পর্ব্ব-টর্ব্ব আছে?"

ইন্দ্র বলিল, "এর ভিতর সবাই কি আর তীর্থ করতে এসেছে, সাইটসীয়ারের দলও কম নেই। বর্ম্মার লোক ছাড়া বিদেশীও ত ঢের দেখছি। ঐ দেখ, বাঙালী চলেছে একদল। অনেকগুলি মহিলাও রয়েছেন দেখছি। এঁরাও খুব সম্ভব নূতন এদেশে এসেছেন। উৎসাহটা প্রথম দর্শনের সময়েই বেশী থাকে কিনা?"

সুবীর ফিরিয়া তাকাইল। একদল বাঙালী পুরুষ ও মেয়ে তাহাদের একটু দূরে দাঁড়াইয়া মন্দির দেখিতেছে। চন্দ্র বলিল, "এখানে এসে ব্রহ্মদেশীয়াদের দেখাদেখি বাঙালীরাও স্বাধীন জেনানা হয়ে উঠেছেন, দেখা যাচ্ছে। দলের ভিতর দুটি বৌ আছেন মনে হচ্ছে, কিন্তু মাথার কাপড় খুব বেশী দূর নামেনি।"

সুবীর সেই দলের একটি মেয়ের দিকে অত্যন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। ইন্দ্র বলিল, "কী সুবীরবাবু, একেবারে যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন? মহিলাটি অবশ্য খুবই সুন্দরী বটেন, কিন্তু নিজের মনোভাবটা অমন প্রকাশ করবেন না। লোকে ভাববে কি?"

সুবীর তাহার কথার কোনো উত্তরই দিল না। সেই দলটি এখন একেবারে তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনটি যুবতী, একটি কিশোরী, গুটি-তিন ছেলেমেয়ে এবং একটি যুবক। ছোট একটি মেয়ের হাত ধরিয়া যে তরুণী বঙ্গমহিলাটি সর্ব্বাগ্রে চলিয়াছিলেন, তিনি সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী। সাগরের জলের মতো ঘন নীল রেশমের শাড়ী তাঁহার বিদ্যুৎপ্রভ রূপের জ্যোতি আরো যেন বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। হাতে দুগাছি নীল এনামেলের কাজ করা চওড়া সোনার চুড়ি, কাঁধে একটি সেই ধরণের ব্রোচ, আর কোথাও কোনো অলঙ্কার নাই। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়

যেন সম্রাজ্ঞী। চালচলনের ভিতর সতেজ নির্ভীক ভাব, অথচ বিন্দুমাত্র গাম্ভীর্য্যের অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না।

সুবীর বলিল, "চন্দ্র, এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কোথাও দেখেছ? ঠিক মনে হচ্ছে না, আমার মা আবার অল্পবয়সী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কেবল তাঁর মুখের স্নেহবিগলিত ভাবটা এর মধ্যে নেই, আগুনের মতো দীপ্তিই কেবল দেখা যাচ্ছে।"

চন্দ্র ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি, দেখলে চমকে যেতে হয়। তোমার মায়ের কোনও আত্মীয়া নন ত?"

সুবীর বলিল, "মায়ের আত্মীয়াদের সকলকেই বেশ ভালো ক'রে জানি, তাঁরা কেউ এত দূরে আসেননি সেটা ঠিক। আর এঁকে ত অবিবাহিতা মনে হচ্ছে। হিন্দু সমাজে এতবড় মেয়ে অবিবাহিতা থাকতে পারে না। মায়ের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবই ত গোঁড়া হিন্দু।"

ইন্দ্র বলিল, "তোমরা যাঁর রূপের সমালোচনা এত তন্ময় হয়ে করছ, তিনি বোধহয় বেশী খুসী হচ্ছেন না। তাঁর এস্কর্টটি ত রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। শেষে অহিংসা-ধর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তকের মন্দিরে কি মাথা-ফাটাফাটি করতে চাও?"

সুবীর লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ইন্দ্রের কথাটা ঠিকই। মহিলাটি একটু যেন দ্রুতগতিতেই দলবল লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গী যুবকটি মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া সুবীর এবং তাহার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সেও মেয়েদের অনুসরণ করিয়া আগাইয়া গেল।

সুবীর বলিল, "উনি কে, না জেনে আমার কিন্তু এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।"

চন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এই রে, হয়েছে! শেষে বর্ম্মায় এসে মরলে?"

ইন্দ্র বলিল, "বলেন ত ওঁদের ফলো করি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে, উনি কে, কোথায় থাকেন, কি করেন, সব বার ক'রে দেব।"

সুবীর বলিল, "তোমরা বাজে ইয়াকি মারতে পারলে আর ছাড় না। উনি খুবই সুন্দরী তা ঠিক, কিন্তু এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্যটার জন্যেই আমার এত কৌতূহল হচ্ছে। তা না হ'লে স্বয়ং পদ্মিনীকে দেখলেও আমি তাঁর পিছনে দৌড়োতাম না। আমি মানুষ, জানোয়ার নই।"

ইন্দ্র কোনরকমে হাসি চাপিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই না-হয় হ'ল। কিন্তু চলুন এখন বেরোনো যাক্। রাত হয়ে এল।"

সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন পৃথিবীর উপর নামিয়া পড়িয়াছিল। প্যাগোডার চূড়া ঘেরিয়া রত্নহারের মতো আলোকমালা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যাত্রীর দল এবার ফেরার দিকে মন দিল।

সুবীররা বাহিরে আসিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিড়ে সামনে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য। মোটরের সার খানিক সরিয়া না গেলে, ঘোড়ার গাড়ীর সামনে আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা মিনিট-কয়েক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ চন্দ্র বলিল, "ঐ দেখ, তোমার মনোমোহিনীও দলবল নিয়ে বেরিয়েছেন।"

সুবীর ফিরিয়া তাকাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বৈদ্যুতিক আলোক-প্লাবিত চত্বরে ইহাকে যেন ইন্দ্রাণী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এত সুন্দর মানুষে হয়?

ইন্দ্র বলিল, "যেই গাড়ীতে উঠবে, আমি সেটার নম্বর টুকে রাখব। ট্যাক্সি হ'লেই বিপদ্। প্রাইভেট কার হ'লে এদের পরিচয় আবিষ্কার করতে আমাকে বেশী দেরি করতে হবে না।"

সুবীর বলিল, "দেখ, তোমার সপ্তাহে পাঁচদিন সিনেমায় যাওয়াটা এইবার কাজে লাগবে।"

ইন্দ্র হাসিয়া মনে মনে বলিল, এইবার পথে এস বাছা। ভারি যে শুকদেব গোস্বামী সাজছিলে! মুখে বলিল, "কি বকশিশ দেবেন?"

সুবীর বলিল, "তোমার মেয়ের বিয়েতে হাজার টাকা যৌতুক।"

ইন্দ্র বলিল, "গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেল। মেয়ে কোথায় তার ঠিক নেই। এই যে তাঁরা আসছেন। আমি চললাম ডিটেকটিভী করতে।"

ইন্দ্র ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন সরিয়া পড়িল। সেই দলটি উহাদের সম্মুখ দিয়া গল্পহাসির হিল্লোল তুলিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

সুবীর বলিল, "এই জায়গাটাতেই দেখবার কিছু নেই ভেবেছিলাম, কিন্তু ভগবান্ সব চেয়ে বড় দেখবার জিনিষই এখানে জমা ক'রে রেখেছিলেন দেখছি।"

চন্দ্র বলিল, "এরই মধ্যে এতখানি? নাঃ, তুমি জগতে রোমান্স না ক'রে ছাড়বে না।"

এমন সময় গাড়োয়ানের চীৎকারে তাহাদের দাঁড়ানোর পর্ব্ব শেষ হইল। নামিয়া গিয়া দুজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

২০

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিবার আগে ইন্দ্রের সঙ্গে আর কথা বলিবার সুবিধাই সুবীরের ঘটিয়া উঠিল না। তাহারা হোটেলে আসিয়া খাইয়া দাইয়া, গল্প করিয়া, হাই তুলিয়া, অস্থির হইয়া উঠিল, তবু শ্রীমান্ ইন্দ্রের দেখা নাই। চন্দ্র বলিল, "গেল কোথায় ছোঁড়া! এই বিদেশ বিভূঁয়ে বেরোলেন তিনি য়্যাডভেঞ্চার করতে। শেষে কোন বেটা মাতাল বর্ম্মার ছোরা খেয়ে মরবে।"

সুবীরও একটু দমিয়া গেল। অচেনা স্থানে এমনভাবে ছেলেটাকে না পাঠাইলেই হইত। তাহারও তখন যেন মাথার ঠিক ছিল না। সুন্দরী অপরিচিতার পরিচয় লাভের আগ্রহটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছিল।

অবশেষে হাল ছাড়িয়া তাহারা যখন পুলিশে খবর দিবার জন্য ম্যানেজারের ঘরের দিকে প্রায় চলিয়াছে, এমন সময় ইন্দ্র হুড়মুড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

চন্দ্র বলিল, "এতক্ষণ ছিলি কোথায়? ক'টা বেজেছে তার খোঁজ রাখিস্?"

ইন্দ্র বলিল, "সাড়ে-দশটা বাজে। এখনি ওরা খাবার ঘর বন্ধ করবে। যা-হোক দুটো খেয়ে আসি। পেটটা একেবারে চোঁ চোঁ করছে।" সে আবার দুড় দুড় করিয়া নামিয়া গেল।

চন্দ্রের উৎকণ্ঠা দূর হইতেই সে বিনা-বাক্যব্যয়ে শুইয়া পড়িল। সুন্দরীর খোঁজ লইতে তাহার বিশেষ-কিছু আগ্রহ ছিল না, কারণ তাহার বিবাহ বহুকাল হইয়া গিয়াছে। সুবীরও দেখাদেখি শুইল; মনে ভাবিয়া রাখিল, সে জাগিয়াই থাকিবে, ইন্দ্রটা খাইয়া আসুক না। কিন্তু শারীরিক ক্লান্তিতে তাহার চোখে কখন যে নিদ্রা আসিয়া পড়িল, তাহা সে ভাবিয়াও পাইল না।

ইন্দ্র খাইয়া আসিয়া দেখিল, দুই বন্ধু মনের আনন্দে ঘুমাইতেছে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "নাঃ, বাঙালীর ছেলের ধাতে রোমিও হওয়া পোষাবে না। যাক্ আমিও একটু নাক ডাকাই, কাল সকালে উঠে খোঁজ-খবর দেওয়া যাবে।" সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে সুবীরই উঠিল সবার আগে। রাত্রেও দুতিনবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল। তবে তখন বেচারা ইন্দ্রকে উঠানো বড় বেশী কবিয়ানা হইত বলিয়া সে-চেষ্টা না করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সকালে উঠিয়াও তখনই তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোনো উপায় পাইল না, ইন্দ্র যেন জোর করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। সুবীর কাল রাত্রে ঘুমাইয়া যে অন্যায়টা করিয়াছে, সে আজ দিনে ঘুমাইয়া যেন তাহার শোধ দিবে।

যাহা হউক, জোর করিয়া আর মানুষ কত ঘুমাইতে পারে? আন্দাজ

সাড়ে-আটটায় ইন্দ্র চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া বসিল। সুবীর বলিল, "ভালো ঘুম হে তোমার! আর যে উঠবে সে আশা আর ছিল না।"

ইন্দ্র বলিল, "আহা, নিজে ত কত চমৎকার! একেবারে আদর্শ প্রেমিক! আমাকে লেডীলভের সন্ধানে পাঠিয়ে নিজে দিব্যি নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিলেন। যেন সব গরজ আমারই। ভদ্রমহিলা শুনলে ত ছুটে এসে এখনি আপনার গলায় মালা পরিয়ে দেবেন।"

সুবীর বলিল, "তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে, তুমি কিছু সন্ধান তাঁর পেয়েছ এবং তিনি এখন পর্য্যন্ত কারো গলায় মালা পরাননি।"

ইন্দ্র বলিল, "গাছে না উঠতে এক কাঁদি! ভারি যে উৎসাহ দেখ্‌ছি? যদি বলি, তিনি এক ভদ্রলোকের গিন্নি, চার ছেলে, দুই মেয়ের মা?"

সুবীর বলিল, "বলতে পার বৈ কি। কিন্তু তুমি বললেই যে আমি বিশ্বাস করব, এমন গ্যারান্টি দিতে পারি না। বাঙালীর ঘরে চার-ছেলে দুই মেয়ের মাদের কেমন যে মূর্তি হয়, জান্‌তে আমার বাকি নেই।"

চন্দ্র বলিল, "বড্ড যে বাড়ালে হে! এত আবার আমাদের ধাতে পোষায় না। তুমি বাঙালীর ছেলে, ইটালিয়ান্‌ও নয়, স্পানিয়ার্ডও নও, এমন 'রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনো' হতে গেলে ঠিক মানায় না।"

সুবীর বলিল, "নাই মানাক। বাঙালীর ছেলেকে যা যা মানায়, তাই ক'রে যদি জীবনটা কাটাতে হয়, তা হলে এখনি গঙ্গা ব'লে ঝুলে পড়লেই হয়। কিন্তু বাজে বক্‌তে গিয়ে আসল কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। তুমি কি রিপোর্ট দেবে দাও না হে?"

ইন্দ্র বলিল, "আপনার চিত্তহারিণীটি বাস করেন,—নং গলির,—নং বাড়ীতে। খুব সম্ভব তিনি ব্রাহ্ম কিম্বা খ্রীষ্টান, ঐ বাড়ীর বৌ-ঝিগুলির গভর্ণেসের কাজ করেন। বাপ-মায়ের নাম রেঙ্গুনে সম্ভব কেউ জানে না, তা না হ'লে সেগুলোও জোগাড় ক'রে আন্‌তাম। তিনি বি-এ পাশ, নাম কৃষ্ণা রায়।"

সুবীর বলিল, "যাক্, আমাদের দেশেও শার্লক হোমস্ জন্মাতে পারে দেখা যাচ্ছে। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে চেক্ আজই লিখে রাখব। চা-টা খেয়ে একবার—নং গলির দিকে যাত্রা করতে হবে তা হলে।"

চন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "শেষে বিদেশে এসে কি বেঘোরে মারা পড়তে চাও? কি সব বাজে ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ?"

সুবীর বলিল, "ছেলেমানুষেই ত ছেলেমানুষী কর্‌বার যথার্থ অধিকারী। আমি না ক'রে আমাদের বুড়ো দেওয়ানজী কর্‌লে অবশ্য তুমি আপত্তি করতে পারতে।"

চন্দ্র বলিল, "যা খুসি কর গিয়ে। আমি ত আর তোমার অভিভাবক নয়, তোমাকে আটকে রাখবার কোনো রাইট আমার নেই।"

সুবীর হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। অপরিচিতা সুন্দরীকে আর একবার না দেখিয়া সে ব্রহ্মদেশ ছাড়িবে না, একরকম স্থিরই করিয়াছিল। ইন্দ্র বলিল, "আচ্ছা সে যা হবার হবে, এখন চা-টা খাও ত? সেটা ঠাণ্ডা ক'রে লাভ কি?"

চা খাইয়া চন্দ্র বলিল, "আমি চললাম একটু বাজার ঘুরতে, দুচারটে জিনিষপত্র কিনতে হবে। ইন্দ্র, তুই কি সুবীরের সঙ্গে যাবি নাকি?"

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না, শেষে যদি তাঁর আমাকেই বেশী পছন্দ হয়ে যায়!" সে একটা ছোট ক্যামেরা লইয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। চন্দ্র চিঠিপত্র লেখা শেষ করিয়া, কি কি জিনিষ কাহার কাহার জন্য কিনিবে তাহা স্থির করিয়া এবং তাহার একটা তালিকা করিয়া, উপযুক্ত টাকা লইয়া তবে বাহির হইল। সুবীর সকলের অলক্ষ্যে সর্ব্বাগ্রেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া সে এক রিক্‌শতে উঠিয়া বসিল। ঠিকানা বলিয়া দিতেই রিক্‌শওয়ালা ক্ষিপ্র সলম্ফ গতিতে দৌড়িয়া চলিল। রাস্তাঘাটগুলি মনোরম বটে, রঙের বাহারে বাঙালীর চোখ একটু জুড়ায়। বাংলা দেশের মানুষগুলি অন্ততঃ ইহাদের দেখিয়া যদি একটু ফিট্‌ফাট হইতে এবং রঙীন কাপড় পরিতে শেখে তাহা হইলেও ঢের লাভ। কিন্তু সেদিকে তাহাদের

কোনো উৎসাহই দেখা যায় না। কেবল ব্রহ্মদেশকে দোহন করিয়া রৌপ্যরস সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়।

গলির মোড়ে আসিতেই সুবীর রিক্‌শ ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। বড় বড় বাড়ী অনেকগুলিই এ গলিতে আছে দেখা গেল। সুবীর নম্বর দেখিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইন্দ্র তাহাকে যে নম্বর বলিয়া দিয়াছিল, তাহার সামনে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। নীচের তলায় ত দেখা যাইতেছে দোকান। বাড়ীর অধিকারী বোধহয় দোতলায় থাকেন। উপরের বারাণ্ডায় কয়েকটা ছেলেমেয়ে মহা চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছে, একটি বড় মেয়ে দাঁড়াইয়া সকলকে নির্ব্বিচারে বকুনি ঝাড়িয়া চলিয়াছে। এ মেয়েটিকেও সেই প্যাগোডা ভ্রমণকারিণীদের দলে সে দেখিয়াছে বলিয়া সুবীরের মনে পড়িল। এই বাড়ীই বটে তাহা হইলে। কিন্তু যাহার সন্ধানে এতদূরে সে ছুটিয়া আসিল, তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিরূপে?

বিধাতা বোধহয় সেদিন সুবীরের প্রতি সদয় ছিলেন। মিনিট-পাঁচ এদিক্-ওদিক্ ঘোরাঘুরি করিতেই রাস্তার উপরের কোনো একটি ঘরের জানালা সশব্দে খুলিয়া গেল। বাতায়নপথে সেই মুখটিই ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া, সুবীর নিজের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিল। মেয়েটি ঘর গুছাইতেছিলেন বোধহয়। একটি জয়পুরী ফুলদানী হইতে পুরানো শুকনো একগুচ্ছ নীল রংএর ফুল তিনি বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। তারপর জানালা বন্ধ না করিয়াই সেখান হইতে সরিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই অন্য কোনো কাজে তাঁহাকে আবার জানালার কাছে আসিতে হইল। এবার কিছু বেশীক্ষণ দাঁড়ানোর জন্যে হঠাৎ তাঁহার চোখ গিয়া পড়িল সুবীরের উপর। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মেয়েটি সরিয়া গেলেন।

সুবীর আর দাঁড়াইয়া থাকা উচিত মনে করিল না। পথের ধূলা হইতে সেই পরিত্যক্ত নীল ফুলের গুচ্ছটি উঠাইয়া লইয়া সে গলি পার হইয়া চলিয়া

গেল। তখনই হোটেলে ফিরিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। ইন্দ্র বা চন্দ্র কেহই তখনও নিশ্চয়ই ফিরে নাই। রিকৃশ চড়িতেও তাহার ইচ্ছা করিল না। পায়ে হাঁটিয়া সে এ পথ হইতে ও পথ, এ গলি হইতে ও গলি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ এমনভাবে জড়াইয়া পড়িবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। অথচ এই মেয়েটিকে দেখার পর হইতে, কিছুতেই সে তাহাকে মন হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না। কে সে, তাহা স্ববীর জানে না; কেন তাহাকে দেখিবার, সকল দিক্ দিয়া তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিবার এমন একটা প্রবল তৃষ্ণা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাও সে স্পষ্ট করিয়া বোঝে না। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের শেষ নাই। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ইহার! ঠিক যেন সঞ্চারিণী অগ্নিশিখা! আর তাহার মাতার মুখচ্ছবি এমন করিয়া সে চুরি করিল কিরূপে? এ কি রক্তেরই আকর্ষণ যাহা তাহার শিরায় শিরায় এমন অধীর ঝঙ্কার তুলিয়াছে? এ কি তাহারই কোনো হারানো আত্মীয়া? এ কি তাহার আত্মীয়েরও অধিক কেহ? দুদিনের দেখা মুখ, কেমন করিয়া তাহার চিরদিনের পরিচিত সকল মুখগুলিকে আড়াল করিয়া বসিল?

ভাবিতে ভাবিতে সে কোথায় যে আসিয়া জুটিল, তাহার ঠিকানা নাই। একটু সচেতন হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সে বড় একটি রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, কিন্তু স্থানটা মোটেই তাহার পরিচিত নয়। রোদও নিতান্ত মন্দ হয় নাই, মাথাটা চন-চন করিতেছে। একখানা গাড়ী ডাকিয়া সে উঠিয়া বসিল। হোটেলের ঠিকানা বলিয়া দিতেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

হোটেলে পৌছিয়া দেখিল, ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছে, চন্দ্রের তখনও দেখা নাই। স্ববীরকে দেখিবামাত্র ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি, আপনার কোয়েস্‌ট্ সার্থক হ'ল?"

স্ববীর হাসিয়া বলিল, "খানিক হ'ল বৈ কি!"

ইন্দ্র বলিল, "যাক, এবার তা হ'লে নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরতে পারবেন।"

সুবীর বলিল, "দেশে ফিরব বটে, কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত মনে যে, তা মনে হয় না।"

হোটেলের একটা চাকর আসিয়া এই সময় একতাড়া চিঠি দিয়া গেল। চন্দ্র এবং ইন্দ্রের নামে বেশ মোটা মোটা চিঠি, খান-দুই করিয়া। সুবীরের কেবল একখানি শীর্ণ চিঠি, উপরে তাহার মায়ের কাঁচা হাতের ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা।

ইন্দ্র চিঠি পাইবামাত্র সরিয়া পড়িল। সুবীর বলিল, "তোমার দাদার গুলোও নিজের সেফ্ কীপিংএ রাখ, আমি হয়ত আবার খানিক পরেই বেরিয়ে যাব। আমার চিঠি পড়তে বেশী সময় লাগবে না।"

তাহার মা পুরী গিয়া বেশ ভালোই আছেন। মেজদিদি এবং তাঁহার বৌঝিরা তাঁহাকে খুবই যত্ন করিতেছে। সমুদ্রে দু'তিন দিন স্নান করিয়াছেন, কিন্তু হার্টের অসুখ বাড়ে বলিয়া আর যান নাই। মন্দির দর্শন করিতে প্রায় রোজই যান। ভবানীর শরীর বড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া বড় চিন্তান্বিত আছেন। সে যে আর সারিবে বলিয়া ভরসা হয় না। এক মাসেই যেন তাহার দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। ভবানীর চিকিৎসার জন্য হয়ত তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিতে হইবে, তাহা না হইলে মেজদিদিরা আরো একমাস থাকিতে চান। ভবানী প্রায়ই সুবীরের কথা জিজ্ঞাসা করে। সেও যেন বুঝিতে পারিতেছে, যে, তাহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। সকলের কাছে, সকলের মধ্যে তাই সে থাকিতে চায়। সুবীর শীঘ্রই কলিকাতা ফিরিলে ভালো।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুবীর ভাবিল, ছুটি শেষ হইতে বেশী দেরিও নাই, ফিরিয়া গেলে খুব যে মন্দ হয় তাহা নয়। কিন্তু যাইবার আগে ঐ মেয়েটি কে, কাহার মেয়ে, সব জানিতে পারিলে ভালো হইত। কাহার কাছেই বা খবর পাওয়া যায়? এখানে তাহার চেনা-শোনা বাঙালীও কেহই নাই।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, এখানে আসিবার আগে দেওয়ানজী তাহাকে নিজের এক পরিচিত রেঙ্গুন-প্রাবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। গোলমালে সে-কথা তাহার মনেও ছিল না। ইহাকে দিয়া কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে। সে তাড়াতাড়ি স্যুটকেস খুলিয়া, কাপড়-চোপড়ের রাশ উলট-পালট করিয়া চিঠিখানা বাহির করিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াই সে ইহার সন্ধানে বাহির হইবে স্থির করিয়া রাখিল।

চন্দ্র এমন সময় একটা পোঁটলা, ব্রাউন কাগজে জড়ানো একরাশ জিনিষ, গোটা-দুই কাগজের বাক্স, ইত্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কি নিয়ে এলে হে? বাজার উজাড় ক'রে এনেছ দেখছি!"

চন্দ্র বলিল, "উজাড় না ক'রে আর কি উপায় বল? বাড়ীর লোক ত কমগুলি নয়? যার জন্যেই কিছু না নেব, তিনিই গাল ফুলিয়ে থাকবেন।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "বৌএর জন্যে কি নিলে?"

চন্দ্র কাগজের মোড়ক খুলিয়া দেখাইল, খানিকটা উজ্জ্বল রঙের রেশমী কাপড়। দুই টুকরা দুই রঙের। চন্দ্র বলিল, "দুই বৌএর জন্যে দু-টুকরা নিলাম। মায়ের জন্যে একটা এ-দেশী পানের বাটা, আর ছোট ভাইটার জন্যে এক জোড়া চটি নিলাম। বাবার জন্যেও তাই, যদিও তিনি এত বাহারে চটি পর্‌বেন কিনা জানি না।"

সুবীর বলিল, "আমিও ত কেনার খাতিরে কিন্‌লাম কিছু কিছু, কিন্তু কাকে যে দেব তার ঠিকঠিকানা নেই। আমার মায়ের দশা আর কি? পুজোর সময় কাপড় কেনা শাস্ত্রসঙ্গত ব'লে তিনি একগাদা কাপড় কেনেন, তারপর সেগুলি যে কার ঘাড়ে চাপাবেন, তাই ভেবে পান না।"

চন্দ্র বলিল, "চল, দুপুরে একটু লেক্ ঘুরে আসা যাক্। পরশুই ত যাচ্ছি আমরা?"

সুবীর বলিল, "এখন অবধি তাই ত ঠিক। তোমরা যাও আমি পরে গিয়ে জুটব। আমার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু দেখা কর্‌তে হবে।

আসবার সময়, দেওয়ানজী এঁর কাছে ইন্ট্রোডাক্শন্ লেটার দিয়েছিলেন, সেটা একেবারেই কাজে না লাগালে মোটেই ভদ্রতাসঙ্গত হবে না।"

চন্দ্র স্নান করিতে চলিয়া গেল। সুবীর স্থির করিল, আগে দেখা করাটা সারিয়া আসা যাক্। তাহার পর স্নানাহার করিয়া লেকে ভ্রমণ করিতে গেলেই হইবে।

গাড়ী ডাকিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিকানা খুঁজিয়া যাইতে তাহার বেশ খানিক দেরি হইয়া গেল। ভদ্রলোক থাকেন একেবারে সহরের এক প্রান্তে। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন তিনি বাড়ী ছিলেন, কি-একটা বর্ম্মা পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহার অফিস বন্ধ ছিল। সুবীর বাহিরের দরজার কড়া নাড়িতেই, ছোট একটি ছেলে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

ভিতরে বসিয়া দু-এক মিনিট এদিক্ ওদিক্ তাকাইবার পর গৃহস্বামী বাহির হইয়া আসিলেন। সুবীর দেওয়ানজীর চিঠিখানি তাঁহাকে দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চিঠি পড়া শেষ হইতেই বাড়ীতে একেবারে সোরগোল পড়িয়া গেল। কি করিয়া যে এমন গণ্যমান্য অতিথির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা হইবে, তাহা যেন কেহ ভাবিয়া পায় না। সুবীর ত অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার আদর-অভ্যর্থনার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সে বুঝিল, কেবল ভদ্রতার আপ্যায়ন গ্রহণ করিয়াই তাহাকে বিদায় দিতে হইবে। এ বাড়ীতে তাহার সমবয়সী কোনো যুবক থাকিতে পারে, এই আশাতেই সে আসিয়াছিল। কিন্তু দুচারটা বাচ্চাকাচ্ছা ছাড়া আর কাহাকেও দেখা গেল না।

বেশীক্ষণ বসিয়া কোনোই লাভ নাই দেখিয়া, সুবীর যখন উঠিবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় সেই প্যাগোডায় দৃষ্ট যুবকটি হুড়মুড় করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। গৃহকর্ত্তা তাড়াতাড়ি ঘটা করিয়া সুবীরের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

সে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, "মশায়কে আগে কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে।"

সুবীর বলিল, "দেখে থাক্‌বেন প্যাগোডাতে।"

বিপিন বলিল, "তাই বটে। আপনি এখানে আর কতদিন আছেন?"

সুবীর মনে মনে হাসিয়া বলিল, "আর বেশীদিন নয়, পরশুর ষ্টীমারেই যাচ্ছি।"

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "রেঙ্গুন দেখা হয়ে গেল?"

সুবীর বলিল, "এখানে আর দেখবার আছে কি? একটা যা দেখবার জিনিষ তা দেখা হয়ে গেছে।"

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তা ঠিক। এক প্যাগোডা ছাড়া এখানে দেখবার মতো কিছু নেই।"

সুবীর উঠিয়া পড়িল, বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বিপিনও তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কালকের দিনটা কি করছেন?"

সুবীর বলিল, "কিছু ঠিক করিনি।"

বিপিন বলিল, "আচ্ছা, কাল সকালে আপনাকে নিয়ে একটু বেরোব, এধার-ওধার ঘুরিয়ে আন্‌ব। আপনার সঙ্গে একটু কথা কইবারও সুযোগ পাওয়া যাবে।"

সুবীর ভাবিল, মন্দ নয়। শেষে ইহারই শরণ লইতে হইবে নাকি? দেখা যাক্ ব্যাপার কতদূর গড়ায়। তখনকার মতো সে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিল।

২১

সকাল হইতেই সুবীর বসিয়াছিল বিপিনের আশায়। যদিই কোনো খবর এই ছেলেটির কাছে পাওয়া যায়। আর দু'-একদিন আগে ইহার সহিত দেখা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু হাতে মাত্র এখন একটা দিন। ইহার মধ্যে কিই বা করা যায়?

বিপিন আসিয়া ঢুকিল। বলিল, "আমি আপনাকে বসিয়ে রেখেছি নাকি? আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে?"

সুবীর বলিল, "হয়েছে একরকম। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্।"

দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। রেঙ্গুনে পারৎপক্ষে কেহ পায়ে হাঁটে না, কাজেই ইহারাও রিক্‌শ চড়িয়াই চলিল। প্রথমে গিয়া উপস্থিত হইল এক চায়ের আড্ডায়। বিপিন বলিল, "এই জায়গাটাকে আমরা খুব patronise ক'রে থাকি। অন্যান্য জায়গার চেয়ে এইখানেই মুখরোচক খাবার পাওয়া যায় বেশী। দিশি, বিলিতী সবই এরা বানায় ভাল।"

সুবীর চাখিয়া দেখিল, ইহাদের সুনাম নিতান্ত অকারণে হয় নাই।

কিন্তু ভালো খাবার খাওয়ার চেয়েও তাহার জরুরী প্রয়োজন ছিল। সে তাড়াতাড়ি কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়রা এখানে কতদিন হ'ল আছেন?"

বিপিন বলিল "জন্মাবধিই একরকম। জন্মটা অবশ্য বাংলা দেশেই হয়েছিল, কিন্তু আর-সব কিছু এখানেই। এখন দেশে গেলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "পড়াশোনাও সব এইখানেই করেছেন?"

বিপিন বলিল, "এখানেই। পড়াশোনা কপালগুণে খুব বেশী করুতে হয়নি। জ্যাঠার কাঠের কার্‌বার নিয়েই তার চেয়ে বেশী দিন কেটেছে।"

খানিক কথা বলিয়াই সুবীর বুঝিল, ইহার নিকট কৃষ্ণার কোনো খোঁজ পাওয়া যাইবে না। বিপিন তাহাকে খোঁজ দেওয়ার বদলে তাহার কাছ হইতে খোঁজ লইতেই বেশী ব্যস্ত। সুবীর কে, কোথায় থাকে, কি কারণে বর্মায় আসিয়াছে, সবই সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল। সুবীর বুঝিল, তাহার সম্বন্ধে এই যুবকটির মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহের উদয় হইয়াছে।

উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, "সহরটা একটু ঘুরে নেওয়া যাক। আমার হাতে বেশী সময় নেই।"

ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একসময় বিপিন বলিল, "আপনার কল্‌কাতার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখব। অনেক সময় কল্‌কাতায় চিঠি লিখবার দরকার অনুভব করি, কিন্তু কাকে লিখব ভেবে পাই না।"

সুবীর ভাবিল, মন্দ কি? চিঠিপত্রের মধ্যে কিছু খবর মাঝে মাঝে পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। সে নিজের ঠিকানাটা লিখিয়া দিয়া বলিল, "আপনারটাও দিয়ে দিন, চিঠির উত্তর ত দিতে হবে?"

চায়ের আড্ডা ছাড়িয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। বিপিন নিজের কথা রাখিল বটে। কত জায়গায় যে সুবীরকে ঘুরাইল তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। তাহার ভিতর দোকান অনেকগুলি থাকাতে, সুবীরের মনিব্যাগ খানিকটা খালি না হইয়াই পারিল না। উপহার দিবার লোক থাকিলে আরো ঢের জিনিষ কেনা চলিত, কিন্তু বিধবা মাতা ভিন্ন তাহার নিকট-আত্মীয় বা আত্মীয়া কেহই নাই। বন্ধু-বান্ধব আছে বটে, কিন্তু পুরুষ মানুষকে উপহার দিবার যোগ্য জিনিষ পাওয়াও শক্ত, এবং তাহাদের উপহার দিতে যাওয়াটাও কেমন যেন ন্যাকামীর মতো দেখায়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বিপিনও ছোটখাটো অনেক জিনিষ কিনিয়া ফেলিল। সুবীর জিজ্ঞাসা না করিতেই বলিল, "বাড়ীতে বোন, ভাজ, ভাইঝি, প্রভৃতি জীবের অভাব নেই, একজনকে দিলেই সকলকে দিতে হবে।"

সুবীর ভাবিল, "আর-একজনও আছেন বাড়ীতে। অবশ্য তাঁকে উপহার দেবার অধিকার এখনও তোমার হয়েছে কিনা জানি না।" আশেপাশে অসংখ্য সুন্দর সুশোভন জিনিষ দেখিয়া তাহার কেবলই লোভ হইতে লাগিল, সব উজাড় করিয়া কিনিয়া একজনের করকমলে তুলিয়া দিয়া আসে। কিন্তু জগতে বেশীর ভাগ মনের ইচ্ছা মনেই থাকিয়া যায়।

বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিপিন বলিল, "এরপর বাড়ী ফেরা যাক। না হ'লে তাড়া খেতে হবে।"

সুবীর বলিল, "চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি সোজা চ'লে যাব। আমার অমনি দুচারটা রাস্তা দেখা হয়ে যাবে আরো।"

বিপিন মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "রাস্তা দেখবার জন্যে ত তোমার ঘুম হচ্ছে না।" মুখে বলিল, "বেশ ত!"

আবার সেই নূতন-পরিচিত, অথচ যেন চিরদিনের পরিচিত গলিতে সুবীর আসিয়া ঢুকিল। সে-ই বাড়ীর সাম্‌নে রিক্‌শ দাঁড় করাইয়া বিপিনকে নামাইয়া দিল। বিপিন নমস্কার করিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতেই একবার উপর দিকে তাকাইয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই।

ইচ্ছা করিতেছিল, আরো দু-চার মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখে, যদিই কেহ বাহির হয়। কিন্তু কোনো অছিলা নাই, শুধুশুধু ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে লোকে মনে করিবে কি। অগত্যা তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

বিপিন টপাটপ্‌ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াই পড়িল গৃহিণীর সামনে। তিনি বিরক্তির স্বরে উঁচু গলায় বলিলেন, "হ্যাঁরে, কোনোদিন কি ঠিক সময় নাইতে খেতে নেই? এরকম করলে শরীর টিঁক্‌বে?"

"এখন পর্য্যন্ত না টিঁক্‌বার কোনো লক্ষণ দেখছি না," বলিয়া বিপিন নিজের ঘরের দিকে দৌড় দিল। তড়িৎ ঘরের মধ্যে মহা ঝাড়-পোঁছের ধুম বাধাইয়া দিয়াছে দেখা গেল। তাহার চুল উবু ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, পরণে ময়লা সেমিজ এবং বঙ্গলক্ষ্মী মিলের শাড়ী, এক হাতে ঝাঁটা, এবং আর-এক হাতে ময়লা ঝাড়ন।

বিপিন যে মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে আসিয়াছিল, ইহার সঙ্গে তাহার এমনই বিরোধ বাধিল যে, সে অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়া বসিল, "দূর! কি পেত্নী সেজে রয়েছিস? তোরা দে'খেও শিখিস্‌ না।"

তড়িৎ আসিয়াছিল তাহারই উপকার করিতে। এমন অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া সেও বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, ঘর ঝাঁট দিতে কি আবার নূরজাহান সেজে কেউ আসে নাকি? দে'খে শিখব কি শুনি? কৃষ্ণাদি যদি ঘর ঝাঁট দিতেন, তা'হলে তাঁর কাপড়ও খানিকটা ময়লা না হয়ে যেত না। ধুলো-বালি ত আর কাউকে খাতির ক'রে দূরে স'রে থাক্‌বে না?"

বিপিন বলিল, "যাঃ যাঃ, নিজের দোষ মেয়েরা কখনও স্বীকার করতে জানে না। তিনি ঘর ঝাঁট দেন না ত কি তুই রোজ গিয়ে তাঁর ঘর ঝাঁট দিয়ে আসিস্?"

তড়িৎ একটু ভালোমানুষ গোছের। তাহার বয়সের অনেক মেয়ে যে-সব কথা চট্ করিয়া বোঝে, সে তাহার অনেকগুলিই মোটে বোঝে না। সুতরাং বিপিনের উদ্দেশ্য সে বিফল করিয়া দিল। বলিল, "কেন, আমি ছাড়া ঘর ঝাঁট দেবার কি লোক নেই? যারা অন্য ঘর ঝাঁট দেয়, তারা তাঁর ঘরও ঝাঁট দেয়। কিন্তু বাজে কথা রাখো দিকিন্। আজ না আমাদের সাড়ে-তিনটার সময় বায়োস্কোপে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছ? আমি স্কুলে সুদ্ধ গেলাম না, সেইজন্যে। খুব ভালো 'ফিল্ম্' আছে না আজ?"

বিপিন বলিল, "সাড়ে-তিনটা বাজতে এখনও ঢের দেরি। যা দেখি, ঠাকুরকে বল্, আমার ভাত দিতে।"

তড়িৎ বলিল, "সে কি, স্নান না ক'রেই খাবে নাকি?"

বিপিন বলিল, "তুই জ্যাঠাইমার এক অবতার হয়েছিস্। বাপ রে বাপ! বিশ্বের সব খোঁজে তোর দর্কার। তুই যা না, ভাত দিতে বল্। স্নান, আমি যখন হয় কর্ব। তুই নিজের চর্কায় একটু তেল দে গিয়ে। এই রকম সাজ ক'রে যেন বায়োস্কোপে যাত্রা করিস্ না।"

তড়িৎ বলিল, "আহা, তাই যেন আমি যাই আর কি? সাজি না সাজি, সে আমার খুসি, কিন্তু আমি নোংরা, কেউ এ কথা বলে না।"

বিপিন বলিল, "আমি বলি।"

তড়িৎ দেখিল বকাবকি করিয়া লাভ নাই, বিপিনদা যখন একবার তাহার পিছনে লাগিয়াছে, তখন সহজে ছাড়িবে না। মাঝে হইতে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া তাহার হয়ত বায়োস্কোপে যাওয়া হইবে না। অতএব ঝাড়ন দিয়া শেষ এক ঘা চেয়ারের উপর মারিয়া, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমিয়া বসিয়া শেলাই করিতেছিল, সেখানে ঝড়ের মতো ঢুকিয়া বলিল, "বিপিনদাটা একেবারে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেলে।"

অমিয়া শেলাই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কি হাড় জ্বালাল আবার ?"

তড়িৎ বলিল, "আমাকে সারাক্ষণ মেম সেজে থাকতে হবে, তা না হ'লেই আমার পেছনে লাগবে। দেখ ত, কি জ্বালা! সবাই কৃষ্ণাদির মতো সারাক্ষণ ফিট্‌ফাট্ থাক্‌তে পারে নাকি ?"

প্রতিভা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তোকে কি কৃষ্ণাদির মতো থাকতে কেউ ব'লেছে নাকি ? ঠাকুরপো বুঝি ?"

তড়িৎ বলিল, "আবার কে ? ঐ বলাই হ'ল। সারাক্ষণ আমাকে খোঁচাচ্ছে আমি নাকি দেখেও শিখি না।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "সে ত বল্‌বেই। তার চোখে এখন কৃষ্ণাদি ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না।"

অমিয়া অস্ফুট তর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই যাঃ, ওর সাম্‌নে যা তা বকো কেন ? তারপর মার কাছে গিয়ে বলুক, আর বেধে যাক এক ঘোঁট।"

প্রতিভা থামিয়া গেল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কথাটা গৃহিণীর কানে না হোক, কৃষ্ণার কানে ঠিকই পৌঁছিল। কৃষ্ণা ঘরে নাই ভাবিয়া সকলে বেশ জোরেই কথা বলিতেছিল, এমন সময় মখমলের চটি পায়ে নিঃশব্দচরণে কৃষ্ণা আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। পাশের বাড়ীর মেয়েরা খুব ধরাধরি করাতে সে তাদের একটা শেলাইয়ের প্যাটার্ণ আঁকিয়া দিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিতে প্রতিভার শেষ কথাটা তাহার কানে সোজা গিয়ে ঢুকিল। কাহার চোখে যে কৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না, তাহা বুঝিতে অবশ্য তাহার বিন্দুমাত্রও দেরি হইল না। তাহার কানের কাছটা একটু লাল, এবং ভ্রূ দুটি একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রেম নিতান্তই সাধারণ জিনিষ। অথচ বাঙালী গৃহস্থের সংসারে ইহাই একান্ত অসাধারণ জিনিষ। বিপিন কিছু কৃষ্ণার পায়ে গড়াগড়ি যাইতেছে না, বা গলা ফাটাইয়া প্রেমের বক্তৃতা করিতেছে না, তবু যেটুকু পক্ষপাতিত্ব তাহার কথাবার্ত্তায় প্রকাশ না পাইয়া পারে না,

যেটুকু পূজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে, তাহা লইয়াই ষোলআনা গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। গৃহিণী অবশ্য এখন পর্য্যন্ত কিছু সন্দেহ করেন নাই। চাকরবাকরকে বকিয়া, বৌঝিকে শাসন করিয়া, বাজারের পয়সা কে ক'টা চুরি করিল তাহার খোঁজ লইয়া তাঁহার আর সময় থাকে না। কিন্তু বৌ-ছুটি নবীন, এবং তড়িৎও কিছু পরিমাণে ইহার আলোচনার দিনরাত মত্ত হইয়া আছে। বিপিন যে একেবারে ডুবিয়াছে, সে বিষয়ে প্রথমোক্ত তিনটি মানুষের কোনোই সন্দেহ ছিল না। তড়িৎ অত শত না বুঝিলেও এতটা বুঝিত যে, বিপিনদা কৃষ্ণাদিকে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর জীব মনে করে এবং সকলে তাহার মতো হয় এটা চায়। কৃষ্ণাদিকে তাহার অবশ্য মন্দ লাগিত না, ভালোই লাগিত, কিন্তু তাহার সমালোচনা না করিয়াও সে ছাড়িত না। বাঙালীর মেয়ে অত সাহেব হইবে কেন? সমস্তক্ষণ ফিট্‌ফাট্ থাকা কি এত দরকার? কাপড়-জামার ভাবনা এত বেশী ভাবা পাপ কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তড়িৎকে প্রায়ই মতামত ব্যক্ত করিতে দেখা যাইত। হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য এবং ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাই বলিবার ছিল। ভাই-ভাজরা এ বিষয়ে তাহাকে ঠাট্টা করিলে সে অত্যন্ত চটিয়া যাইত।

কৃষ্ণা এক সংশয়ের মধ্যে পড়িয়াছিল। বিপিনকে তাহার খারাপ লাগে একথা মোটেই বলা যায় না, বিপিনের মনের ভাব যেটুকু জানা যায় তাহাও কৃষ্ণার অপছন্দ নয়। কিন্তু অন্যের ভালোবাসা পাইলেই তখনই সে ভালোবাসার প্রতিদিন দেওয়া চলে না। কাজেই কৃষ্ণা বিপিনের সহিত কেমন ব্যবহার করিবে কিছু ঠিক করিতে পারিত না। তাহাকে কি এড়াইয়া চলা উচিত, না সকলের সঙ্গে যেমন সহজ-ভাবে মেশে তেমনি তাহারও সঙ্গে মেশা উচিত? বিপিন এখনে অবধি এমন-কিছু বলে নাই বা করে নাই যাহাতে কৃষ্ণা আপত্তি করিতে পারে। যতক্ষণ তেমন-কিছু না ঘটে ততক্ষণ আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া গোলমাল করিলে বড়ই বোকামীর পরিচয় দেওয়া হয়। কাজেই কৃষ্ণার মনের ভিতর অনেক তোলপাড় চলিলেও, বাহিরের ব্যবহার তাহার একরকমই ছিল। বিপিন যদি কিছু বলিয়া বসে,

তাহা হইলে সে কি করিবে, এ ভাবনাও যে কৃষ্ণা না ভাবিত তাহা নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কিছু স্থির করা কঠিন ছিল। বিপিনকে বিবাহ করিলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবাব একটা ব্যবস্থা হইয়া যায় বটে, কিন্তু কেবল সেইটুকুর জন্য বিবাহ করা কি উচিত? ইহা কি নিজের প্রতি, এবং যাহাকে বিবাহ করিবে তাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না? বিপিনকে সে অপছন্দ করে না বটে, কিন্তু সে যদি দরিদ্র হীন বংশের সন্তান হইত, তাহা হইলে কি কৃষ্ণা তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত? সম্ভবতঃ পারিত না।

প্রতিভার কথায় তাহার মনে চিন্তার স্রোত বহিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ তাহাতে বাধা পড়িল। তাহার বড় ছাত্রী আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কৃষ্ণাদি, আজ আমাদের এ বেলার পড়াটা ছুটি দিতে হবে।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অমিয়া বলিল, "Excelsior বায়স্কোপে খুব একটা ভালো ছবি এসেছে, সেইটা দেখতে যাব।"

কৃষ্ণা বলিল, "তা যাও, আপত্তি নেই। বাইরে বেরোনোটাও পড়ার চেয়ে কম দরকারী নয়। কি ছবি এসেছে?"

অমিয়া বলিল, "নামটা মনে নেই। কিন্তু 'যাও' বল্‌লেই হবে না, আপনাকেও যেতে হবে। তা না হ'লে মা আমাদের যেতে দিলেন আর-কি?"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, আর কে কে যাবে?"

অমিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, "আমি, ছোট বৌ, তড়িৎ, ঠাকুরপো, আর পাশের বাড়ীর ফুলি। ছোট্ট-ঠাকুরপোও যাবে যদি ঠিক সময়-এসে জোটে।"

তাহার হাসি চাপিবার চেষ্টাটা কৃষ্ণার চোখ এড়াইল না, মনটা তাহার একটু বিরক্ত হইয়া গেল।

বিপিন জানিত, কৃষ্ণা না গেলে জ্যাঠাইমা কখনোই বৌদের যাইতে দিবেন না। তিনি নিজে কখনও বায়োস্কোপে যান না, তাঁহার ওসব

সাহেব-মেমের বেয়াড়া ছবি ভালো লাগে না। তবে বৌরা ছেলেমানুষ, স্বামীগুলিও তাহাদের সাহেব বনিতেই বিদেশে গিয়াছে। বৌদের ঠিক নিজের ছাঁচে গড়িলে যে চলিবে না তাহা তিনি জানিতেন। কৃষ্ণার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাঁহার বিশ্বাস অগাধ ছিল, কাজেই সে সঙ্গে যাইবে শুনিলে তিনি আপত্তি করিতেন না। বায়স্কোপে কলিকাতায় মেয়েদের আলাদা জায়গা আছে, তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল এখানেও তাহাই আছে। ছেলেমেয়ে একই জায়গায় বসে জানিলে তিনি আর ইহাদের ওমুখো হইতে দিতেন না।

ঠাকুর ভাত লইয়া বিপিনের ঘরে ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে পানের ডিবা লইয়া ঢুকিল প্রতিভা। বিপিন বলিল, "কি ছোট-বৌদি, বড় দয়া যে ?"

প্রতিভা বলিল, "এই এলাম একটু দয়া করতে। সংসারে সকলেই কি আর মায়া-দয়াহীন ? মানুষের দুঃখ দেখলে কষ্ট হয় না একটু ?"

বিপিন মনে মনে লজ্জিত হইল। সবাই মিলিয়া আচ্ছা এক ঘোঁট পাকাইয়াছে। বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সব দয়াটা আমার উপর খরচ ক'রে ফেলো না, আরও দয়ার পাত্র জগতে আছে।"

প্রতিভা বলিল, "তা থাকবে না কেন ? আগুনে কি আর একটা পতঙ্গই পোড়ে ? আর-একজন দয়ার পাত্রকে তুমি আজ লাঞ্ছায় ক'রে নিয়ে এলে দেখলাম।"

বিপিন বলিল, "বাবা, চোখ এড়ায় না কিছুই ! C. I D. তে কাজ নাও গিয়ে। আমি তাকে আনিনি, সেই আমাকে এনেছিল।"

প্রতিভা বলিল, "ও মা, ওকে চেন নাকি তুমি ? তাহ'লে প্যাগোডাতে তার দিকে অমন মার-মূর্ত্তি ধ'রে তাকিয়েছিলে কেন ? আমার ত ভয় হচ্ছিল, পাছে গিয়ে দু' ঘা বসিয়ে দাও।"

বিপিন বলিল, "আগে কি আর চিন্‌তাম, এখন চিনি। এই গলিতে এসে ঘুরছিল শুনে ঠিকই করেছিলাম, তাকে খুঁজে বার ক'রে বেশ দু ঘা দিয়ে দেব। হঠাৎ কাল এক ভদ্রলোকের বাড়ী তার সঙ্গে দেখা হয়ে

গেল। ভাগ্যে কিছু ক'রে বসিনি। নিতান্ত যে-সে লোক নয়। মস্ত জমিদার, আমাদের মত পাঁচটা কার্‌বার কিনে নিতে পারে। দেশ বেড়াতে বেরিয়েছে।"

প্রতিভা বলিল, "ও মা, তা হ'লে ত তোমার ভারি মুস্কিল হ'ল ঠাকুরপো। অত বড়-মানুষ বর পেলে কি আর কোনো মেয়ে অন্য কারো দিকে ফিরে তাকায়? দেখতে মন্দ নয়, যদিও তোমার রংটা তার চেয়ে ঢের ফর্‌শা।"

বিপিন বলিল, "যদি বয়োস্কোপে যাবার মতলব থাকে ত বাজে রসিকতা রেখে স'রে পড়। দুটো বাজে, তোমাদের সাজ কর্‌তে অন্ততঃ এক ঘণ্টা লাগবে। তিনটায় বেরোতে চাই।"

প্রতিভা তবু নড়ে না। জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি' কোথায় থাকে?'

বিপিন বলিল, "ভারি যে উৎসাহ দেখছি। তুমি কি ভাবছ তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাবার আশায়ই সে এই গলির ভিতর ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছিল?"

প্রতিভা বলিল, "আজ্ঞে না, তা ভাবলে কি আর আপনার কাছে খোঁজ নিতে ছুটে আসি? কার চাঁদমুখ যে সে দেখতে চায় তা আমার জান্‌তে বাকি নেই। তাঁর ফেলা শুক্‌নো ফুল যখন মাথায় ক'রে নিয়ে গেল, তখন আর বুঝতে বাকি রইল কি?"

বিপিনের মুখটা অন্ধকার হইয়া উঠিল দেখিয়া প্রতিভা সভাভঙ্গ করিয়া সরিয়া পড়িল। অমিয়ার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, সাজপোষাক সব ঠিক কর, কৃষ্ণাদি এখনই আস্‌বেন ভুল ধর্‌তে।"

অমিয়া বলিল, "আমার ঠিক করাই আছে। শাদা বেনারসী শাড়ী আর জ্যাকেট। এতে আর কি ভুল ধর্‌বেন তিনি? রঙীন জিনিষ হ'লে অবশ্য বল্‌তেন, এটার সঙ্গে ওটা মানায় না।"

প্রতিভা বলিল, "ভালো বুদ্ধি বার করেছ। কিন্তু আমাকে যে ছাই শাদাতে একেবারেই মানায় না। যাই, ভেবে-চিন্তে একটা কিছু ঠিক করি।"

সাজ পোষাক দুই বৌএর একরকম শেষ হইল। তড়িৎ মাঝখানে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বড়-বৌদি, আমার চুলটা একটু বেঁধে দাও ত। আমি এলো খোঁপা বাঁধতে পারি না মোটেই। বিনুনী ঝুলিয়ে গেলে কৃষ্ণাদি এখুনি বকুনি দেবেন।"

এমন সময় কৃষ্ণা হাসিয়া ঘরে ঢুকিল। ছাত্রীদের দেখিয়া বলিল, "যাক, আজ আর ভুল ধরবার বিশেষ-কিছু নেই। কিন্তু মাথার কাপড় অত বেশী টেনো না, চুল একটু দেখা না গেলে বড় বিশ্রী দেখায়।"

প্রতিভা বলিল, "এখন এমনি থাক কৃষ্ণাদি, গাড়ীতে উঠে ঠিক ক'রে নেব। এখন এর চেয়ে কম ঘোমটা দেখলে মা রাগ করবেন।"

তড়িতের ভয় ছিল কৃষ্ণাদি নিশ্চয়ই তাহার পোষাকের ত্রুটি ধরিবেন, সে গাড়ীতে উঠিবার আগে সেইজন্য কৃষ্ণার সামনেই আসিল না।

Excelsior থিয়েটারে পৌঁছিয়া বিপিন বলিল, "নামো চট্ ক'রে, আরম্ভ হয়ে গেছে দেখছি। উপরে চল।"

তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল, "টিকিট কিন্‌বে না?"

বিপিন বলিল, "না, অমনিই যাব। ওরা অমোকে 'পার্‌মিশন্' দিয়েছে।" পাছে ভালো জায়গা পাওয়া না যায়, এই ভয়ে সে কালই টিকিট কিনিয়া সীট রীসার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "আজকের ফিল্‌ম্‌টা কি?"

বিপিন বলিল, "The Thief of Bagdad"। ফিল্‌ম্‌টা বেশ ভালো ব'লেই শুনেছি।"

উপরে উঠিয়া জায়গা খুঁজিয়া বসিতে বসিতেই ফিল্‌ম্ সুরু হইয়া গেল। কৃষ্ণা ছিল দুই বৌএর এক পাশে, বৌদের পর ফুলী, তড়িৎ, তাহার পর বিপিন। কৃষ্ণার সঙ্গে একটাও কথা বলিবার সুযোগ তাহার হইল না। কেবল তড়িতের "এটা কি হ'ল," আর "ও কি বল্‌ল" শুনিতে শুনিতে তাহার কান ঝালাপালা হইয়া গেল।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া সে বলিল, "যাঃ তুই একেবারে জ্বালিয়ে তুল্‌লি।

স্কুলে যাস্ কি ঘাস কাট্‌তে? এই সাধারণ গল্পটা বুঝ্‌তে পারিস না? তোকে আর কোনোদিন আন্‌ব না।"

তড়িৎ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "বয়েই গেল। আমার বায়োস্কোপ বিশেষ-কিছু ভালোও লাগে না। নিতান্ত বৌদিরা এলেন, তাই এলাম।"

ছবি শেষ হইবার পর বিপিন বলিল, "রোস, লোকগুলো খানিক বেরিয়ে যাক, তারপর বেরিও। তোমরা এখনও ভিড়ের মধ্যে হাঁট্‌বার উপযুক্ত হওনি।" কৃষ্ণার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কেমন লাগল আপনার?"

কৃষ্ণা বলিল, "ভালোই। আরব্য উপন্যাস 'এন্‌জয়' কর্‌বার পক্ষে একটু বুড়ো হয়ে গেছি অবশ্য।"

বিপিন নীচু গলায় বলিল, "আরব্য উপন্যাস 'এন্‌জয়' করবার বয়স কখনও যায় না, মিস রায়। মানুষের জীবনের সব বিফলতা একমাত্র কল্পলোক আর গল্পলোকেই সফল হয়ে ওঠে। তা না হ'লে মানুষ কি বাঁচে? সামান্য চোর যেখানে ভালোবাসার জোরে রাজকন্যাকে লাভ করে, সে গল্প আমি অন্ততঃ সমস্ত মন দিয়েই 'এন্‌জয়' করি।"

কৃষ্ণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। এরপর আর কিছু না করিয়া থাকা চলিবে না দেখা যাইতেছে। কি করিবে সে? আবার কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া স্কুলে টীচার হইবে? না, এইখানেই থাকিয়া যাইবে, যা ঘটে অদৃষ্টে? এ যুবকটি তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে বলিয়া ত মনে হয় না।

প্রতিভা হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া বলিল, "চলুন কৃষ্ণাদি।"

সকলে মিলিয়া বাহির হইয়া আসিল। মেয়েদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বিপিন বলিল, "আমার কাজ আছে একটু, আমি চল্‌লাম। তোমরা যেতে পারবে ত?"

কৃষ্ণা বলিল, "না পারবার ত কারণ দেখি না কিছু।"

প্রতিভা বলিল, "এটা ত আর বাগদাদ নয়! কেউ চুরি ক'রে নেবে না।"

২২

বিপিনকে নামাইয়া দিয়া সুবীর আর-একটু ঘুরিয়া হোটেলে ফিরিয়া গেল। কাল তাহাদের যাইবার দিন, কিন্তু হঠাৎ যেন চলিয়া যাইবার সব ইচ্ছা তাহার মন হইতে লোপ পাইয়া গেল। আরো দুই-চারিদিন ইচ্ছা করিলেই থাকিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গী-দুটি তাহা হইলে আর তাহাকে আস্ত রাখিবে না। না-হয় তাহাদের রসিকতার বাণ সহ্যই করা গেল। কিন্তু থাকিয়াই বা লাভ কি? এক সহরে থাকার যেটুকু সুখ, তার বেশী আর কিছুই নয়। কৃষ্ণাকে সে চেনে না, চিনিবার কোনো সুযোগও নাই। এখানে মাস-ছয় পড়িয়া থাকিলে, দৈবগতিকে সুযোগ মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু তাহা ত সম্ভব নয়?

সুবীর চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক করিল যে বড়দিনের ছুটিতে আবার সাগর পাড়ি দিতে হইবে। সেবার আর কাহাকেও সঙ্গে আনিতেছে না। এখন গিয়া দেখা যাক, মায়ের এত জোর তলব কেন? বুড়ী ভবানীও যেন আর মরিবার সময় পায় নাই, যত অসুখ তার এই পুজার ছুটির মুখ চাহিয়া বসিয়া ছিল।

পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিবার উৎপাত বিশেষ ছিল না, কাজেই বিকালটাও সে ঘোরাঘুরি করিয়াই কাটাইয়া দিবে স্থির করিল। ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে কোনো এক স্কোয়ারে বর্ম্মা নাচের ব্যবস্থা হইতেছে, সে দেখিয়া আসিয়াছে। জিনিষটা নূতন ধরণের হওয়াই সম্ভব। অতএব চা খাইয়া তিন বন্ধুতে ব্রহ্মদেশীয় "পোয়ে"র আস্বাদ লাভ করিতে চলিল।

নাচের জন্য যে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চারিপাশে তখন দিব্য ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। তবু ঠেলাঠেলি করিয়া ইহারা এমন একটু জায়গা করিয়া লইল, যেখান হইতে খানিকটা অন্ততঃ দেখা যায়।

নাচের আগে বাজনা সুরু হইল। বাজনার নমুনা শুনিয়া চন্দ্র বলিল, "ওহে, বাজনা যেমন শুন্‌ছি, নাচও যদি তেমনি হয়, তাহ'লে এতটা কষ্ট না কর্‌লেও পারতাম।"

ব্যাপারটা কেবলই নাচ নয়, খানিক পরে বোঝা গেল। সামান্য একটু অভিনয়ের মতোও ইহার ভিতর আছে। দুজন অভিনেতা দাঁড়াইয়া বর্ম্মা ভাষায় উচ্চকণ্ঠে কি-সব বলিয়া গেল। ময়ূরের পেখমের অনুকরণে কোমরের দু'ধারে দুই ডানার মত ব্যাপার মেলিয়া, একটি নর্ত্তকী দাঁড়াইয়া ছিল। সে অকস্মাৎ পুরুষ-দুইটার গালে প্রচণ্ড দুই চড় লাগাইয়া দিল। দর্শকদের মধ্যে মহা হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র বলিল, "হরি বল! এর নাম নাচ নাকি?"

সুবীর বলিল, "আর মিনিট-পাঁচ দাঁড়ানো যাক, যদি এই রকমই চল্‌তে থাকে, তাহ'লে স'রে পড়া যাবে।"

যাই হোক, কিছু পরে নাচ সুরু হইল। নর্ত্তকীটির মোরগের মত বসিয়া লম্ফঝম্প দেওয়া দেখিয়া ইহাদের বাঙ্গালী চক্ষু বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিল না। ইন্দ্র বলিল, "বেশ বাবা, মগের মুল্লুক নাম সাধে হয়নি। অভিনয় হ'ল ঠ্যাঙানো আর চাট্ মারা হ'ল নাচ।" তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া, ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালেই জাহাজ। কাজেই বেশী রাত না করিয়া, খাইয়া-দাইয়া, সকাল-সকাল তিন বন্ধুতে শুইয়া পড়িল। সুবীর ঘুমাইতে পারিল না। সারারাত এপাশ-ওপাশ করিয়া, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার ঘোর আসিতে না আসিতে, ইন্দ্র-চন্দ্রের হুড়াহুড়িতে তাহাকে উঠিয়া বসিতে হইল।

ঘরের চারিদিকে ছড়ানো জিনিষপত্র একত্র করিয়া স্যুট্‌কেসে ঠাসিয়া বন্ধ করা, বিছানা বাঁধা, চা খাওয়া, কাপড় পরা, ইত্যাদিতেই আরো ঘণ্টা-খানিক কাটিয়া গেল।° তারপর গাড়ী ডাকিয়া, হোটেলের বিল চুকাইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "অত জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখছেন কি? গাড়ী থেকে নেমে দৌড় দেবেন নাকি?"

সুবীর বলিল, "গাড়ীতে না চড়লেই ত হ'ত তাহ'লে।"

জাহাজ-ঘাটে আসিয়া দেখিল, বেশী সময় নাই। কোনোরকমে তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িল।

দর্শক এবং যাত্রীর হুড়াহুড়ি, কুলি এবং জাহাজঘাটের কর্ম্মচারীদের হৈ-চৈএর মধ্যে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ইন্দ্র বলিল, "সহযাত্রীদের যে-রকম নমুনা দেখা যাচ্ছে, তাতে ডেকে যাবার মতলব ত্যাগ করার জন্যে নিজেদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই জীবগুলির সঙ্গে গেলে sea-sick না হই, ship-sick ত হ'তামই।"

জিনিষপত্র কেবিনে রাখিয়া তাহারা ডেকেই বসিয়া রহিল। তীর-ভূমি ক্রমে দূরে সরিয়া চলিল। জাহাজ-ঘাট দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুবীরের মনটা কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। দুইদিনের আমোদের আশায় সে এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু নিয়তি-ঠাকুরাণী ব্যবস্থা অন্যরকম করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার জীবনের সন্ধিক্ষণ বুঝি-বা এই অজানা দেশে, অপরিচিত মানুষের মেলায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ভবিষ্যতের উপর এই কয়েকটা দিনের ছায়া কেমনভাবে যে পড়িবে, তা ভগবান্‌ই জানেন। মন হইতে এই দিন-কয়টিও আর কোনোকালে মুছিবে না।

ইন্দ্র হঠাৎ শিস্ দিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল :—

Good bye Piccadilly, farewell Leicester Square,
It's a long long way to Tipperary, but my heart's
right there.

সুবীর হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "কেবিনে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। তোমাদের উৎপাতে ত সারারাত জেগেই কাটাতে হ'ল।"

সে ঘুমাইয়া উঠিল যখন, তখন ভরা দ্বিপ্রহর। খাওয়া দাওয়া শেষ

করিয়া চন্দ্র একটা বিছানায় নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে, ইন্দ্র আর একটাতে বসিয়া চিঠি লিখিতেছে। সুবীরকে উঠিতে দেখিয়া বলিল, "কিছু খাবার আপনার জন্য ঢাকা দিয়ে রেখেছি। একে বিরহ-যন্ত্রণায় ভুগছেন, তার ওপর জঠরযন্ত্রণা সুরু হ'লে আর বাঁচবেন না। খেয়ে নিন।"

সুবীর বিনা-বাক্যব্যয়ে তাহার অনুরোধ পালন করিতে বসিল। খাইয়া দাইয়া একখানা ইংরেজী মাসিকপত্র হাতে করিয়া আবার ডেকের উপরেই আসিয়া বসিল। ফার্ষ্ট্ক্লাশ ডেকে তখন সাহেব-মেমের দল মহা উৎসাহে ডেক পোলো খেলিতেছে, দেখা গেল। মিনিট-খানিক তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুবীর পড়ায় মন দিল।

কিন্তু পড়িতেও বেশীক্ষণ ভালো লাগিল না। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন তাহার চোখ সাগরের জলের ঘন নীলিমায় ডুবিয়া গেল, মন কোন্ অচেনা পথে অভিসারে বাহির হইয়া গেল।

যাহাকে সে চেনে না, মুখের একটা কথার যোগও যাহার সঙ্গে নাই, সে-ই আজ তাহার বিশ্ব জুড়িয়া বসিল কেমন করিয়া? কে গো তুমি? এতদিন কোন্ রহস্য-যবনিকার আড়ালে তুমি নিজের জ্যোতির্ম্ময়ী ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে? তুমি ত শ্যামল বঙ্গভূমিরই কোলের সন্তান, তবে এই সাগরপারের দেশে আসিয়া ঘর বাঁধিলে কেন? দুই দিনে যাহার জগৎ-সংসার তোমার রূপের প্রভায় আলোকিত হইয়া উঠিল, সে ত আজ বিদায় লইল। এরপর তুমি কতদূরে, সে কতদূরে? এখানকার বাতাসও বুঝি অতদূরে পৌঁছিবে না। একই পৃথিবীতে তুমিও আছ, সেও আছে, এই থাকিবে সে হতভাগার একমাত্র সান্ত্বনা। ইহার চেয়ে কাছে কোনোদিনই কি তুমি আসিবে না?

জাহাজের দিন-তিনটা কোনোমতে কাটিয়া গেল। ইন্দ্রের রসিকতা, চন্দ্রের উপদেশ, নিজের মনের ভিতরের বিপ্লব, এই লইয়াই সুবীরকে ব্যস্ত থাকিতে হইল। বাংলাদেশের যত কাছে সে আসিতে লাগিল, ততই

তাহার বুকের ভিতরটা পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই এবার সাগর তাহাদের দুজনের মাঝে পড়িল।

কলিকাতায় নামিয়া চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সোজা বাড়ী যাবে নাকি হে? তোমায় মা কি এসেছেন? না যদি এসে থাকেন, তাহলে শুধু-শুধু কি হবে একলা বাড়ী ব'সে থেকে? চল-না আমাদের সঙ্গে।"

সুবীর বলিল, "না, বাড়ীই যাই। ঐ যে দেওয়ানজীকে দেখা যাচ্ছে। মা বোধহয় এসেই পড়েছেন।"

ইন্দ্র বলিল, "আচ্ছা যান। বেশী ফ্রেট করবেন না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আমায় মাঝেমাঝে ডেকের ভাড়া দিলে, আমি গিয়ে খবরাখবর এনে দিতে পারব। আর আমার মেয়ের বিয়েতে যে চেক্‌টা দেবেন, সেটা লিখে রাখবেন। সেটা ভাঙিয়ে আর-একটা বিয়েতে কিছু ভালোরকম প্রেজেণ্ট দিতে হবে।"

সুবীর বলিল, "বেশ, কাল বিকেলে এসে চেক্ নিয়ে যেও, চা-ও খেয়ে যেও।"

দেওয়ানজীর কাছে খবর পাইল, মা সবেমাত্র কাল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভবানীর শরীর সত্যই বড় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কি যে অসুখ, তাহা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে ডাক্তাররা বিশেষ ভরসা দিতেছেন না।

বাড়ী পৌঁছাইয়া হাত-মুখ ধুইবার আগেই সুবীর মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ভানুমতী তাহারই আশায় বসিয়াছিলেন। ছেলে প্রণাম করিতেই অঙ্গুলি দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "ও মা, বেড়িয়ে ত আরো রোগা হয়ে এলি দেখছি। রংটাও ঢের কালো দেখাচ্ছে। শরীর ভালো ছিল না নাকি রে?"

সুবীর বলিল, "ভালোই ত ছিলাম। ষ্টীমার থেকে নামলে সকলকেই কালো দেখায়, দুদিনে এক-পোঁচ কালি উঠে যাবে এখন গা থেকে। তুমি আছ কেমন? ভবানী-দিদি কেমন আছে? দেওয়ানজীর কাছে শুনলাম, তার নাকি শরীর বড় বেশী ভেঙে পড়েছে?"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ, কি যে তার হ'ল, বুঝতে পারছি না। বয়েস অবিশ্যি হয়েছে, কিন্তু বছর-খানেক আগেও ত বেশ শক্ত-সমর্থ ছিল। হঠাৎ যেন ভেঙে পড়েছে। কথাবার্ত্তাও কয় না, সারাক্ষণ যেন বুকে পাথর নিয়ে আছে মনে হয়। কি যে করব বুঝি না।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ঘরে রয়েছে? চল, একটু দে'খে আসি।"

মা বলিলেন, "আগে হাত মুখ ধো, একটু জলটল খা, তারপর রোগী দেখতে যাস্ এখন। একটু ঘুমিয়েছে বোধহয় এখন।"

সুবীর বলিল, "থাক্ তা হ'লে, পরেই দেখব। একেবারে স্নান ক'রে ফেলি গিয়ে। ষ্টীমারের কাপড়গুলো না ছাড়লে তৃপ্তি পাচ্ছি না। কি দারুণ নোংরামির মধ্যেই ক'টা দিন কাটাতে হয়। এইজন্যে বোধ হয় হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ব'লে ধ'রে নিয়েছিল।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, তাই কর্।"

স্নানাহার সারিয়া, সুবীর ভবানীকে দেখিতে গেল। ভবানী আগে ভানুমতীর সঙ্গে এক ঘরেই শুইত, অসুস্থ হইয়া পড়ার পর ডাক্তারের আদেশে তাহাকে আলাদা ঘরে রাখা হইয়াছে।

ভানুমতীর ঘরে ঢুকিয়া সুবীর বলিল, "মা চল, ভবানীদিদিকে দে'খে আসি। এখন জেগে আছে ত?"

তাহার মা বলিলেন, "জেগেই আছে ব'লে ত জানি। এই খানিক আগে ত খেল। চল, দেখি গিয়ে।"

ভবানী শুইয়া ছিল। সুবীরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিবার জোগাড় করিল। সুবীর তাড়াতাড়ি আবার তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল, বলিল, "থাক, আর উঠে ব'সে কাজ নেই। যা ত দশা করেছ নিজের। তোমার হ'ল কি?"

ভবানী একটু হাসিয়া বলিল, "হবে আর কি বাছা? মানুষের আয়ুর ত একটা সীমা আছে, আমার আয়ুই ফুরিয়েছে। তোমরা মিথ্যে ওষুধ গিলিয়ে আমাকে জ্বালাতন করছ, আমি এ যাত্রা আর উঠব না।"

ভানুমতীর দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। সুবীর বলিল, "যত সব বাজে কথা। এই-সব ভাব ব'লেই ত সারতে পার না। আমি এসেছি, দেখো বকুনির চোটেই তোমাকে দুদিনে খাড়া ক'রে দেব।"

ভবানী সস্নেহ দৃষ্টিতে সুবীরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর আমায় খাড়া ক'রে কাজ নেই দাদা। তোমরা বেঁচে ব'র্ত্তে থাক, সুখে থাক, সেই ঢের। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। তোমাদের সকলকে রেখে যাচ্ছি, এর বড় সুখ আর আমার কি আছে? একটা দুঃখ কেবল থেকে গেল।"

ভানুমতী ভাবিলেন, ভবানী বুঝি সুবীরের বিবাহের কথা বলিতেছে। পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ্ খোকা, রুগ্ন মানুষের আবদার রাখতে হয়। বিয়ে ত করবিই বলেছিস, না-হয় দুবছর আগেই কর্। বেচারী দে'খে যাক্। আমাদের মা ছিল না, মায়ের কাজ ওই করেছে। বৌ না-হয় ঘর করতে পরে আসবে, এখন বাপের বাড়ী থেকে পড়া-শোনাই করুক।"

বিবাহের নামে সুবীরের মুখ ঝড়ের আকাশের মতো কালো হইয়া উঠিল। বলিল, "মা, আসবামাত্রই ফের সুরু করলে? একদিনও সবুর সইল না বুঝি? আবার আমায় কলকাতা-ছাড়া করতে চাও?"

ভবানী বলিল, "দেখ বাছা, বিয়ের জন্যে অত তাড়া দিও না। যখন হয় এক সময় হ'লেই হবে। এ-সব জিনিষে জোর করতে নেই। ধ'রে বেঁধে একটা দিয়ে দিলেই ত হ'ল না? শেষে বৌকে ও দু চোখে দেখতে পারবে না।"

সুবীর বলিল, "দেখ মা, ভবানী দিদি তোমার মায়ের বয়সী, অথচ ধরণ-ধারণ, মতামত আধুনিক। হাজার হলেও রাজপুতের রক্ত গায়ে আছে ত? মানুষের স্বাধীনতাটা যে খুব বড় জিনিষ তা ও এতদিনেও ভুলতে পারেনি, যদিও ভীরু বাঙালীর দেশে ওর সারা জীবনটাই কেটে গেল।"

ভানুমতী বলিলেন, "বেশ বাছা, যা-খুসি তোমাদের কর। তা স্বাধীন থাকতেই যদি চাও, তাহ'লে ভদ্রলোককে কথা দেবার কি দরকার ছিল? শেষে বিয়ে করবিই না বুঝি?"

সুবীর বলিল, "না করতে হ'লে ত বাঁচি, কিন্তু তুমি কি আর আমার গলায় ফাঁসী না দিয়ে ছাড়বে?"

ভানুমতী চোখ মুছিতেছেন দেখিয়া, সে আবার সুর নামাইয়া ফেলিল। বলিল, "এখনই ত আমি তাদের হাঁকিয়ে দিচ্ছি না? কাঁদবার দরকার কিছু নেই। তারা যদি নিষ্কৃতি না দেয়, তাহ'লে বিয়ে আমি করব, কিন্তু আমায় এমন ক'রে ধ'রে বেঁধে কাঁধে জোয়াল না দিলেও চলত। যাদের দেশে বাবা-মা ধ'রে বেঁধে বিয়ে গিলিয়ে দেয় না, তারা কি আর বিয়ে করে না?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাকে আমি চিনি না কিনা? তোমার নিজের উপর ছেড়ে দিলে তুমি যা বিয়ে করবে তা আমার জানা আছে।"

সুবীর বলিল, "মা হ'লেই যে ছেলেকে সব-চেয়ে বেশী চেনা যায়, এ ধারণাটা ঠিক নয়, মা। বড় বেশী কাছে থেকে দেখলে জিনিষটার ঠিক চেহারা দেখা যায় না। এইজন্যে ঘরের লোকের চেয়ে বাইরের লোক মানুষের ঠিক পরিচয়টা পায়।"

মা চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা গো আচ্ছা। বাইরের লোকেই তোমায় বেশী চেনে ধ'রে নেওয়া গেল। এখন মেজদি রাত্রে তোমায় নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। যাবে কি না বল।"

সুবীর বলিল, "তার আর কি? যাওয়া যাবে। মাসীমার বক্তৃতা অনেককাল শুনিনি, কানটা হাল্‌কা হয়ে আছে।"

বিকালটা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া কোনোমতে সে কাটাইয়া দিল। কলিকাতায় কোনোদিন যে সময় কাটাইবার জিনিষের অভাব হইতে পারে, তাহা সে মনেই করিতে পারে নাই। আজ অত্যন্ত অবাক্ হইয়া দেখিল যে যাহা-কিছুতে সে আগে আমোদ পাইত, যাহা-কিছুতে তাহার রুচি ছিল, সবই যেন কেমন বিস্বাদ বোধ হইতেছে। তাহার মনের

অস্বাভাবিক চঞ্চলতা, তাহাকে একটু ভয় পাওয়াইয়া দিল। মনে মনে বলিল, "এইরকম হ'লেই গিয়েছি আর-কি? বড় দিনের ছুটি অবধি তর সইলে হয়। French leave নিয়ে আবার সাগর পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু এই এক বিয়ের কথা দিয়ে যে মুস্কিল ক'রে রেখেছি। কোনোরকমে তারাই বিয়েটা ভেঙে দেয়, তাহ'লেই রক্ষা। না হ'লে কি যে ব্যাপার ঘটবে, ভগবানই জানেন। মিত্রদের বাড়ী বিয়ে করতে আমি ত in honour bound। মেয়েটা পরীক্ষায় ফেল করে, কি আর কাউকে বিয়ে করে ত বাঁচি। হিন্দু বাড়ীর মেয়ে, অন্য কারো সঙ্গে 'লভে' প'ড়ে আমায় রেহাই দেবে, সে আশাও নেই।"

সন্ধ্যার সময় ভানুমতী ছেলেকে লইয়া শোভাবতীর বাড়ী চলিলেন। সুবীর গিয়া দেখিল, তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেরা কেহই বাড়ী নাই। সুবীর যে এত সকাল সকাল আসিবে, তাহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কাজেই তাহারা যে-যার বেড়াইতে চলিয়া গিয়াছে। মেজ মাসীমার বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা বোন এবং বৌদিদিদের রসিকতা সহ্য করা সহজ, অতএব সে সেই দিকেই ভিড়িয়া গেল।

কিন্তু তাহার মাসীমা অত সহজে তাহাকে নিস্কৃতি দিলেন না। বড় বৌ-এর ঘরে আসিয়া বলিলেন, "ওমা, তুই এখানে, আমি ভাবছি ছেলে গেল কোথায়। চল্ একটু আমার ঘরে, ঢের কথা আছে।"

সুবীর অগত্যা মাসীমারই অনুসরণ করিল। কথাটা যে কি তাহা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না। ভাবিল, যাক, ইহারা কোনো নূতন দাবী তোলে নাকি দেখা যাক। হয়ত বা মুক্তির কোনো উপায় পাওয়া যাইতেও পারে। শোভাবতী প্রথমেই অবশ্য বিবাহের কথা পাড়িলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, কেমন দেখলি বর্ম্মা দেশ?"

সুবীর বলিল, "দেখলাম বেশ, কিন্তু সেটা বর্ম্মা দেশ নয়।"

দুর্গাও আজ বাপের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে বলিল, "হেঁয়ালিতে কথা না বল্‌লে আধুনিক হওয়া যায় না বুঝি? মা-মাসীর কাছেও বুদ্ধি না ফলিয়ে তোমরা পার না।"

সুবীর বলিল, "সোজা কথার বাঁকা মানে আছে ধ'রে নাও ব'লেই সব জিনিষ তোমাদের হেঁয়ালি লাগে।"

দুর্গার মা বলিলেন, "যা বাপু, সব-তাতে তোদের তর্ক। তা দেখ, মিত্তিরদের মেজবাবুর অবস্থা বিশেষ ভাল না, মাস-খানেক হ'ল বিছানা নিয়েছে। ওঠে না ওঠে, ঠিক কিছু নেই। তারা বল্‌ছিল কি, বিয়েটা হয়ে গেলে হয় না? মেয়ে বাপের বাড়ী যেমন আছে থাকবে। পরীক্ষা দেওয়া-টেওয়া হয়ে গেলে তারপর ঘরে এনো।"

সুবীর বলিল "এরকম ত আমার সঙ্গে কথা ছিল না। পরীক্ষায় পাশ না করলে ত আমার বিয়েটা ফিরে যাবে না!"

তাহার মা বলিলেন, "কথা ত ছিল না। কিন্তু তারা ত জানত না যে মেয়ের বাপ এখন শয্যা নেবে? মানুষের অবস্থা বুঝে ত ব্যবস্থা? তোমার বৌকে ত মাষ্টারি করতে হবে না যে পরীক্ষা পাশ না করলেই একেবারে ভরাডুবি হ'ল। খানিক লেখাপড়া শিখলেই হ'ল।"

সুবীর বলিল, "ঠিক কথা। অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা। তাঁদেরও অবস্থা যা ছিল তা নেই, আমারও অবস্থা যা ছিল তা নেই। ব্যবস্থা তাঁদের জন্যে যদি বদল করা চলে, ত আমার জন্যেও করা উচিত।"

শোভাবতী বলিলেন, "তা ত ন্যায্য কথা। কিন্তু তোমার অবস্থার কি বদল হ'ল, তা ত বুঝলাম না।"

সুবীর বলিল, "দেশবিদেশ ঘুরে আমার মত বদ্‌লে গেছে। আমি চাই মেয়ের বয়স আরো বেশী হয়, লেখাপড়া আরো সে ভাল ক'রে শেখে। ঘর থেকে এক পা বাইরে বেরোতে হ'লে চালকুমড়োর মত গড়িয়ে না যায়। অনাত্মীয় লোকের সঙ্গে বেশ সহজ সপ্রতিভ ভাবে কথাবার্ত্তা বলতে পারে, দরকার হ'লে নিজের ভার নিজে নিতে পারে—"

দুর্গা বাধা দিয়া বলিল, "বাংলা দেশে, হিন্দুর ঘরে হবে না বাপু, বিলেত গিয়ে মেম নিয়ে এস।"

সুধীরের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আসল কথা, বিয়ে তুই করবি না। কেবল কথা বাড়িয়ে ফাঁকি দিতে চাস্। কেন শুধু শুধু আমাকে দিয়ে কথা দেওয়ালি? আমি এখন তাদের বল্‌ব কি?"

সুধীর বলিল, "কিছুই তোমায় বলতে হবে না। যে কথা তাদের দেওয়া হয়েছে, সে কথা আমি রাখব। কিন্তু এখন বিয়ে আমি করছি না, মেয়ের বাবা থাকুন বা যান। তাঁরা অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চান, আমার আপত্তি নেই। আমি breach of contractএর নালিশ আন্‌ব না, তাঁদের নামে।

তাহার দুই মাসতুতো ভাই এই সময় আসিয়া পড়াতে আলোচনা আর অগ্রসর হইল না। সেও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির-বাড়ীতে পলাইয়া আসিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত এগারোটা। রাতে পরিয়া শুইবার কাপড় বাহির করিবার জন্য নিজের স্যুটকেসটা খুলিল। এইটাই তাহার সহিত রেঙ্গুন গিয়াছিল।

শুক্‌না নীল ফুলের গুচ্ছটা এখনও তেমনি আছে। সেটা বাহির করিয়া একবার সন্তর্পণে তাহার উপর হাত বুলাইয়া, সুধীর আবার সেটিকে সব সব জিনিষের নীচে লুকাইয়া রাখিল।

২৩

আজ 'মেল্ ডে' বলিয়া কৃষ্ণা বড় ব্যস্ত ছিল। অবশ্য প্রতি মেলে চিঠি লিখিবার মত অন্তরঙ্গ বন্ধু কেহ তাহার ছিল না। তবু নিজের দেশের পরিচিত-মণ্ডলীর খবরাখবর পাইতে ইচ্ছা করে বলিয়া বন্ধুদের চিঠি-পত্র লেখা সে একেবারে তুলিয়া দেয় নাই। প্রতি মেলে ঘটিয়া উঠিত না, তবে মাঝে মাঝে স্থিরসংকল্প হইয়া বসিয়া সে একেবারে একতাড়া চিঠি লিখিয়া ফেলিত। তাহার পর আবার কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ থাকিয়া যাইত।

আজ সেইরকম একটা দিন বলিয়া সকাল হইতে সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া চিঠি লিখিতে বসিয়া গিয়াছিল। চিঠির কাগজ, খাম, টিকিট, সব এ

পাশে, বন্ধুদের চিঠি এবং নিজের লেখা আর এক পাশে। দুচারখানা চিঠি নিতান্ত দায়সারা ভাবে লিখিয়া সে এখন লাবণ্যকে চিঠি লিখিতেছিল। নিজের গভীরতর মনের খবর সে কাহাকেও দিত না, তবু কিছু কিছু কথা এই বন্ধুটির সঙ্গেই যা তাহার হইত। কৃষ্ণার এ-কাজটাও লাবণ্যই একরকম জুটাইয়া দিয়াছিল, কাজেই ইহাদের খবরও তাহাকে সে চিঠি লিখিলেই দিত।

তড়িৎ একবার আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেল। খানিক পরে বাহির হইতে শোনা গেল, "মিস্ রায়, আমি পোষ্ট-অফিসে যাচ্ছি, আপনার কিছু দেবার আছে?"

কৃষ্ণা মনে মনে হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বিপিনকে ঠেকাইয়া রাখা সে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মানিয়াই লইয়াছিল। বাধা দিতে গেলে পাছে তাহার মানসিক চাঞ্চল্যকে আরো উদ্বেল করিয়া তোলা হয়, এই ভয়ে সে যথাসম্ভব সবরকম সংঘাত এড়াইয়াই চলিত। লোভী শিশুকে কিছু দিব না বলিলেই তাহার যেন সবটা পাইবার ঝোঁক চড়িয়া যায়। সেইরকম তরুণ মানুষের জীবনেও একটা সময় আসে, যখন অল্প অল্প পাইলে সে হয়ত অনেকদিন ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু একেবারে পাওয়া বন্ধ হইলে তাহার মনের ভিতর আদিম মানবের হিংস্রতা জাগিয়া ওঠে। গদাঘাতে সব বাধা চূর্ণ করিয়া সে কাম্য জিনিষটিকে গায়ের জোরেই পাইতে চায়।

কৃষ্ণার চিঠি লেখা হয় নাই, এবং বাড়ীতে বিপিন ছাড়াও চিঠি ডাকে দিবার লোক যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে মাঝ হইতে বিপিন অন্যসব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া কৃষ্ণার চিঠি লেখা শেষ হইবার আশায় বসিয়া যাইত এবং এমন অনেক কথা হয়ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত, যাহা শুনিতে কৃষ্ণার ভালো লাগিলেও না শুনিলেই সে নিশ্চিন্ত হইত বেশী।

সুতরাং যে-ক'খানা চিঠি তাহার লেখা হইয়াছিল, সেই-ক'খানা লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল। বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, "এই ক'টা পোষ্ট ক'রে দেবেন।"

বিপিন বলিল, "এবার আপনি এত হাত গুটিয়েছেন যে? অন্যান্য বারে ত দেখি, ডজনখানেক খাম পোষ্টকার্ড যায়!"

কৃষ্ণা বলিল, "সব বারেই সমান হবে নাকি? আপনিও ত মাত্র একখানা চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন দেখছি।"

বিপিনের হাতের খামখানার উপর যে নাম ও ঠিকানা লেখা, সেটা দেখিয়া কৃষ্ণা একটু বিস্মিত হইল। নামটার সহিত এই কিছুদিনের মধ্যে তাহার ছাত্রীগুলির কল্যাণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহাকে বিপিন চিঠি লিখিতেছে কি-কারণে তাহা সে মোটেই ভাবিয়া পাইল না।

বিপিন চিঠিগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিল।

কিন্তু মনটা তাহার হঠাৎ যেন অন্য কোন্ পথে যাত্রা করিয়া বসিল, কিছুতেই তাহাকে সে লাবণ্যের চিঠির দিকে ফিরাইতে পারিল না।

আচ্ছা, এই সুবীর ছেলেটি কে? বাংলা দেশে থাকিতে কখনও সে তাহাকে চোখে দেখিল না, নামও শুনিল না। হঠাৎ কোথা হইতে সে এই সাগর-পারের দেশে উড়িয়া আসিল, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণার মনোজগতে একটা নাড়া দিয়া আবার সাগর পার হইয়া চলিয়া গেল।

প্যাগোডাতে প্রথম সুবীরকে সে দেখে। যুবকটি যে অত্যন্ত মুগ্ধ বিস্ময় সহকারে তাহাকে দেখিতেছিল, তাহার জন্যই প্রথম সে কৃষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণা সুন্দরী, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মানুষে যে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে, সেটা তাহার নিজের কিছু অজানা জিনিষ নয়। কিন্তু সুবীরের দৃষ্টিতে অতখানি বিস্ময় থাকিবার কোনো কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। সে সুন্দর হইলেও সাধারণ মানুষই; তাহাকে দেখিয়া অতখানি অবাক্ হইবার কি আছে? বিপিনের ক্রোধটা তাহার চক্ষে অত্যন্ত অশোভন ঠেকিয়াছিল, ইহাও হয়ত ঘটনাটা তাহার মনে অমন সুস্পষ্ট হইয়া থাকার একটা কারণ।

সুবীরের চেহারার মধ্যে রূপ যে খুব বেশী ছিল, তাহা নয়। নাক, মুখ, গায়ের রং, প্রভৃতি হিসাব করিলে তাহাকে ঠিক সুপুরুষ বলা যায় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ বাঙালীঘরের মা, মাসী, পিসী, তাহাকে 'সোনার কার্ত্তিক ছেলে' বলিয়া কখনোই মানিয়া লইতেন না। প্রথমতঃ গায়ের রংটা তাহার ফর্সা নয়, শ্যামবর্ণই। শরীরটা লম্বা চওড়া হইলেও মুখের মধ্যে ড্যাবাড্যাবা চোখ, তিলফুল নাসা, বা আরক্ত অধর, কোনোটাই নাই। থাকিবার মধ্যে চোখে এবং মুখে বুদ্ধিমত্তার এবং মার্জ্জিত রুচির পরিচয় গভীর ভাবে আঁকা। মুখের ভাব বয়সের পক্ষে একটু বেশী গম্ভীরই বোধ হয়।

তবু ইহার চেহারাটা কৃষ্ণার মনে বড় বেশী দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। সুবীর যেদিন গলিতে কৃষ্ণাদের বাড়ীর সন্ধানে ফিরিতেছিল, সেদিন সে কৃষ্ণার চক্ষু এড়ায় নাই। ফুল ফেলিতে গিয়া সে সুবীরকে ভালো করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্যটা যে কি তাহাও বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, কারণ এ-সব বিষয়ে যুবতী রমণীর বুদ্ধির আতিশয্য সর্ব্বজনবিদিত। তবে তাহার ফেলা ফুলগুলি যে সুবীর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে সে ব্যাপারটা সে মোটেই চোখে দেখে নাই, প্রতিভার কাছে শোনা কথা।

এই ছোট ঘটনাটা কি কারণে জানি না, তাহাকে অসঙ্গত রকম চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিভার কথাগুলি যেন ক্রমাগতই তাহার কানে বাজে। বিকালবেলা সে বসিয়া নিজের একটা ব্লাউসে বোতাম লাগাইতেছিল। প্রতিভা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল। খানিক পরে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কৃষ্ণাদি, সব কাজই আপনি এমন সুন্দর ক'রে করেন যে ব'সে ব'সে দেখতে ইচ্ছা করে। সামান্য শেলাই করছেন, তাতে আঙুলগুলো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনি যার ঘরে যাবেন সে বোধহয় সব কাজকর্ম্ম ফে'লে ব'সে আপনাকে কেবল দেখবে।"

সাধারণতঃ শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীর মধ্যে এ-ধরণের কথাবার্ত্তা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণা এবং তাহার ছাত্রী-দুটির বয়স অনেকটা কাছাকাছি ছিল, তাহার

উপর অমিয়া এবং প্রতিভা বিবাহিতা, সুতরাং পদমর্য্যাদা তাহাদের সাধারণ ছাত্রীদের চেয়ে কিছু বেশী। কাজেই শিক্ষয়িত্রীকে তাহারা ঠিক "গুরুন" রূপে দেখিত না। খানিকটা বড় বোনের মতো ব্যবহারই ইহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণা পাইত। বিশেষ করিয়া প্রতিভা কৃষ্ণার এত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, উচ্ছ্বাসের অতিশয্যে তাহার সব সময় কি যে বলা উচিত এবং কি উচিত নয় তাহার সীমা ঠিক থাকিত না। কৃষ্ণার এখানে সঙ্গিনী কেহই ছিল না, কাজেই সে ইহাদের সঙ্গে গল্প করিয়াই সেই অভাবটা মিটাইয়া লইত।

প্রতিভার কথায় সে হাসিয়া বলিল, "এরকম নিষ্কর্ম্মা একটি মানুষের সন্ধান ত আজ অবধি পেলাম না। তার কি অন্য কিছু কাজকর্ম্ম থাকবে না? কেবল হাঁ ক'রে আমাকে দেখলেই পেট ভ'রে উঠবে?"

প্রতিভা বলিল, "আপনি খোঁজ না পেলেও অন্যরা কিন্তু পাচ্ছে।"

কৃষ্ণা ভাবিল, বুঝি বিপিনের কথাটারই উল্লেখ করা প্রতিভার উদ্দেশ্য। সে তাহাকে থামাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে মুখ একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "অন্যদের কল্পনা-শক্তিটা তা হ'লে খুব বেশী বেড়েছে বোঝা যাচ্ছে। ঐ দিকে অত মাথা না খাটিয়ে পড়াশোনার দিকে মন আর একটু দিলে ভালো হয় না?"

প্রতিভা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আপনি যা ভাবছেন, মোটেই আমি তা মনে ক'রে বলিনি। একজন লোকের কথা খুব ভালো ক'রে জানি ব'লেই বলছিলাম।"

কৃষ্ণা অত্যন্ত অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আবার? আমি এখানে কোনো মানুষকে চিনিই না, ত আমার সম্বন্ধে এ-সব খেয়াল কার মাথায় আসবে?"

প্রতিভা বলিল, "নাই বা চিন্‌লেন? আপনাকে চোখে দেখলেই ঢের। প্যাগোডাতে একটি ছেলে আপনাকে-খুব অবাক্ হয়ে দেখছিল মনে পড়ে? সেই, যাকে দে'খে ঠাকুরপো রেগে টং হ'য়ে উঠল?"

কৃষ্ণা বলিল, "হাঁ, মনে আছে।"

প্রতিভা বলিল, "সেই ছেলেটিই। সে নাকি কলকাতার দিকের মস্ত বড় জমিদার। লাখ লাখ টাকা তাদের। আপনি কোথায় থাকেন, কেমন ক'রে জানি না খোঁজ পেয়েছিল। গলির ভিতর ঘুরে ঘুরে সব বাড়ীগুলো দেখছিল। আপনি তখন ফুলদানীর থেকে কতকগুলো বাসিফুল ফেল্‌বার জন্যে জান্‌লার কাছে এলেন। আমি বড়দির ঘর থেকে দেখছিলাম। ফুল ফেলে দিয়ে আপনি চ'লে গেলেন, তারপর ছেলেটি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, ফুলগুলো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল।"

কৃষ্ণার বুকের ভিতরটা হঠাৎ দোলা দিয়া উঠিল। রোমান্স্ জিনিষটার সঙ্গে এতদিন কেবল বইয়ের পাতাতেই তাহার পরিচয় ছিল; এখন সেটা একেবারে তাহার জীবনের ভিতর আসিয়া পৌছিল। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তার নামধাম, টাকাকড়ির খবর সে ত গলিতে দাঁড়িয়ে তোমাকে চেঁচিয়ে ব'লে যায়নি? তুমি অত সব জান্‌লে কোথা থেকে?"

প্রতিভা বলিল, "ঠাকুরপোর সঙ্গে হঠাৎ কোন্ ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছেলেটির দেখা হয়। তিনি আলাপ করিয়ে দেন। ঠাকুরপো বুঝি তাকে রেঙ্গুন দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর ফির্‌বার সময় ছেলেটি তাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল। তার নাম সুবীর, পদবীটা ভুলে যাচ্ছি। বেশ নামটা, না?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বেশ! আচ্ছা, এখন আমার কাজ আছে একটু।" বলিয়া সে প্রতিভাকে জোর করিয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার খানিকক্ষণ একলা থাকা একান্ত দর্‌কার হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিন হইতে এই ক্ষণেকের দেখা মানুষটির কথা থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। সে কোথায় আছে এখন, কৃষ্ণাকে এখনও মনে রাখিয়াছে কিনা? বিপিন পুরুষ না হইয়া নারী হইলে তাহার কাছ হইতেই কৃষ্ণা অনেক খবর পাইতে পারিত। প্রতিভা তাহার ছাত্রী, তাহাকে

কিছু এ-সব কথা বলা যায় না, তাহা না হইলে সেও কৃষ্ণার খাতিরে বিপিনের কাছ হইতে খবর আনিয়া দিত।

কৃষ্ণার জীবনে ভালোবাসা জিনিষটারই বড় অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। পিতা, মাতা, ভাইবোন, শৈশবে, বাল্যে, মানুষের জন্য স্নেহের নীড় রচনা করিয়া রাখে। কৃষ্ণার আপনার বলিতে জগতে কেহই ছিল না। যৌবনে নারীর মন প্রণয়ীর প্রেম, শিশুসন্তানের অনির্ব্বচনীয় ভালোবাসার জন্য নিজের অজ্ঞাতসারেই ব্যাকুল হইয়া উঠে। বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেও তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিতে চায় না। আর যে নারীর চিত্তকে বাহিরের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিবার জন্য ভাগ্য কোনো ব্যবস্থাই করে নাই, তাহার হৃদয়ের এই দাবীই ক্রমে তাহার জাগরণ ও নিদ্রার সমস্ত ক্ষণগুলিকে জুড়িয়া বসে। কৃষ্ণার দশাও হইয়াছিল তাই। ঘরের কোণে বসিয়া ভাগ্যের কৃপণতার জন্য দুঃখ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। তাহার মনটা ছিল খুব বেশী দৃপ্ত এবং অহঙ্কারী। নিজের কাছেও সে স্বীকার করিতে চাহিত না যে কেবলমাত্র একটি মানুষের অভাবেই তাহার জগৎটা ম্লান আনন্দহীন ঠেকিতেছে। যতক্ষণ নিজেকে নানা কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা সম্ভব তাহা সে রাখিত। দুঃখের বিষয় এই বিদেশে তাহার সাধারণ রকমেরও দু-একটা বন্ধু ছিল না। কাজেই অবসর সময়ে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিত। কি করিয়া, কি লইয়া সে সমস্ত সময় কাটাইবে? ঘড়ির দিকে তাকাইলে তাহার রাগ হইত, ইচ্ছা করিত, কাঁটা ঘুরাইয়া দিন একেবারে শেষ করিয়া দেয়।

বিপিনের প্রণয়-নিবেদনটা খুব স্পষ্ট না হইলেও, তাহাকে ভুল বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার অন্তরের আসল কথাটি কৃষ্ণা ঠিকই জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে ডাকিয়া লইবে কি দ্বারের সম্মুখ হইতে ফিরাইয়া দিবে, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিত না। বিপিনকে মোটের উপর তাহার মন্দ লাগিত না, কিন্তু তাহার কাছে ভালোবাসার বন্ধনে ধরা দিতেও তাহার ইচ্ছা করিত না। একটি মানুষ আর

একটি মানুষকে কি দেখিয়া যে ভালোবাসে, তাহার চেয়ে হাজার গুণে যোগ্য অন্য একজনকে কেন যে বাসে না, এ সমস্যার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কোথা হইতে একটা রঙীন আলো আসিয়া পড়িয়া নিতান্ত সাধারণ একটা মানুষকে একেবারে অপরূপ করিয়া তোলে। কৃষ্ণার চোখে সে রঙের নেশা এখনও লাগে নাই, তাই বিপিনের স্বভাবের দোষ-ক্রটিগুলি মোটেই তাহার চোখ এড়াইত না। নিজে যে সে লেখাপড়া বেশী করিয়াছে, জগতের আর্ট, সাহিত্য, শিল্পের খবর বিপিনের চেয়ে বেশী বই কম রাখে না, এ কথাও সে ভুলিয়া থাকিত না। সবার উপরে তাহার আত্মাভিমানে বাধিত। সে যদি বিপিনকে বিবাহ করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে বিপিনের পরিবারে মহা হুলস্থুল বাধিয়া যাইবে, কারণ কৃষ্ণা নামে অন্ততঃ এখনও খ্রীষ্টান। কৃষ্ণাকে যে গ্রহণ করিবে, সে যেন সেটা সৌভাগ্য ভাবিয়াই করে, ইহাই তাহার হৃদয় দাবী করিত। দীনা ভিখারিণীর মত কোথাও অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া তাহাকে যাইতে হইবে, তাহাকে দেখিয়া কেহ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, ইহা ভাবিতেই যেন তাহার মস্তিষ্কে আগুন ধরিয়া যাইত।

কিন্তু সুবীরের উপর কোন্ শুভক্ষণে তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল বলা যায় না। তাহার কথা মনে করিলেই, কৃষ্ণার সন্ধানে তাহার গলিতে ঘোরা, কৃষ্ণার পরিত্যক্ত বাসি ফুল কুড়াইয়া লইয়া যাওয়া মনে পড়িলেই, কৃষ্ণার বুকের ভিতর কি যেন একটা মৃদু উত্তাপ ছড়াইয়া পড়িত। কত কল্পনাই যে একটার পর একটা তাহার মনের ভিতর দিয়া ভাসিয়া যাইত তাহার ঠিকানা নাই।

আজ বিপিনের হাতে সুবীরের ঠিকানা লেখা চিঠি দেখিয়া সে যেন চম্‌কাইয়া গেল। বিপিনের সঙ্গে ইহার এতখানি আলাপ জমিয়া উঠিল কি করিয়া? ইহাদের দেখি চিঠিপত্র লেখাও চলে। চিঠিখানার ভিতর কি আছে কে জানে?

যাহা হউক, তখন আর এই-সব ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র লেখা শেষ করিয়া, বেয়ারার হাতে সেগুলি পাঠাইয়া দিয়া কৃষ্ণা খানিক নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর নাওয়া-খাওয়া, ছাত্রীদের পড়া দেওয়া, তাহাদের পড়া নেওয়া, শেলাই শেখান, গান শেখান, ইত্যাদিতে দিনটা একরকম কাটিয়া গেল। বিকালবেলা কৃষ্ণার আবার অবসর। গাড়ী পাইলে সে ছাত্রীদের লইয়া 'রয়েল-লেক্‌স্'এ বেড়াইতে যাইত, না-হয় ঘরেই বসিয়া থাকিত। আজ গাড়ী পাওয়া যাইবে না, সে সকাল হইতেই জানিত। সুতরাং চুল বাঁধা, মুখ ধোয়া শেষ করিয়া, সে একখানা বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টায় বসিয়া গেল।

এমন সময় তড়িৎ হুড়মুড় করিয়া পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। আস্তে বা মৃদুভাবে কিছু করা তড়িতের স্বভাবেই নাই। সে ধপ্‌ করিয়া বই খাতা সব একটা চেয়ারে রাখিয়া বলিল, "জান, ছোট বৌদি, ইস্কুলের মেয়েগুলো কি ভীষণ দুষ্টু? আজ খুব একপালা ঝগড়া হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।"

প্রতিভা বলিল, "কেন, ঝগড়া হ'তে গেল কেন? তারা ভীষণ দুষ্টুই বা কবে থেকে হ'ল? এই না তোমার ক্লাশের সব মেয়েই খুব ভালো?"

তড়িৎ বলিল, "আগে ত ভালোই ভাবতাম। এখন দেখছি পেটে পেটে পেজোমীরও অভাব নেই। তলে তলে টীচাররাও যে মেয়েদের সঙ্গে যোগ দেন, এই ত মুস্কিল, তা না হ'লে সবাইকে আজ ঠিক ক'রে দিতাম।"

প্রতিভা বলিল, "আরে ছাই! কি হয়েছে তাই বল না। এখন অবধি ত কেবল বাজে কথাই চল্‌ছে।"

তড়িৎ বলিল, "আজ টিফিনের সময় আমাদের ক্লাসের শকুন্তলা এসে আমায় জিগ্‌গেস কর্‌ল কি জান? 'তোর বিপিনদা নাকি খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে কর্‌ছে?' আমি বল্‌লাম, 'তোমাদের কাছেই আগে খবরটা পৌঁছেছে দেখছি। আমরা ত কিছু জানি না'।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে সে কি বল্‌লে?"

তড়িৎ বলিল, "আমার হাড়সুদ্ধ জ্বালা কর্‌ছে, তার কথা মনে ক'রে। বল্‌লে কিনা 'এ-সব খবর বাড়ীর লোকেই সবার শেষে পায় রে। এ ত আর বাবা মায়ের পাতানো বিয়ে নয়, এ-সব হ'ল নিজেরা প্রেম ক'রে বিয়ে করা।

আমি বল্‌লাম, 'ছি ছি, এ-সব কথা আমার কাছে ব'লো না। আমার শুন্‌তেও লজ্জা করে। কৃষ্ণাদি এমন ভালো মেয়ে, তিনি কখনও এমন কাজ করবেন না'।"

প্রতিভা বলিল, "তুমি বেশ যা-হোক বাপু। ভালো মেয়েরা বুঝি বিয়ে করে না? না, বিয়ের আগে ভালোবাস্‌লেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়?"

তড়িৎ বলিল, "ওসব হিন্দু মেয়ের পক্ষে মহা পাপ।"

প্রতিভা বলিল, "আহা, একেবারে কি হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা এলেন গো। তা হ'লে সাবিত্রী, সতী, দেবযানী, সবাই মহাপাপী। আর আমরা সবাই, যাদের ধ'রে বেঁধে বিয়ে গিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সকলে তাদের চেয়ে অনেক ভালো।"

তড়িৎ রণে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেল। কৃষ্ণা যে পাশের ঘরে আছে, তাহা প্রতিভা জানিতই, সে তড়িৎ চলিয়া যাইতেই কৃষ্ণার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "শুন্‌লেন একবার তড়িতের কথা?"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, তড়িতের কথাও শুন্‌লাম, অন্যদের কথাও শুন্‌লাম। সমস্ত গাঁজাখুরী কথা রটিয়ে কার কি লাভ হচ্ছে জানি না। আমায় এবার পথ দেখতে হবে দেখছি।"

প্রতিভা বলিল, "কেন কৃষ্ণাদি? রাস্তার কুকুরে ঘেউ-ঘেউ করলে গেরস্থর কিছু এসে যায় না। যতদিন আমরা কিছু না বল্‌ছি, ততদিন আপনার বিরক্ত হবার কোনো কারণ নেই।"

কৃষ্ণা বলিল, "যথেষ্টই কারণ আছে। তবে বিরক্ত আমি অবশ্য তোমাদের উপরে হচ্ছি না, যদিও তোমরাও এই কথা নিয়ে আলোচনা না করলেই পারতে।"

প্রতিভা একটু অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে স্থির করিল, কৃষ্ণার সঙ্গে আর কোনোদিন গল্প করিতে যাইবে না।

কৃষ্ণা আবার বইয়ে মন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনটা তাহার একান্তই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে বেশ তাহার সুনাম ছড়াইতেছে বটে।

যেন সে পাকে-চক্রে এই বিবাহটা ঘটাইবার জন্মই চাকরী লইয়া এই সংসারে ঢুকিয়াছে। বিপিন বেচারীর কোনোই অপরাধ নাই, অথচ তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কথাটা উঠিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণা তাহার উপর সুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার নিজেকেই আঘাত করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। কেন মরিতে সে এখানে আসিতে গেল? না-হয় টাকাকড়ির এ সুবিধাটুকুও তাহার না-ই হইত? কলিকাতায় টাকা তাহার ছিল না বটে, কিন্তু এ-সমস্ত উৎপাত ছিল না।

যাইবার কোনো জায়গা থাকিলে বোধহয় কৃষ্ণা তখনই বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু অকরুণ-ভাগ্য জগতে তাহার জন্য এমন কোনো স্থান রাখে নাই, ইচ্ছা করিলেই যেখানে গিয়া জোর করিয়া ঢোকা যায়। কাহারও উপর তাহার দাবী নাই।

একটি মানুষের কথা কেবল তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতে লাগিল: সে কেন কৃষ্ণার আত্মীয় হইল না? তাহার কাছে ত সে আশ্রয় পাইতে পারিত। সে আশ্রয়ের মধ্যে অপমান কিছুই থাকিত না, আনন্দই থাকিত।

২৪

ভবানীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। চিকিৎসা, আদর-যত্ন, কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু কিছুতেই তাহার কোনো উপকার দর্শিতেছিল না। সে নিজেও যেন না-সারার দিকেই মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। কিসের একটা যন্ত্রণা তাহার জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। কোনোরকমে ইহার শেষ হইলে যেন সে বাঁচে। ভানুমতী বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার মনের এই ব্যথার কোনো স্পষ্ট সন্ধান পান নাই। বলিবে বলিবে করিয়াও সে শেষমুহূর্তে থামিয়া যাইত।

ভবানীকে দাসীরূপে কেহ কখনও দেখে নাই। এখনও বাড়ীর আত্মীয়ার মতো ব্যবহারই সে পাইতেছিল। তাহার আলাদা ঘর, খাট-

বিছানা, দেখাশোনা করিবার জন্য একজন দাসী, কিছুরই অভাব ছিল না। সুবীরদের পারিবারিক চিকিৎসক যিনি, তিনি রোজ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেন, প্রয়োজন হইলে অন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়া পরামর্শ করিতে পারেন, সে কথাও বারবার বলিতেছিলেন। ভবানী ক্রমাগত আপত্তি করিয়া ইহা ঠেকাইয়া রাখিতেছিল। ঔষধ-পথ্য খাওয়া লইয়াও সে গোলমাল করিত। ভানুমতীকে দেখিলেই তাহাকে বলিত, "বাছা, মরুতে বসেছি, স্বস্তিতে মরুতে দাও। বুড়ো-হাড়-কখানাকে যতই ওষুধে ভেজাও, এ আর তাজা হবে না।"

সুবীর দিনে দুইতিনবার আসিয়া আসিয়া ভবানীকে দেখিয়া যাইত। একেই তাহার মনটা বড়ই উতলা হইয়া ছিল, বাড়ীর এই নিরানন্দ আব্‌হাওয়ায় সে যেন আরো মুষ্‌ড়াইয়া যাইতেছিল। কলেজে যাওয়াও একরকম ছাড়িয়া দিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "পরের বছর বিলেতে যাওয়া একরকম ঠিকই ক'রে ফেলেছি, শুধু শুধু এখানের কলেজের সিঁড়ি ভেঙে আর কি হবে?"

কলিকাতা ছাড়িয়া আর-একবার বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল ভবানীর এই অসুখের জন্য তাহার যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছিল না। কেবল মানসিক অশান্তিই যে তাহাকে তাগিদ দিতেছিল তাহা নয়, মিত্রদের বাড়ী হইতে শীঘ্র বিবাহ করিবার সকাতর অনুরোধও তাহাকে কম অস্থির করে নাই। কোনোরকমে ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইলে সে একটু নিশ্চিন্ত হইত। পিতা মারা গেলে এক বছর অন্ততঃ সন্তানের বিবাহ নিষিদ্ধ, এই-জন্য মেয়ের বাড়ীর লোকেরা একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার পিছনে লাগিয়াছিল। পাওনাদারকে এড়াইবার জন্য মানুষ যেমন পলাইয়া বেড়ায়, সুবীরও তেমনই এই প্রজাপতির দূতগুলিকে এড়াইবার জন্য দিনের বেশীর ভাগ সময় পলাইয়া বেড়াইত।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া মায়ের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলিয়া ও ভবানীকে দেখিয়া আসিয়া সে নিজের বসিবার ঘরটিতে দরজা বন্ধ করিয়া বসিত।

সামনের জান্‌লা-দুইটা খুলিয়া দিত, নীচের বাগানের ফুলের সুগন্ধ যাহাতে অবাধে ভাসিয়া আসিতে পারে। তাহার পর সে এক অদ্ভুত কাজে প্রবৃত্ত হইত। চিঠির কাগজের প্যাড লইয়া ক্রমাগত চিঠি লিখিয়া যাইত। সে চিঠি যাহার উদ্দেশে, তাহার কাছে সেগুলি পৌছিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাহার নাম ছাড়া সুবীরের আর কিছুই জানা ছিল না, চোখের দেখাও সে তাহাকে চার-পাঁচবারের বেশী দেখে নাই। কিন্তু হৃদয়ের ভিতর তাহাকেই নিজের অন্তরতম আত্মীয়রূপে সুবীর বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই তাহার অপরিচিতা প্রেয়সীর কাছে কিছু তাহার গোপন ছিল না। মনের যত আশা, আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের যত সফলতার আনন্দ, নিষ্ফলতার বেদনা, সব সে ইহারই উদ্দেশে কাগজের শুভ্র বুকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছিল। আশ্চর্য্য যে এই পাগলামীতে গা ঢালিয়া দিয়া সত্যই সে কৃষ্ণাকে নিকটে অনুভব করিত, দুজনের মাঝখানের অনন্ত-বিস্তৃত সাগরকেও ভুলিয়া যাইত।

মাঝে ভানুমতী আসিয়া দরজায় ঠেলা দিয়া আহারের তাগিদ দিতেন বাহিরে খাইয়া আসিয়াছে বলিয়া কোনোদিন বা তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিত, কোনোদিন বা মনে ব্যথা পাইবেন এই আশঙ্কায় চিঠি-পত্র দেরাজে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিত।

খাইয়া আসিয়া আবার দেরাজের সম্মুখে বসিত। এবার আর চিঠি লেখা নয়, কাগজ পেন্সিল ইরেজার প্রভৃতি লইয়া সে ছবি আঁকিতে বসিত প্রথম প্রথম কোথাও কিছু মিলিত না। তাহার পর সাধনার গুণে তাহার মানসসুন্দরী ক্রমে রূপগ্রহণ করিতে লাগিল। প্রথমে চিবুক, তাহার প সমুন্নত নাসিকা, তাহার ঠোঁটদুটির বঙ্কিম রেখা, সর্ব্বশেষে আশ্চর্য্য চক্ষু-দুইটি কাগজের বুকে ফুটিয়া উঠিল। কৃষ্ণার দৃপ্ত গ্রীবার ভঙ্গিমা, চক্ষুর জ্যোতির্ময় দৃষ্টিটি রেখার বন্ধনে ধরিতে পারিল না বলিয়া সুবীরের দুঃখ থাকিয়া গেল।

সে নিজে কোনোদিন ছবি আঁকা ভালোভাবে শিক্ষা করে নাই। তবে নিজের খেয়াল-খুসি মতো, কাগজে আঁচড় টানা তাহার চিরদিনের অভ্যাস

এখন এই খেলার সরঞ্জাম লইয়াই সে অসাধ্যসাধনে লাগিয়া গেল। যতটা পাইতে চাহিয়াছিল, ততটা তাহার সাধ্যে কুলাইল না, তবু আশার অতীত ফল সে পাইল। কিন্তু ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার একটা প্রবল নেশা তাহাকে পাইয়া বসিল।

প্রথমে স্থির করিল, নিজেই মাষ্টার রাখিয়া ছবি আঁকা ভালো করিয়া শিখিয়া লইবে। কিন্তু অত সবুর তাহার সহিল না। তাহার পরিচিত-মণ্ডলীর মধ্যে পেশাদার চিত্রকরের অভাব ছিল না। নিজের আঁকা অসমাপ্ত রেখাঙ্কনগুলি লইয়া সে একজনের কাছে একদিন গিয়া উপস্থিত হইল।

বলিল, "এইগুলির থেকে আন্দাজ ক'রে আপনাকে একখানি রঙীন ছবি এঁকে দিতে হবে। আঁক্‌বার সময় আমি কাছেই থাক্‌ব, আপনাকে ব'লে ব'লে খানিকটা আইডিয়া দিতে পারব। আপনাকে খাটতে হবে খুবই, কিন্তু তার fees যত চান তা পাবেন।"

চিত্রকরটির বয়স অল্প, এই-ধরণের ব্যাপারে তাহার সহানুভূতি যাইবার সময় আসে নাই। তাহা ছাড়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবারও আশা ছিল, কাজেই সে রাজীই হইয়া গেল।

পরদিন হইতে দুইটি মানুষে মিলিয়া এক অদৃশ্য সুন্দরীর রূপ কাগজে ফুটাইয়া তুলিবার কাজে লাগিয়া গেল। অনেকবার অনেক রকম করিয়া রেখা টানিতে হইল, অনেকস্থানের রং মুছিয়া পুনর্ব্বার রং দিতে হইল, চুলের ঢেউ, গ্রীবার ভঙ্গী, ঠোঁটের হাসি, সব বার বার ফাঁকি দিয়া অবশেষে ধরা দিল। একমাসখানেক অশেষ পরিশ্রমের ফলে শেষে একদিন সুবীরের মনোমন্দির ছাড়িয়া তাহার জীবনলক্ষ্মী তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখেই আসিয়া দাঁড়াইল।

সুবীর ছেলেমানুষের মতো খুসী হইয়া উঠিল। চিত্রকরকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিয়া সে ছবিখানি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। খানিকদূর গিয়া তাহার তখনই বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করিল না। সেখানে গিয়া ত তাহার

দরজায় খিল দিয়া বসিতে হইবে? না হইলেই হাজার উৎপাত। কিন্তু তাহার মনটা তখনই কোটরে প্রবেশ করিতে চাহিল না। ড্রাইভারকে সে গাড়ী ঘুরাইয়া লইতে বলিল। ভবানীপুরের বদলে শিবপুরে উপস্থিত হইয়া সে গাড়ী বিদায় করিয়া দিল। ড্রাইভারকে বলিয়া দিল, সে যেন বাড়ী গিয়া মাকে বলে যে স্থবীর একটু বেড়াইয়া ষ্টীমারে ফিরিয়া যাইবে, তাহার জন্য কোনও ভাবনা না করা হয়। ড্রাইভার গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

সারা সকাল এবং দুপুরেরও খানিকটা স্থবীর শিবপুরের বাগানেই কাটাইয়া দিল। ছুটির দিন না হইলে এখানে মানুষের ভিড় বেশী হয় না, নিরালা স্থান খোঁজ করিলেই পাওয়া যায়। নিজের সঙ্গিনীটিকে লইয়া এইরকম অনেক স্থানে বসিয়া সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ষ্টীমার-যোগে কলিকাতায় ফিরিয়া, ট্রামে চড়িয়া বাড়ী চলিল।

দিনের প্রথম ভাগটা যেমন সুন্দররূপে কাটিয়াছিল, শেষের দিক্‌টা মোটেই তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না। বাড়ীতে আসিয়া প্রথমেই মায়ের সঙ্গে খানিকটা বকাবকি করিতে হইল; তাহার পর শুনিল যে, ভবানীর অবস্থা অন্যদিনের চেয়েও আজ খারাপ। তাহাকে গিয়া একবার দেখিয়া আসিল। ভবানী তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল, স্থবীর আর তাহাকে বিরক্ত না করিয়া পা টিপিয়া চলিয়া আসিল।

নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে স্থির করিল স্নান করিয়া খাইয়া খানিকটা ঘুমাইয়া লইবে। তাহার পর ছবিখানা বাঁধাইবার জন্য লইয়া যাইবে। যদিও দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা চলিবে না, তবু এমনি রাখিয়া দিলে রং জ্বলিয়া যাইবার ভয় আছে। এই কাজের ভার আর কাহাকেও সে ভরসা করিয়া দিতে পারিল না, কারণ ধরা পড়ার এবং জিনিষটি পছন্দমতো না হওয়ার, দুই সম্ভাবনাই ছিল। ছবিখানি টেবিলের উপর কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া, সে স্নানাহারে মন দিল।

সকালবেলাটা কাটিয়াছিল তাহার অশরীরী তরুণ দেবতার আরাধনা করিয়া। এখন হাঁজির হইলেন বৃদ্ধ প্রজাপতি, নিজের নৈবেদ্য জোর করিয়া আদায় করিতে। সুবীর খাইতে খাইতেই শুনিতে পাইল, তাহার মেজ মাসীমাতা ঠাকুরাণী বক্তৃতা করিতে করিতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতেছেন। সঙ্গে অপেক্ষাকৃত তরুণ কণ্ঠস্বরও দু-একটা শোনা যাইতেছিল। কাজেই সুবীর আন্দাজ করিল, তিনি সদলবলেই আবির্ভূত হইয়াছেন।

খাওয়া শেষ হইবামাত্রই তাহার মায়ের ডাক পড়িল। সুবীর বিরক্ত মনটাকে খোঁচা দিয়া আরো বেশী বিরক্ত করিয়া তুলিল। কারণ, যে নারীবাহিনীর সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, মনে যথেষ্ট তাপ না থাকিলে সেখানে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। যাইবার আগে কাগজের আবরণ তুলিয়া সে কৃষ্ণার ছবিটিকে একবার দেখিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "তোমার আমার মাঝের একটা ব্যবধান অন্ততঃ আজ আমি ভেঙে দিয়ে আসব।"

তাহার মেজ মাসীমা, কন্যা নাত্‌নী সকলকে লইয়া আসিয়াছিলেন। নাত্‌নীটির সঙ্গে সুবীরের মন্দ বনিবনাও ছিল না, কিন্তু দুর্গার সঙ্গে তাহার আলাপ দুতিন মিনিটের পরেই ঝগড়া অথবা তর্কে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আধুনিক সব-কিছু জিনিষ সম্বন্ধে প্রবলভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করা দুর্গার একটা অভ্যাস ছিল। তাহার স্বামী একটি নব্য হিন্দু; তিনি বেদবেদান্ত, সংহিতা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, সব-কিছু মানিয়া চলেন। কাজেই দুর্গা তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইবার চেষ্টায় নিজেও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আত্মীয় বন্ধু সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার স্বামী পছন্দ করেন না বলিয়া সে জুতা পায়ে দিত না, ব্লাউস পেটিকোট পরিত না, মাংস খাইত না। বিবাহের আগে লেখাপড়া যেটুকু শিখিয়াছিল, তাহাও ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা যথাসাধ্য করিত।

সুবীর ঘরে ঢুকিতেই দুর্গা বলিয়া উঠিল, "কি গো সাহেব, কেমন আছ?"

সুবীর বলিল, "দিব্যি আছি। তোমার হিন্দুধর্ম্মের বিশাল খুঁটিটি কেমন আছেন ?"

দুর্গার স্বামীটি বেশ কিছু মোটা। ইহা লইয়া ভাই বোন সকলেই তাহাকে ক্ষেপাইত, এবং সেও যথোচিত ক্ষেপিতে ক্রটি করিত না। সুবীরের কথায় সে যথেষ্ট ঝাঁজের সহিত বলিয়া উঠিল, "সবাইকে যে তোমার মতো ফড়িং-বাবাজী হতে হবে, তার কিছু মানে নেই।"

তাহার মা বলিলেন, "থাম, থাম, দিন দিন যেন পাগ্‌লামী বাড়্‌ছে। ভাই বোনে যদি ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বল্‌লে, অমনি মেয়ের মাথায় ক্ষ্যাপাচণ্ডী চ'ড়ে গেল। দেখ্‌ খোকা, তোকে বল্‌লেই ত চ'টে যাবি, অথচ না ব'লেও ত পারি না।"

সুবীর বলিল, "চটবার মত কথা হয় ত না-ই বল্‌লে ? আমার ত চ'টে কিছু লাভ হবে না ?"

শোভাবতী বলিলেন, "মিত্তিরদের গিন্নী ত আজ কেঁদে কেটে আমার বাড়ী এসে ধ'রে পড়েছেন। তাঁর স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ, মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে না পার্‌লে ম'রেও ভদ্রলোক শান্তি পাবেন না। জানিস্‌ ত, আমাদের হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা ? বিধবা মানুষের কোনো জোরই সেখানে খাটে না। আজ তিনি ঘরের গিন্নী, কাল হয়ত জায়েরা তাঁকে উঠ্‌তে বসতে নাকের জলে চোখের জলে করবে। তুই শুধু বিয়েটা কর্‌, তারপর পাঁচ বছর মেয়েকে ঘরে না আন্‌তে চাস তাতেও কেউ কিছু বল্‌বে না।"

সুবীর বলিল, "এক কথা একশবার ব'লে আমায় লাভ নেই, মাসীমা। বিয়ে এখন আমি কিছুতেই করব না। আমার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, তা যদি তাঁরা রাখেন ভালো, তা না হয় অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিন। পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করার বিরুদ্ধে আমি ঢের বক্তৃতা করেছি, এখন নিজেই সেইটি কর্‌তে রাজী নই। মেয়ের অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ কর্‌তে ত দুবছর দেরি আছে, আমিও একবার বিলেত ঘুরে আস্‌তে চাই।"

দুর্গা বলিল, "তবেই তুমি মিত্তিরদের মেয়ে বিয়ে করেছ। একটি মেম সঙ্গে ক'রে জাহাজ থেকে নাম্‌বে আর-কি !"

সুবীর বলিল, "মেমের জন্যে বিলেত যাবার কি দরকার? এ দেশেই ঢের পাওয়া যায়।"

দুর্গা বলিল, "তা হলে গোড়ায় তাঁদের বল্‌লেই পারতে যে, আমার মেম পছন্দ, আমি বাঙালী মেয়ে বিয়ে করব না। শুধু শুধু তাঁদের আশা দিতে গেলে কেন ?"

সুবীর বলিল, "আমি ত তাঁদের সেধে আশা দিতে যাইনি? তাঁরা যদি গায়ের জোরে আশা আদায় করেন ত আমি কি করতে পারি? যেটুকু কথা দিয়েছিলাম তা আমি রাখতে রাজী আছি, যদি তাঁরা আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু এটা জেনেই যেন দেন, যে, যতটুকু মত আমার আগে এ বিয়েতে ছিল, এখন তাও নেই।"

ভানুমতী বলিয়া উঠিলেন, "কেন রে? আরো মত না থাকবার মতো কি হয়েছে? তারা বিপদে প'ড়ে বেশী ধরাধরি করছে, কিন্তু সেটা ত মেয়ের দোষ নয় কিছু। তাকে তার জন্যে অপছন্দ হবার কিছু কারণ নেই।"

সুবীর বলিল, "মা, পছন্দ অপছন্দ ত কারুর হাতেধরা জিনিষ নয়। সে মেয়েকে অপছন্দ করার কারণ না থাক্‌লেও, অন্য মেয়ে তার চেয়ে আমার পছন্দ বেশী হতে পারে।"

তাহার শ্রোত্রী-তিনজন একসঙ্গেই কথা বলিয়া উঠিলেন। দুর্গা গলাটা সবার উপর তুলিয়া বলিল, "তাই বল বাপু। তলে তলে কোথায় পছন্দমতো মেয়ে ঠিক ক'রে রেখেছ। সে কথা বল্‌লেই হ'ত। এতক্ষণ শাক দিয়ে মাছ চাপা দেবার চেষ্টা করছিলে কেন ?"

শোভাবতী বলিলেন, "তাহ'লে সেই কথাই তাদের ব'লে দেওয়া ভালো। অপছন্দ হ'লে বিয়ে ক'রে লাভ কি? তারপর চিরজীবন ভোগ চলবে।"

ভানুমতী বলিলেন, "হাঁরে, কার মেয়ে তুই দেখলি? কারো বাড়ীতে ত তুই যাস না? শেষে কোন্ ঘরের না কোন্ ঘরের মেয়ে এনে জুটোবি? কাদের মেয়ে?"

সুবীর বলিল, "জানি না, মা। অদৃষ্টে থাকে ত একেবারে নিয়ে এসে দেখাব।"

শোভাবতী দলবল লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "মিথ্যে ভোগালে, বাছা। আগে এই কথা বললেই হ'ত। তোমার অন্য মেয়ে পছন্দ জান্‌লে কেউ নিজের মেয়ে জোর ক'রে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইত না। এখন মানুষটাকে গিয়ে আমি বলি কি? কেঁদেই খুন হবে হয়ত।"

সুবীর বলিল, "ইচ্ছা ক'রে কিছু ভোগাইনি, মাসীমা। আমার গোড়ার থেকেই এ ধরণের বিয়েতে মত ছিল না, তোমরা সকলে জোর ক'রে এর মধ্যে আমায় জড়িয়েছিলে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এই বিয়ে করলে মেয়ের প্রতিও আমার অন্যায় করা হবে, নিজের প্রতিও অন্যায় করা হবে। সুতরাং এখন থেকে সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো।"

শোভাবতী চলিয়া গেলেন। সুবীরও নিজের ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার মা বলিলেন, "দাঁড়া, দাঁড়া, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।"

সুবীর অগত্যা তাহার মায়ের খাটের উপর বসিয়া বলিল, "কি বলবে বল। খুব খানিকটা রাগ করবে ত?"

ভানুমতী বলিলেন, "না বাছা, রাগের কথা নয়। তুই আমার একমাত্র ছেলে, বিয়ে ক'রে অসুখী হবি এ আমি কখনও চাইব না। মিত্তিরদের মেয়েটি আমার খুব পছন্দ ছিল, ভারি সুন্দর দেখতে, বড় ঘরেরও, তা তোর যদি পছন্দ অন্য জায়গায়, তাহ'লে আর কি করব?"

সুবীর বলিল, "মা, তুমি কখনও অবুঝ হবে না, তা আমি মনে মনে জান্‌তামই। তা না হ'লে কি আর সাহস ক'রে এ বিয়ে আমি ভেঙে দিতে

পারতাম? যতই অসুখী নিজে হই, তোমাকে অসুখী করবার সম্ভাবনা আছে জানলে আমি কিছু করতে পারতাম না।"

ভানুমতী বলিলেন, "কিন্তু কার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই ত বল্‌ছিস না। কোথায় দেখলি তুই তাকে?"

সুবীর বলিল, "কার মেয়ে কিছু জানি না, মা। কিন্তু সে মেয়েকে যে নিজের ঘরে আনতে পারবে, সে কোনোদিন দুঃখ পাবে না, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি।"

ভানুমতী বলিলেন, "তা ত বুঝলাম। কিন্তু কোথায় তুই তাকে দেখলি?"

সুবীর বলিল, "রেঙ্গুনের বৌদ্ধমন্দিরে প্রথম দেখেছিলাম।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব বুঝি ভালো দেখতে?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ মা। এতদিন পর্য্যন্ত তোমার মত সুন্দর কোনো মেয়ে আমি দেখিনি, কিন্তু এ মেয়ে যেন তোমার চেয়েও সুন্দর। একটা জিনিষ আমার ভয়ানক আশ্চর্য্য লাগল যে, এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার চেহারার খুব বেশী সাদৃশ্য আছে।"

ভানুমতী বলিলেন, "তাই নাকি রে? কাদের মেয়ে কিছু খোঁজ করলি না? কতবড় মেয়ে? তার বিয়ে হয়ে যায়নি ত?"

সুবীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "মা, তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সব কথাই বল্‌ছি। খোঁজ আমি নিয়েছিলাম। মেয়েটির মা বাবা কেউ বেঁচে নেই, সে ওখানের এক বাঙালী পরিবারে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। বয়স কত ঠিক জানি না, তেইশ চব্বিশ হতে পারে। বিয়ে এখন পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু একটা জিনিষ শুন্‌লে হয়ত তুমি একটু দুঃখিত হবে। মেয়েটির মা বাবা তার খুব শিশুকালেই মারা যান। একজন খ্রীষ্টান ধাত্রী তাকে মানুষ করেছিলেন, লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।"

ভানুমতী বলিলেন, "তা এ নিয়ে একটু গোলমাল হ'তে পারে বটে। না জেনে শুনে ঠিক ক'রে ফেললি? যাক্, যা হবার তা হয়েছে, এখন একটু ভালো ক'রে খোঁজখবর নিতে হবে।"

২৫

সকালে চা খাইয়া, একবার চন্দ্রদের বাড়ীর দিকে যাইবে মনে করিয়া সুবীর চুল আঁচড়াইতেছিল, তাহার মা এমন সময় আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ছেলের প্রসাধনে বাধা দিয়া বলিলেন, "এত চুল আঁচড়াবার ঘটা যে সকাল বেলাই? কোথায় যাচ্ছিস? কলেজে নাকি?"

সুবীর বলিল, "না, সকাল আটটায় কলেজ পাব কোথায়? একটু চন্দ্রদের বাড়ী যাচ্ছিলাম।"

ভানুমতী বলিলেন, "পড়াশুনো সব উঠিয়েই দিলি যে রে? তোকে অবিশ্যি চাকরী ক'রে খেতে হবে না, তবু চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা কি ভালো?"

সুবীর বলিল, "সামনের বছর, বিলেতে গিয়ে খুব ভালো ক'রে পড়ব, শুধু শুধু এখানকার কলেজে গিয়ে আর কি হবে?"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ, বিলেতে যাবে বই কি? তারপর মা বুড়ী এখানে ম'রে থাকুক, ছেলের হাতের আগুনটুকুও তার অদৃষ্টে জুটবে না। সে না-হয় নাই মানলি; কিন্তু কোথায় চব্বিশ বছরের বৌ ঠিক ক'রে এসেছিস, সে কি তোর আশায় ব'সে মাথার চুল পাকাবে? কাকে বিয়ে ক'রে ব'সে থাকবে।"

সুবীর বলিল, "তাকে কি রেখে যাব? বিয়ে ক'রে নিয়েই যাব। সেও পড়বে। তুমিও যদি আসতে রাজী হতে তা হ'লে আর কোনো কথাই থাকত না। সবাই মিলে কয়েক বছর কাটিয়ে তারপর দেশে ফেরা যেত।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা নয় তাই। বিলেত যাবার ঠিক লোকই বেছেছিস্! তা তুই বিয়ে ক'রে যেতে চাস্ যাস্। এই বিয়েতেই যখন বাধা দিচ্ছি না, তখন আর কিছুতেই দেব না। আমার অদৃষ্টে থাকে আবার তোর মুখ দেখতে পাব।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে যখন জাহাজে উঠব, তখনকার কথা। এখন থেকেই মন খারাপ ক'রে লাভ কি? যাওয়া যে হয়েই উঠবে, তাই বা কে বলতে পারে? কিন্তু তুমি এমন সময় আমার ঘরে এসে পড়লে কি মনে ক'রে?"

ভানুমতী বলিলেন, "ঐ দেখ, কাজের কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। জানিস রে, মিত্তিররা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে মেজদির ছেলের সঙ্গে?"

সুবীর বলিল, "সুশীলের সঙ্গে? কোনও চাকরী না জুটিয়েই ছেলে আগে বৌ জোটাতে চল্‌ল?"

ভানুমতী বলিলেন, "কেন রে? তোদের মতো জমিদারীই নেই না-হয়, তা ব'লে মেজদি কি আর একটা বৌকে খাওয়াতে পারবে না? অমন সুন্দর মেয়ে হাতে পেলে কি আর কেউ ছেড়ে দেয়? তোর মতন ত সবাই নয়?"

সুবীর বলিল, "যাক, ভালোই হ'ল। মেয়েটিকে বৌ করবার ভয়ানক সখ ছিল তোমাদের, শেষ অবধি বৌই হ'ল। দুঃখের বিষয় আমি আর তার মুখ দেখতে পাব না, একেবারে ভাসুর হয়ে বসলাম।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা, ফাজলামী করতে হবে না। পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছিল তারা, তখন জেদ ক'রে ফিরিয়ে দিল, এখন আবার ঢং হচ্ছে। কত রূপসী বৌ তোমার আসে দেখা যাবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, বাঙ্গালীর ঘরে এত সুন্দরী মেয়ে লাখে একটার বেশী মেলে না।"

সুবীরের একবার ইচ্ছা হইল, কৃষ্ণার ছবিখানা বাহির করিয়া ভানুমতীকে দেখায়, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। চুল আঁচড়ান শেষ করিয়া সে বলিল, "আহা, এমন একটা নবম আশ্চর্য্য কিছু নয়। তুমিই ওর বয়সে ওর চেয়ে দেখতে ভালো ছিলে।"

ভানুমতী হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "তুই ত মায়ের মতন সুন্দরী কোথায়ও দেখিস্ না।"

সুবীর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ভাবানীদিদি কেমন আছে?"

ভানুমতী বলিলেন "সেই একই রকম। ডাক্তাররা যে কি করছে তারাই জানে। আমি ত কিছু ভালো দেখছি না।"

ভানুমতী চলিয়া যাইবার পর সুবীর বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, দিন-কতকের জন্য আবার কোথাও পলাইতে হইবে। সুশীলের বিবাহে যোগ দিতে যাওয়া তাহার দ্বারা ঘটিবে না। কন্যা-পক্ষ ত তাহাকে দেখিয়া ইট ছুঁড়িয়া না মারে ত ঢের, বরপক্ষেও মাসীমা তাহার উপর মর্ম্মান্তিক খুসী হইয়া নাই। তাহার উপর শ্রীমতী দুর্গার ক্ষুরধার রসনা আছে। একমাত্র দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে তাহাকে, সুশীল। কিন্তু একে সে সুবীরের চেয়ে বয়সে ছোট, তাহার উপর এই বিবাহের সে বর, কাজেই আশীর্ব্বাদটা তাহাকে মনে মনেই করিতে হইবে। সকল দিক্ ভাবিয়া বিবাহের সময়ে না থাকাই সুবীর স্থির করিয়া ফেলিল।

চন্দ্রের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, সে একটা বেতের ঝাঁপি লইয়া বাজার করিতে চলিয়াছে। ইন্দ্র একটা ঝাড়ন এবং ঝাঁটা লইয়া ঘরদোর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

সুবীর চৌকাট পার হইয়া বলিল, "এ কি হে? এমন ভীষণ স্বাবলম্বন কেন?"

চন্দ্র বলিল, "ঝি পালিয়েছে।"

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "ছোট বৌএর জ্বর হয়েছে।"

সুবীর বলিল, "যাক, তাহ'লে আর তোমাদের অবকাশ নেই এখন। আমি একটু পরামর্শ করবার লোক খুঁজছিলাম।"

চন্দ্র বলিল, "বোস, বোস, চা খাও। বড় বৌ এখনও খাড়া আছেন, কাজেই বাজারটা ক'রে দিয়েই আমি খালাস। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি।" ইন্দ্র চা করতে ব'লে আয়।

ইন্দ্র ঝাড়ন ও ঝাঁটা রাখিয়া ভিতরে চলিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দু-মিনিটেই এসে পড়বে। দেখুন সুবীরবাবু, আপনি আজকাল যে-সব বিষয়ে ইণ্টারেষ্ট্ নেন, আমার দাদাটি মোটেই সে-সব ব্যাপার য়্যাপ্রুভ

করেন না। কাজেই পরামর্শ করতে চান ত আমার সঙ্গেই করুন। আমার যদিও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তবু রোমান্স সম্বন্ধে সহানুভূতি যায়নি।"

সুবীর বলিল, "খুব রোমান্টিক ব্যাপার কিছু নয়, কলকাতা ছেড়ে মাস-খানেকের মতো বেরিয়ে পড়তে চাই। কোথায় যাব সেটা ঠিক করা দরকার এবং সঙ্গে একজন সঙ্গী দরকার।"

ইন্দ্র বলিল, "প্রথমটার উত্তর, রেঙ্গুন। দ্বিতীয়টা একটু ভেবে দেখতে হবে।"

সুবীর বলিল, "রেঙ্গুন ত ডিসেম্বর মাসে যাচ্ছিই। নভেম্বরটা অন্য কোথাও কাটাতে চাই।"

ইতিমধ্যে চা আসিয়া পৌছিল। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুবীর বলিল, "আর কিছু না জোটে ত দেশে জমিদারী তদারক করতে যাওয়া যাবে। অনেক-কাল যাইনি। তুমি চল না হে?"

ইন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল, "আরে মশাই, বলেন কি? তাহলে এ বাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না। দেখছেন না, কেমন নিষ্ঠাসহকারে ঘর ঝাঁট দিচ্ছি? এতেই বোঝা উচিত ছিল আপনার। স্ত্রীর জ্বর, মাত্র দেড় বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, এখন কি ফে'লে যাওয়া যায়? বছর-চার যাক্, তখন ও-সবের লাইসেন্স পাব।"

বাজারের ঝাঁপি হাতে চন্দ্র এই সময় ফিরিয়া আসিল। ডাক দিয়া বলিল, "খুকী, বাজার ভিতরে নিয়ে যা।"

বছর-দশের একটি মেয়ে আসিয়া ঝাঁপিটা উঠাইয়া লইয়া গেল। চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে?"

ইন্দ্র বলিল, "এই অসুখ-বিসুখ।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, এমন একটা জায়গার নাম করতে পার যেখানে নভেম্বর মাসটা বেশ ভাল কাটে?"

চন্দ্র বলিল, "বাংলাদেশে, না তার বাইরে?"

সুবীর বলিল, "বাইরে না হ'লেই ভালো।"

চন্দ্র বলিল, "তা হ'লে বলতে পারি না ; কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের আর কোনো জায়গা বাসযোগ্য আছে কিনা আমার জানা নেই। অনেক-কাল ওসব খোঁজ নিইনি !"

সুবীর বলিল, "শেষ অবধি জমিদারী দেখতেই যেতে হবে দেখছি। চন্দ্র আমার সঙ্গে যাবে ?"

চন্দ্র বলিল, "আমার ত সাম্‌নের বছর বিলতে যাবার প্রস্পেক্ট্ নেই ? এম্-এ লেক্‌চারের জন্যে চিন্তা নেই, কিন্তু ল লেক্‌চারগুলোয় অত ফাঁকি দিলে চল্‌বে না।"

সুবীর বলিল, "তবে থাক, কারো ল' লেক্‌চার, কারো কার্টেন লেক্‌চার, ছুটি পাবার জো নেই। বেশ, আমি একলাই যাব।"

ইন্দ্র বলিল, "যাবার দিন যদি কিছু পিছিয়ে দেন, তা হ'লে আমি যেতে পারি। ধরুন আর এক সপ্তাহ পরে।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা দেখি। একটি বিশেষ পারিবারিক উৎসব এড়াবার জন্যে প্রধানতঃ আমার যাওয়া। সেটা কোন্ তারিখে হচ্ছে জান্‌তে পারলে যাওয়ার দিন ঠিক করতে পারি। আজ সন্ধ্যার সময় ঠিক খবর দিতে পারব।"

বাড়ী পৌঁছিয়া সুবীর ভানুমতীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সুশীলের বিয়েটা হচ্ছে কবে ?"

মা বললেন, "বেশী দেরি আর কই ? তারা ত তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে ফেল্‌তে পারলে বাঁচে। আর দিন-দশ আছে বোধহয়। মেজদি ত পরশু থেকেই ওদের ওখানে গিয়ে থাক্‌তে বল্‌ছে। তা ভবানীর এরকম অসুখ, ফে'লে যাব কি ক'রে? বিয়ের দিন, বৌ-ভাতের দিন গিয়ে গিয়ে ফিরে আস্‌তে হবে আর-কি ?"

সুবীর বলিল, "মা, তুমি হয়ত শুন্‌লে খুব চ'টে যাবে, কিন্তু আমি এ বিয়েতে থাক্‌তে পারব না। দিন-চারপাঁচ পরে আমি দেশে যাবার জোগাড় করছি। অনেককাল ওদিকে যাইনি, একটু দেখা-শোনা দরকার।"

ভানুমতী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেন রে? দেশে যাবার এখনই কি তাড়া পড়ল? দেওয়ানজী এতকাল সব দে'খেশুনে চালাচ্ছেন; তুই আর দশ দিন দেরি ক'রে গেলে কি সব অচল হয়ে যেত? মেজদি কিরকম দুঃখ করবে শুন্‌লে?"

সুবীর বলিল, "কিছু ভাবনা নেই। আমার কথা মনে করবারই তাঁর সময় থাকবে না। এ বিয়েটা নিয়ে এত কথা হয়ে গেছে, যে, ওর মধ্যে থাকতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না আমার। বৌকে আর সুশীলকে খুব দামী কিছু উপহার দিয়ে দিও, তা হ'লেই সকলে খুসী হয়ে যাবে। তোমার কাছে টাকা না থাকে ত বল, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাব।"

ভানুমতী বলিলেন, "টাকার দরকার নেই, বাছা। আমার কাছে যা আছে, তাই কি ক'রে খরচ করব ভেবে পাই না। বেশী দিতে গেলে আবার অন্য বৌরা রাগ করবে না? সকলকে যা দিয়েছি, এদেরও তাই দেব।"

সুবীর সন্ধ্যাবেলা গিয়া ইন্দ্রকে বলিয়া আসিল, যাওয়ার দিন সে এক সপ্তাহ পিছাইয়াই দিল। ইন্দ্র যেন যাইবার অনুমতি জোগাড় করিয়া রাখে।

ভানুমতী মুখ ভার করিয়াই রহিলেন। এই বিবাহে উপস্থিত থাকিতে তাহার কোথায় যে বাধিতেছে, তাহা সুবীর মাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজে একশ'টা সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া যায়, ইহার মধ্যে লজ্জার আর আছে কি? মেয়েও নয়, ছেলে। কোনোকালে বিবাহের কথা হইয়াছিল বলিয়া, চিরদিন তাহাদের সম্মুখে মাথায় ঘোম্‌টা দিয়া বেড়াইতে হইবে নাকি?

সুবীরের যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। ভানুমতী বলিলেন, "সাবধানে থেকো বাছা। যা দেশ, ওখানে কিছুর ঠিকানা নেই। দেওয়ানজীর পরামর্শ না নিয়ে কোথাও যেও না। সর্ব্বদা লোকজন সঙ্গে রেখো। আর যাই কর, আমার মাথার দিব্যি রইল, তোমার কাকার বাড়ী যেও না বা তাদের বাড়ীর জলগণ্ডুষ মুখে দিও না। ওর মতো কুচক্রী মানুষ দুটি নেই। যতটা পার এড়িয়ে চ'লো। শিকার-টিকার করতে যেও না যেন।"

সুবীর তাঁহার সব-ক'টা নিষেধই মানিয়া চলিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। ভানুমতীর দিন যেন কাটিতে চাহিতেছিল না। ভবানীর জন্য নিতান্ত তিনি আট্‌কা পড়িয়াছিলেন, তা না হইলে তিনিও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও কয়েকদিনের জন্য চলিয়া যাইতেন। অন্ততঃ শোভাবতীর বাড়ী গিয়া কয়েকটা দিন কাটাইয়া আসিতে পারিলেও তাঁহার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হইত। কিন্তু ভবানীই হইয়াছিল তাঁহার সব-কিছুর অন্তরায়।

একজন ঝি আসিয়া বলিল, "মা, দিদি একবার আপনাকে ডেকে দিতে বললে।"

ভানুমতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুবীরের চিন্তা তখনকার মতো মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, তিনি ভবানীকে দেখিতে চলিলেন। সুবীর অবশ্য অনেকবারই তাঁহার কোল ছাড়িয়া গিয়াছে ও অনেক দূর দেশেও গিয়াছে। কিন্তু দেশে পাঠাইয়া তাঁহার বেশী মন খারাপ লাগিতেছিল এইজন্য যে সেখানে তাঁহাদের চিরশত্রু উদয় এখনও বাসা বাঁধিয়া আছে। সুবিধা পাইলে সে কি আর কিছু অনিষ্ট-চেষ্টা না করিবে? ইহার আগে সুবীর যখনই দেশে গিয়াছে, ভানুমতী এবং ভবানী তাহার সঙ্গে গিয়াছেন, কাজেই উদয় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভবানীকে অন্ততঃ অতীতকালের পরিচয়ে তাহার যথেষ্ট ভয় ছিল। এবার ছেলেমানুষ সুবীর একলাই যাইতেছে, তাই এত দুশ্চিন্তা।

দেওয়ানজীকে ছেলের উপর ভালো করিয়া চোখ রাখিতে বলিয়া একখানা চিঠি লিখিতে হইবে স্থির করিয়া ভানুমতী গিয়া ভবানীর ঘরে ঢুকিলেন।

ভবানীকে দেখিয়া আর সেই পুরাকালের ভবানী বলিয়া চিনিবার জো নাই। সে রং নাই, সেই দীর্ঘায়ত দেহ নাই, চোখেমুখে সেই দুঃসহ তেজ নাই। তাহার কঙ্কালমাত্র পড়িয়া আছে। ভানুমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভানু, খোকা নাকি আজ দেশে গেল?"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ, কিছুতেই রাজী হ'ল না থাকতে। ছেলে সব দিক্ দিয়ে অদ্ভুত। এত ক'রে বললাম, সুশীলের বিয়েটা হয়ে যাক, তার

পর যাস্, তা কিছুতে যদি শুন্‌লে। ঐ মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, তাই নাকি তার মহা লজ্জা। যাক্, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে বাঁচি, যে শত্রু সেখানে। তার হাতের মুঠিতে না গেলেই হয়। তুইও সঙ্গে নেই যে ঠেকাবি। একমাত্র তোকেই ও হতভাগা যা একটু ভয় করে।"

ভবানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাছা, চিরশত্রুই ও বটে। তোমাদের চেয়ে আমার বড় শত্রু। আজ যে মরতে বসেছি, তবুও ওর কথা মনে হ'লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।"

ভানুমতী বলিলেন, "থাক্‌গে, ওর কথা আর এখন ভাবিস্ না। রোগ-শয্যায় দুটো ভালো কথা ভাব্, মনে শান্তি পাবি।"

ভবানী অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, "শান্তি? আমার অদৃষ্টে তা কি আর আছে? ইহকাল শেষ হয়ে এল, পরকালেও আমার শান্তি আছে কিনা জানি না।"

ভানুমতী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? কি এমন তুই করেছিস্? নিজের ছেলেপিলের বাড়া ক'রে পরের ছেলেপিলে মানুষ করলি, মেয়েমানুষ হয়েও পুরুষের বাড়া ক'রে আমাদের ঘর-সংসার আগলে রাখলি; তোর শান্তি না থাকবে কেন? কোনো কাজ ত তুই বাকি রেখে যাচ্ছিস না? ভগবান্ না করুন, যদিই এখন তুই স্বর্গে যাস, আমি ব'লে দিচ্ছি তুই শান্তিতে থাকবি, সুখে থাকবি।"

ভবানী কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল, "সবই অদৃষ্ট মা। করতে সত্যিই কিছু বাকি রাখিনি, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তোমাদের জন্যে করেছি। তোমাদের মা কচিকাঁচা সব আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, তার কাছে গিয়ে মাথা সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারব যে, তার কাজে আমি ফাঁকি দিইনি। কিন্তু মহাপাপ করতেও আমার আটকায় নি, মা। তার প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে যদি যাই, স্বর্গেও আমার শান্তি থাকবে না। এখানেও যেমন তুষানলে জলছি, ওখানেও তাই জলব।"

ভানুমতীর বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "জন্মাবধি তোকে চোখের উপর দেখছি। কবে কি পাপ তুই করলি? অসুখে ভুগে ভুগে তোর মাথাই খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

ভবানী বলিল, "মাথাটাই এক এখনও ঠিক আছে, তাই এত কথা বলছি। নইলে ত সব ভুলে যেতাম।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, যদি কিছু ক'রেই থাকিস্, তাতেই বা কি? সেরে ওঠ্, তখন তার যা বিহিত তা করা যাবে।"

ভবানী বলিল, "সারবার আশা থাকলে কি আর এ কথা মুখে আনতে সাহস হ'ত? যাই হই, মেয়েমানুষ, ভয়টা আমাদের থাকেই। জানি যে আর বড়-জোর পনেরো-কুড়িটা দিন আমার বাকি, তাই যা করবার এখনই করতে চাই। কিন্তু আজ থাক্ বাছা, আজ সব কথা খুলে বলতে মনটা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। কাল বলব।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, তোর যখন খুসি; কাল সুশীলের আইবুড় ভাত, আমি সকালের দিকে বাড়ী থাকব না। তোর কোনও অসুবিধে হবে না; আমি সব ব্যবস্থা ক'রে যাব।"

পরদিন সকালেই স্নানাদি সারিয়া ভানুমতী শোভাবতীর বাড়ী চলিয়া গেলেন। যদিও শুভ-কর্ম্মে তাঁহার কোনোই স্থান নাই, তবুও তিনি বাড়ীতে অন্ততঃ উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার মেজদি অত্যন্তই দুঃখিত হইবেন, ইহা জানিয়া ভানুমতী সর্ব্বদাই সে-বাড়ীর বিবাহাদিতে যোগ দিতে যাইতেন। সামনে না গিয়া কোনো একটা কোণের ঘরে গিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিতেন। গল্প-গুজব, আমোদ-প্রমোদ সবকিছুতেই যোগ দেওয়া চলিত, অথচ কাহারও কোনো অমঙ্গলও হইত না।

এবারে তিনি গিয়া দুর্গার ঘরে ঢুকিয়া বসিলেন। দুর্গার মেয়ের একটু জ্বরের মতো হইয়াছিল; সকলে এত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, অথচ তাহাকে মেয়ে আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে, ইহাতে দুর্গার বিরক্তির সীমা ছিল না। ছোট মাসীমা আসাতে সে হাতে স্বর্গ পাইল। তাঁহাকে

মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভানুমতী বসিয়া নাতনীর সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বরকে স্নান করানো, খাওয়ানো, কনের বাড়ী তত্ত্ব পাঠানো, সব একে একে হইয়া গেল। তখন দুর্গা আসিয়া তাঁহাকে ছুটি দিল। এ বাড়ীতেও শোভাবতীর এক বিধবা ননদ ছিলেন, ভানুমতী তাঁহার ঘরে খাওয়া দাওয়া করিতে গেলেন।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একজন ঝি একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চিঠি দিল রে ?"

ঝি বলিল, "জানি না মা, আপনার গাড়ী এসেছে, ড্রাইভার এই চিঠিখানা দিল।"

ভানুমতী নিষেধ সত্ত্বেও খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। হাত ধুইয়া চিঠি খুলিয়া দেখিলেন বাড়ীর সরকারের লেখা। ভবানীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ডাক্তার আসিয়াছেন, তিনি ভানুমতীকে অবিলম্বে আসিতে বলিয়াছেন।

ভানুমতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। শোভাবতী হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চিঠি এল রে ? খাওয়া ফে'লে চললি কেন ?"

ভানুমতী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভবানীকে আর বুঝি রাখতে পারলাম না, মেজদি। এতকাল মায়ের মতো ক'রে আগলে রেখেছিল, সে গেলে সংসারে একেবারে একলা পড়ব।"

শোভাবতী বলিলেন, "কি করবি বল্ ? জগতের নিয়মই এই। মা বল, বাপ বল, চিরকাল কেই বা থাকে ? তা কাঁদছিস কেন ? আগে গিয়ে দেখ্ কেমন আছে। ও-সব পুরোনো রুগী, মরতে মরতে দশবার সামলায়।"

ভানুমতী আর দেরি না করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। মিনিট-দশেকের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

ডাক্তারে তাঁহাকে সিঁড়ি ওঠা-নামা পারতপক্ষে না করিতেই বলিয়াছিল। যদিই করিতে হয়, তাহা হইলে খুব ধীরে ধীরে। সে-সব ভুলিয়া এক নিঃশ্বাসে একরকম দৌড়িয়াই তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ভবানীর ঘরের সামনে আসিতেই মাধী-ঝি কাঁদিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভানুমতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে মাধী? এখনও আছে ত?"

মাধী বলিল, "আছে, মা। কিন্তু আজকের রাত কাটে কি না সন্দেহ। যাও মা, তোমার আশায় পথ চেয়ে আছে।"

ভানুমতীর পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি জোর করিয়া মন শক্ত করিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক বিছানার পাশে চেয়ার লইয়া বসিয়া ছিলেন। ভানুমতীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি নীচে গিয়ে বস্‌ছি, ও আপনাকে কি যেন বলতে চায়। বেশী উত্তেজিত হ'তে দেবেন না। রাত্রে এইখানেই একটা বিছানা ক'রে দিতে বলবেন আমার জন্যে। দরকার হ'লেই আমায় ডাকবেন," বলিয়া তিনি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

ভবানীর বিছানায় আসিয়া বসিয়া ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কিছু ব'লে যেতে চাস?"

ভবানী ইসারায় তাহাকে বালিশে ঠেস দিয়া উঁচু করিয়া বসাইয়া দিতে বলিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "এখনও বলতে মনটা ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে মা, কিন্তু আর সময় নেই। মায়ের মতো যত্নে তোকে মানুষ করেছি এই মনে ক'রে আমায় ক্ষমা করিস। তখন বুদ্ধির দোষে মনে করেছিলাম, তোর ভালোই করছি। ভগবানের কাছে কি জবাবদিহি করব জানি না।" এতদূর বলিয়া সে আবার দম লইবার জন্য থামিল।

ভানুমতীর বুকের ভিতর কেমন যেন করিতে লাগিল। কোন্ মহা রহস্যের সম্মুখে ভাগ্য তাঁহাকে আনিয়া দাঁড় করাইল? এই পরপারের যাত্রী কি তাঁহাকে বলিয়া যাইতে চায়? শুনিবার পর পৃথিবীর চেহারা

এমনিই কি থাকিবে? কি মহাপাপ সে করিয়াছে? ভানুমতীর জীবনও তাহার সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া গেল কি করিয়া?

ভবানী আবার বলিতে লাগিল, "উদয় হতভাগা যদি অত ক'রে আমায় না জালাত তাহ'লে এমন কাজ হয়ত করতাম না। কিন্তু মাথায় আমার খুন চড়িয়েছিল সে। তাকে জব্দ করবার জন্যে না করতে পারতাম এমন কাজই ছিল না। ধাত্রীটাও হ'ল আমার সহায়। অদৃষ্টে ছিল এই লিখন, তা না হ'লে সময়মতো এসে জুটবে কেন?"

ভয়ে ভানুমতীর হৃৎস্পন্দনও যেন থামিয়া গেল। ভবানী কি বলিতে চায়? ধাত্রীও সহায় হইল তাহার কিসে? অস্ফুটস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, কি বলতে চাস তুই? কি সর্ব্বনাশ বাধিয়ে রেখেছিস?"

ভবানী অনেক কষ্টে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, "সর্ব্বনাশই বটে, মা। টাকার দাম তখন অনেক বেশী ভাবতাম। এখন দেখছি আট লাখ টাকার লোভে যা করেছি, মাথার ঠিক থাকলে লক্ষ কোটী টাকার জন্যেও কেউ তা করে না। তোমার মেয়েসন্তান হ'লে পাছে উদয় টাকাটা হাত করে, এই ভয়ে আমার রাতে ঘুম হ'ত না। কিন্তু বিধাতা তাই কি ঘটালেন? ধাত্রী যেই বললে, 'হয়ে গেছে', ঝুঁকে পড়ে দেখলাম গোলাপ ফুলের মতো সুন্দরী মেয়ে।"

বাধা দিয়া ভানুমতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি রে? মেয়ে হয়েছিল?"

ভবানী বলিল, "হ্যাঁ, মেয়েই। আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না। উদয়কে ফাঁকি দেবার জন্যে তখন মানুষ খুন করতেও আটকাত না। ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মেয়েকে সরিয়ে ফেলা গেল, তার জায়গায় একটি ছেলে জোগাড় ক'রে নিয়ে এল সে! তার মা দুদিন আগে ওর বাড়ীতেই প্রসব হয়ে মারা গিয়েছিল। দুনিয়ায় কেউ ছিল না তার। মেয়েটিকে নিয়ে ধাত্রী চ'লে গেল।"

ভানুমতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বুক-ফাটা কান্নার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুই আমার ছেলে নস্?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হতচেতন দেহ ঘরের মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল।

পতনের শব্দে তিনচারজন দাসী ছুটিয়া আসিল। তাহাদের চীৎকারে ডাক্তারবাবু যখন উপরে ছুটিয়া আসিলেন, তখন তিনি কাহার দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ভানুমতীর অবস্থাও ভবানীর অপেক্ষা বিশেষ ভালো বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

সুবীরকে ফিরিয়া আসিবার জন্য তখনই টেলিগ্রাফ করা হইল। পাড়াগাঁয়ের টেলিগ্রাফ আফিসে অবশ্য কতক্ষণে যে তাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিবে, কিছুই ঠিক নাই। শোভাবতীর বাড়ী তখন সকলে বিবাহের উৎসবে ব্যস্ত, তবু খবর পাইয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিলেন।

ভানুমতী নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া ছিলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল, হৃৎস্পন্দন কখন থামিয়া যায় তাহার ঠিক নাই। কয়েক ঘণ্টায় তাঁহার যেন কুড়ি বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ এখন মোমের মতো সাদা দেখাইতেছিল।

ডাক্তার তাঁহাকে কথাবার্ত্তা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। শোভাবতী বোনের হাত ধরিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। বলিলেন, "কি অলক্ষুণে মেয়ে ঘরে আনছি জানি না, বিয়ের নামে তার বাপ মরতে বসল, আবার এখানে দেখ আমার বোনও বুঝি ফাঁকি দিয়ে যায়। সুবীর ভালোই করেছিল এ মেয়েকে ঘরে না এনে।"

তাঁহার একমাত্র শ্রোত্রী মাধী-ঝি। বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সত্যি মাসীমা, দাদাবাবুর আমাদের যা বুদ্ধি! কে বলবে যে অতটুকু ছেলে।"

শোভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কখন আসবে রে?"

ঝি বলিল, "তার গেছে, এই এসে পড়ল ব'লে।"

শোভাবতী উঠিয়া পড়িলেন, "যাই বাছা, কোনো অযত্ন যেন না হয়। এমন সময়ে অসুখে পড়ল, দুঘণ্টার বেশী চারঘণ্টা যে ব'সে থাকব তার

জো নেই। আবার আস্‌ব কাল সকালে। ভবানী কোন্‌ ঘরে? তাকেও একটু দে'খে যাই।"

কাতী-ঝি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। ভবানীর আর কথা বলিবার শক্তি ছিল না। সে শুধু চাহিয়া দেখিয়া চোখ বুজিল। পাছে কান্নাকাটির শব্দে ভানুমতীর অসুখ বাড়ে, সেইজন্যে সকলে চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভবানী তাহার এতদিনের পরিচিত ঘর ছাড়িয়া চিরদিনের মতো বিদায় হইয়া গেল।

২৬

সুবীরের আগমনের সংবাদ সে দেওয়ানজীকে দেয় নাই। কারণ হাতী, গাড়ী, বরকন্দাজ লইয়া ভীষণ হৈ চৈ করিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। আজন্ম অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হইয়াও তাহার ভিতর কোথায় একটা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর ভাব ছিল। বেশী জাঁকজমক, অর্থের ছড়াছড়ি দেখিলে মনটা তাহার সঙ্কুচিত না হইয়া পারিত না। অথচ এসব সহ্য না করিয়াও তাহার উপায় ছিল না। ভানুমতীর একমাত্র সন্তান সে, কাজেই সব সাধ তাঁহার সুবীরকে মিটাইতে হইত। এত বড় জমিদার সে, টাকা রাখিবার যাহার স্থান নাই, সে যদি এমন করিয়া সন্ন্যাসীর মতো বেড়ায় তাহা হইলে এ-সব ধন-সম্পদে আগুন লাগাইয়া দিলেই হয়? কাহার জন্য এ-সব? বংশে ত আর ক্ষুদ-কুঁড়া একটাও কেহ নাই? অগত্যা মা সঙ্গে থাকিলে মনে মনে হাজার বিরক্ত হইলেও জমিদার-গিরি না ফলাইয়া সুবীরের উপায় ছিল না।

এবার কিন্তু সে যে কোনো সাধারণ যাত্রীর মতোই আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণ হইতে সে এবং ইন্দ্র নামিয়া দেখিল সুবীরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিই উপস্থিত নাই। দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সুবীরের ভয় ছিল, পাছে মা তাহাকে না জানাইয়া দেওয়ানজীকে কোনো খবর দিয়া থাকেন।

কিন্তু প্ল্যাটফর্মে নামিবামাত্র একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, এখানের ষ্টেশন-মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কুলিটি পর্য্যন্ত জমিদার-বাবুকে উত্তমরূপে চিনিত। হঠাৎ এভাবে তিনি উপস্থিত হওয়ায় সকলে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই, হাতী নাই, রাজাবাবু কি হাঁটিয়াই বাড়ী যাইতে চান নাকি?

সুবীর সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই আনে নাই। তাহাও নিজের একটা স্যুটকেস্ এবং ইন্দ্রের একটা ব্যাগ ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের সঙ্গে ছিল না। এই দুইটা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটা কুলি ডাকিবামাত্র সকলে যেন নিজেদের লুপ্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কুলিটাকে এক ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বলিলেন, "দূর ব্যাটা ভূত, এ মোট ঘাড়ে করবার যোগ্যতা তোর এজন্মে হবে না।" সুবীরকে আভূমি প্রণত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবু, এই রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের ভিতর এসে বসুন। দেওয়ানজীর এত দেরি হচ্ছে যে? একটা লোক পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে?"

সুবীর বলিল, "তাঁকে খবর দেওয়া হয়নি। যাক, একটা লোকই পাঠিয়ে দিন। রোদটাও বেশ জোর হয়ে উঠেছে।"

সুবীর এবং ইন্দ্র ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরের ভিতর গিয়া বসিল। একটা কুলি তাহাদের আগমনবার্ত্তা লইয়া জমিদার বাড়ীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চলিল।

ইন্দ্র বলিল, "এই দেখুন, আমি আগেই বলেছিলাম না? 'Some have greatness thrust upon them'। আপনি যতই কেন না ফাঁকি দেবার চেষ্টা করুন, আপনার জমিদারী আপনাকে তাড়া ক'রেই বেড়াবে।"

সুবীর বলিল, "যাক্, ক'দিনই বা থাক্‌ব? একেবারে হাড়-জ্বালাতন হয়ে উঠবার সময়ই হবে না।"

ইন্দ্র বলিল, "দেখুন, বিধাতার কি অবিচার! আপনার সমস্ত প্রাণটা হাহাকার করছে পুঁইশাক-চচ্চড়ি খেয়ে, হাঁটুর উপর কাপড় প'রে, রোদে

পুড়ে, জলে ভিজে বেড়াতে, অথচ আপনিই কিনা জন্মালেন মস্ত বড় এক জমিদার হয়ে। কুলীন-কুলোদ্ভব কুলি না হ'লে, আপনার ছেঁড়া জুতো পর্য্যন্ত ছুঁতে পায় না। আর আমার দশাটা দেখুন। আবু হোসেনের মত এক রাত্রির জন্যে যদি আমাকে কেউ রাজা ক'রে দেয়, তা হ'লে চুটিয়ে ফুর্ত্তি উড়িয়ে নিই। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, আসাসোটা, বরকন্দাজ, রাজপ্রাসাদ, রাজনন্দিনী, কোনো-কিছুতেই আমার অরুচি নেই। অথচ আমার অদৃষ্টে কলকাতার এঁদোগলির বাড়ী, ছ্যাকড়া থার্ডক্লাশ গাড়ী, এবং কুচো চিংড়ি ছাড়া কিছুই জোটে না। এটা অন্যায় নয়? ভাগ্য অদল-বদল ক'রে নেওয়া যায় না?"

সুবীর বলিল, "একটি জিনিষ বাদ দিয়ে গেলে যে? তাঁকে এক রাত্রির রাজা হবার লোভেও ছাড়তে রাজী হবে কি না সন্দেহ।"

ইন্দ্রের তরুণী পত্নীটির সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। সে একটু গর্ব্বিত হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঐখানে বিধাতা একটু ঠিকে ভুল ক'রে ফেলেছিলেন। ওকে আমাদের বাড়ীতে মোটেই মানায় না। হাবী-ঝি আর গয়লানীর মধ্যে তাকে দেখায় যেন চেড়ীপরিবৃতা সীতা।"

সুবীর বলিল, "ভালোই ত। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডটা যত কালো হবে, তার গায়ে আলোও তত বেশী ফুটবে।"

এমন সময় মস্ত-বড় এক ফিটন হাঁকাইয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজী মহা ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবীর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাওয়ায় তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এ কি কাণ্ড! একটা খবর দিতে নাই?"

সুবীর বলিল, "ভারি ত ব্যাপার, তার আর খবর দেব কি? কলকাতায় ভালো লাগছিল না ব'লে কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যেতে এলাম। একলা মন টিকবে না ব'লে ইন্দ্রকে পাকড়ে এনেছি।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "বাবা, নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো কথাটা বললে। তোমার এ-সব কিছু ভালো লাগতে না পারে, কিন্তু এ-সব দরকার যে?

প্রজারা সব মূর্খ মানুষ, তারা কি এ-সব সিম্প্‌লিসিটির মানে বোঝে? তাদের কাছে নিজের মান বজায় রাখতে হ'লে এ-সব হাঙ্গামা না ক'রে উপায় নেই।"

সুবীরের তখন ঠিক তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে কথা না বাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। জমিদারের প্রাসাদ ষ্টেশন্‌ হইতে মাইল-খানেক দূরে, তাহাদের পৌছিতে বেশী দেরি হইল না।

সুবীরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চাকর-বাকর সব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ঘরগুলি বেশীর ভাগই বন্ধ পড়িয়া ছিল, কেবল দু-চারটায় চাকররা নিজেদের আড্ডা স্থাপন করিয়া মহাসুখে বাস করিতেছিল। গাড়ী লইতে লোক আসিবামাত্র তাহারা হুড়াহুড়ি করিয়া নিজেদের পোঁটলা-বিছানা প্রভৃতি সরাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুবীর যখন আসিয়া পৌছিল, তখনও চারিদিকে ভৃত্য-রাজকতন্ত্রের চিহ্ন সুস্পষ্ট, সে সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াই বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। ইন্দ্র বলিল, "সুবীরবাবু, কিছু যদি মনে না করেন, বেজায় তেষ্টা পেয়েছে।"

সুবীর দেওয়ানজীর দিকে ফিরিবামাত্র তিনি বলিলেন, "এই যে, সব এসে পড়ল ব'লে। যদি একটু খবর দিয়ে আসতে, কোনো অসুবিধাই হ'ত না। এই সবেমাত্র দু-দিন আগে বামুন-ঠাকরুণটি তীর্থ করবার ছুটি নিয়ে গেলেন। আমি জানি যে এখন তোমাদের আসবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তাই দিলাম ছেড়ে। সঙ্গে তোমাদের তারা-পিসীঠাকুরুণও গিয়েছেন। কাজেই ক'টা দিন কষ্ট ক'রে আমার বাড়ীর ডাল-ভাতই খেতে হবে। একটু জলখাবার, চা করতে ব'লেই এসেছি, এতক্ষণে হয়ে গেছে।"

সুবীর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তাই ত! খবর না দিয়ে আপনাকেই বিপদে ফেললাম দেখছি।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "এটা আমার বিপদ্‌ হ'ল না কি? অবশ্য যদি তোমরা খেতে না পার, তা হলে বিপদ্‌ই হবে।"

ইতিমধ্যে একরাশ লুচি, তরকারি, ভাজা, নানাপ্রকারের পিঠা, মিষ্টান্ন, প্রভৃতি বহন করিয়া চারপাঁচজন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। দেওয়ানজী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এই দেখ, ব্যাটারা চা'টাই ভুলে এসেছিস? আরে, সেটাই যে আগে দরকার!"

সুবীর বলিল, "ব্যস্ত হবেন না, চা এক বেলা না খেলে কোনো অসুবিধাই হবে না।"

বৃদ্ধ দেওয়ানজী সে-কথায় কান না দিয়া চাকরদের বকিতে বকিতে নিজেই বাহির হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বলিল, "নিন সুবীরবাবু, আরম্ভ ক'রে দিন। ভদ্রতা ক'রে জল চাইলাম বটে, কিন্তু আশা ছিল মনে মনে, তার চেয়ে সারবান্ পদার্থ কিছু জুটবে।"

খাইতে খাইতে চা আসিয়া পড়িল। দেওয়ানজী নিজে সামনে বসিয়া তাহাদের সব জিনিষই কিছু কিছু খাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন। সুবীর আপত্তি করায় বলিলেন, "রান্না হতে কত দেরি হবে তার ঠিকানা কি? কিছু না খেয়ে রাখলে পিত্তি প'ড়ে যাবে।"

জলযোগান্তে সুবীর বলিল, "একবার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তারপর ইন্দ্রকে নিয়ে ঘুরতে বেরোনো যাবে।" দেওয়ানজীর স্ত্রীকে সুবীর জ্যাঠাইমা বলিয়া ডাকিত।

দেওয়ানজী বলিলেন, "তোমার কাকার ওখানেও একবার যেও। তিনি খুব ভুগছেন শুনলাম; না গেলে ভালো দেখাবে না।"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, যাব একবার বিকেলে।" এমন সময় একটি চাকর আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"

চাকরটি জিজ্ঞাসা করিল, "শোবার জন্যে কোন্ কোন্ ঘর ঠিক করব?"

সুবীর বলিল, "গোটাদশ ঘরের কিছু প্রয়োজন নেই, একটা ঘর হ'লেই হবে। দুটো বিছানা বেশ ক'রে ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে পেতে রেখ।"

দেওয়ানজীর বাড়ী যাইবার জন্য উঠায় তিনিও তাহার সঙ্গেই চলিলেন। ইন্দ্র বলিল, "সুবীরবাবু, আস্বার পথে চমৎকার একটা দীঘি দেখলাম।

আপনি যতক্ষণ দেখা-সাক্ষাৎ করবেন, আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে রাখি। কলকাতায় থেকে থেকে মনের সুখে সাঁতার দেওয়ার কি যে আনন্দ তা একরকম ভুলেই গিয়েছি।"

সুবীরের কোনও আপত্তি ছিল না। ইন্দ্র কাপড় তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিবামাত্র, সেগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একজন চাকর আসিয়া জুটিল। দেওয়ানজী একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ইন্দ্র নীচু গলায় বলিল, "সুবীরবাবু, আমার প্রার্থনাটা পূর্ণ হ'তে চল্ল দেখছি। কাপড় বইবার জন্যে চাকর ত স্বপ্নের অতীত ব্যাপার আমার।"

ইন্দ্রকে রওনা করিয়া দিয়া, সুবীর দেওয়ানজীর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তাঁহারা বাড়ী অতি নিকটেই, কাজেই সুবীর গাড়ী চড়িতে কিছুতেই রাজী হইল না।

দেওয়ানজীর বাড়ীতে দেখা করিবার লোক খুব যে বেশী ছিল, তাহা নয়। তাঁহার বড় ছেলে থাকিত কলিকাতায়, বড় মেয়ে থাকিত শ্বশুরবাড়ী। বিধবা একটি কন্যা একটি শিশুপুত্রকে লইয়া বাপের কাছে থাকিত। আর ছোট ছেলেও এখানে থাকিয়া বাপকে সাহায্য করিত।

জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করা এবং বাড়ীর সব লোকের খবর নেওয়া শীঘ্রই চুকিয়া গেল। বিধবা হইবার পর প্রমীলা বড়-একটা কাহারও সাম্‌নে বাহির হইত না। তবু সুবীরকে তাহারা জন্মাবধি দেখিতেছে, নিজের ভাইয়ের মতোই সে সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে, কাজেই সে বাড়ী আসায় দেখা না করিয়া পারিল না। তাহার নিরাভরণ থানপরা চেহারা দেখিয়া সুবীর কি যে বলিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না। কোনোরকমে কুশল-প্রশ্নটা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল বটে, সেটাও কেমন যেন ঠাট্টার মত শুনাইল। প্রমীলার ছেলেকে আগে দেখে নাই, তাহার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ইন্দ্র তখনও আসে নাই। তাহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির অবসরে চাকররা ঘর-দোর ঝাড়-পোঁছ করিয়া অনেকটাই

ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিয়াছিল। শুইবার ঘরে গিয়া পালঙ্কের বিছানার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া, স্থবীর ইংরেজী মাসিক পত্র পড়ায় মন দিল।

হঠাৎ বাহিরে কিসের একটু শব্দ শোনা গেল। স্থবীর চাহিয়া দেখিল, একজন চাকর দাঁড়াইয়া। স্থবীর তাহার দিকে তাকাইতে নমস্কার করিয়া জানাইল, "ছোটবাবু এসেছেন। বৈঠকখানায় ব'সে আছেন।"

ছোটবাবু অর্থাৎ উদয়। স্থবীর আসিবামাত্রই তাঁহার স্নেহের নদীতে এমন জোয়ার উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সে না হাসিয়া পারিল না। বিকালে পাচ মিনিটের জন্য সে তাঁহদের বাড়ী যাইবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ভাইপোর প্রতি টানে কাকা তাহার পুর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইলেন।

যাহা হউক, আসিয়াছেন যখন তখন দেখা করিতেই হইবে। ইংরেজী মাসিক রাখিয়া চটি পায়ে দিয়া স্থবীর বৈঠকখানার দিকে চলিল।

উদয় বড় একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। তাহার মাথার চুল এখন অর্দ্ধেক পাকা, টাকও একটা মাঝারী গোছের দেখা দিয়াছে। চোখেমুখে বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের দাগ সুস্পষ্ট। রোগে ভুগিয়া চেহারা এখন অনেকটাই রোগা হইয়া গিয়াছে।

স্থবীর উদয়কে প্রণাম করিতে সর্ব্বদাই মনে মনে আপত্তি অনুভব করিত। কিন্তু নিতান্ত কাকা, না করিয়াও উপায় নাই। যাহা হউক, প্রণামটা অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই, উদয় তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। যেন মহা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বাবাজী, কোনো খোঁজ না দিয়েই এসে পড়লে যে? সব খবর ভালো ত? তোমার মা-ঠাকরুণ ভালো আছেন ত?"

স্থবীর বলিল, "এলাম এমনি একটু বেড়াতে। কাজ বিশেষ কিছু নেই। হ্যাঁ, মা ভালোই আছেন, তবে ভবানীদিদিকে নিয়ে বড় ব্যস্ত।"

উদয় অত্যন্ত নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও তাই নাকি? খুব অসুখ বুঝি তার? কই এখানে তা ত কিছু শুনিনি?"

স্থবীর বলিল, "এখানে আর তার খবর কে দিতে যাবে? খুবই অসুখ, এবার আর টিক্‌বে না মনে হচ্ছে।"

উদয় মুখটা একটু বিষণ্ণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "সে গেলে তোমাদের একটু মুস্কিলে ফে'লে যাবে। এখানে থাক্‌তে ত দেখতাম, বৌঠাকরুণ কিছুই দেখতেন না, ওই সব চালাত।"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, ওখানেও তাই চল্‌ত। আমায় মানুষ করার কাজটাও সে যতটা করেছে, মা ততটা কারননি।"

উদয় বলিল, "যাক, কথায় কথায় আসল কথাটা ভুলেই যাচ্ছিলাম। তোমাদের এখানে ত রান্নাবান্না কর্‌বার লোক নেই কেউ? সব তীর্থি কর্‌তে গেছে। তা যা-হয় দুটো ডাল ভাত আমার এখানেই খেও।"

সুবীরের মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল। সে বলিল, "দেওয়ানজী বাড়ীতে সব রান্নাবান্না করাচ্ছেন, সেখানেই খাব বলেছি।"

উদয় বলিল, "তা আজ না হয় কালই হবে। আমি এখানে থাক্‌তে পরের বাড়ী খেয়েই বিদায় হবে, সেটা কি ভালো দেখায়? তোমার কাকীমা বড় দুঃখ কর্‌বেন তাহলে।"

কাকীমাটিকে সুবীর দুই-একবারের বেশী চোখেও দেখে নাই। কাজেই তিনি যে সুবীরের পরের বাড়ী খাওয়ার দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পড়িবেন তাহা মনে করিবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু সেকথা বলিয়া উদয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। সুবীর ভাবিতে লাগিল, মিথ্যা কথা একটা বলিতেই হইবে, সেটা মায়ের কাছে না বলিয়া কাকার কাছে বলাই ভালো।

যাই হোক্ দেওয়ানজী তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। বাহির হইতেই খুড়া-ভাইপোর কথোপকথনের কিছু অংশ তিনি শুনিয়া থাকিবেন বোধহয়। ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "তোমার শিকারে যাবার ব্যবস্থা সব ক'রে এলাম কাল সকাল বেলাই বেরিয়ে পড়তে পার্‌বে।"

সুবীরের শিকারে যাওয়া যে একেবারে নিষেধ তাহা দেওয়ানজী ভালো করিয়াই জানিতেন। কিন্তু উদয়ের বাড়ী খাওয়া যে আরো বেশী করিয় নিষেধ তাহাও তিনি জানিতেন। সুতরাং তাড়াতাড়িতে উদয়কে নিরু

করিবার আর কোনো উপায় ভাবিয়া না পাইয়া সুবীরকে শিকারেই চালান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সুবীর ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝিয়া বুদ্ধিমানের মত চুপ করিয়া রহিল। উদয় বলিল, "তা হ'লে কি আর হবে? তোমার সুবিধা হবে না, তোমার কাকীমাকে বল্‌ব এখন। কিন্তু তুমিও শেষে এই খেয়ালে মজ্‌লে, বাবাজী? তোমাদের কম সর্ব্বনাশ ত এতে হয়নি?"

সুবীর বলিল, "সব রকম খেয়ালই কারো-না-কারো পক্ষে মারাত্মক হয়েছে। ছাড়তে হ'লে তাহলে সব-কিছুই ছেড়ে দিতে হয়। আচ্ছা, বিকেলে যাব এখন কাকীমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে।"

উদয় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, একবার যেও। আমার শরীরটা আজকাল মোটেই ভালো যাচ্ছে না। সন্ধ্যার পরেই শুয়ে পড়ি। একটু বেলা থাক্‌তে যেও।"

উদয় বাহির হইতেই দেওয়ানজী বলিলেন, "যাক্, চট্ ক'রে কথাটা মাথায় এল, তাই। তা না হ'লে যা নাছোড়বান্দা মানুষ, তোমাকে বাগিয়ে না নিয়ে ছাড়ত না।"

সুবীর বলিল, "নিতান্ত মায়ের কাছে কথা দিয়ে এসেছি, তা না হ'লে আমি যেতামই। কবে কি শক্রতা করেছিলেন ব'লে এখন অবধি অতটা শক্রতার ভাব বজায় রাখা আমার ভালো লাগে না। বিশেষ, এখন শক্রতা ক'রে লাভই বা কি? তাঁর ছেলেপিলেও নেই কিছু, আর চেহারা দে'খে মনে হয় না যে, নিজেও আর বেশীদিন টিকবেন।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "অতটা নিরীহ হয়ে গেছেন মনে ক'রো না। যে-ক'টা দিন বেঁচে আছেন, সেই ক'টা দিনই ফুর্ত্তি করতে পারলে কি ছেড়ে দেবেন? তোমার অনিষ্ট করতে পারলে এখনও তাঁর ভালো বই মন্দ নয়। এজন্যেই না তোমার মা-ঠাক্‌রুণ তোমার বিয়ে দিয়ে দিতে এত ব্যস্ত?"

কথাটা কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল। সুবীর তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল, "ইন্দ্রটা ভারি দেরি করছে, উৎসাহের চোটে

বেশী জল ঘেঁটে জরজাড়ি না ক'রে বসে। তাহলে তার মা আর আমায় আস্ত রাখবেন না।"

দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোক্‌রাটি সাঁতার ভালোরকম জানে ত? আমাদের দীঘিটি লম্বা-চওড়ায় কম নয় বড়। মানুষ বিপদে পড়তে পারে।"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "সে ভয় নেই কিছু। ওর সমান সাঁতার দিতে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরাও পারে কিনা সন্দেহ। কলকাতায় কত swimming competetionএ gold medal পেয়েছে তার ঠিকানা নেই।"

ইন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিল। সুবীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "অনেকক্ষণ ব'সে আছেন বুঝি?"

সুবীর বলিল, "বেশীক্ষণ না। চল, তোমায় একবার আমার রাজত্বটা ঘুরিয়ে আনি। খানিকক্ষণ আগেই যা পেট ঠেসে খেয়েছি, ভাত খাবার জায়গা নেই। গাড়ীটা তৈয়ারী আছে বোধহয়?"

দেওয়ানজী বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই আছে, যাও। কিন্তু আমি ভাবছি, কালকে তোমায় কোথাও-না-কোথাও একটু বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমার কাকার সামনে কথাটা ব'লে ফেলেছি যখন, শিকারে যাওনি দেখলে মহাকাণ্ড বাধাবে আর-কি?"

সুবীর বলিল, "যাবার জায়গার অভাব কি? নৌকোয় করে নদীতে বেশ একচোট ঘুরে আস্‌ব। বড় বজরাটা ঠিক করতে ব'লে দেবেন।"

সুবীর আর ইন্দ্র বেড়াইতে চলিয়া গেল।

পরদিন দেখা গেল, দিনটা একটু মেঘলা। নৌকা করিয়া যাওয়া ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে না ভাবিয়া সুবীর আর ইন্দ্র গাড়ী করিয়াই বাহির হইয়া গেল। তাহাদের প্ল্যান ছিল, মাইল দশ দূরে আর-এক গ্রামে জমিদারের এক কাছারী-বাড়ী ছিল, সেইখানেই গিয়া উঠিবে। সেখানে খাওয়া দাওয়া, ঘোরা-ফেরা, গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বেলাটা কাটাইয়া বিকালে যদি মেঘ কাটিয়া যায় ত নৌকা করিয়াই ফিরিয়া আসিবে। না হয়, আবার গাড়ীরই শরণ লইতে হইবে।

যাইতে যাইতে ইন্দ্র বলিল, "আপনার হয়ত মোটেই ভালো লাগছে না, কারণ এ-সবে আপনারা অভ্যস্ত। আমার কিন্তু সহরের বাইরে এলেই খুব ভালো লাগে। একমনে ভাবছেন কি? উত্তরটা জানিই অবশ্য।"

সুবীর বলিল, "মোটেই জানো না। আমি ভাবছিলাম, আমার মাস্‌তুতো ভাই সুশীলের কথা। আজ তার আইবড়ভাতের ধুম লেগে গেছে। এতক্ষণ ছোঁড়া মনে মনে আনন্দে ডিগবাজী খাচ্ছে, তাই ভাবছিলাম। আমায় তার কত যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তা বল্‌বার নয়।"

ইন্দ্র বলিল, "কেবল তার উপকারের জন্যেই যদি অতটা করতেন, তাহ'লে ধন্যবাদ দেবার কথা ছিল অবশ্য।"

বেলা দশটা আন্দাজ তাহারা গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানেও সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কোলাহল। যাহা হউক, সে-সব চুকাইয়া দুই বন্ধুতে আহারাদি সারিয়া, কোথায় কোথায় যাওয়া যাইবে এবং কি কি করিতে হইবে, তাহার প্ল্যান করিতে বসিল।

ইন্দ্র বলিল, "এখন ত সংসারী হবার দিকে আপনার ঝোঁক গিয়েছে, তাহ'লে পাকাপাকি রকমই হোন। এতদিন বোধহয় আপনার জমিদারী কত বড়, তার আয়ই বা কতখানি, কিছুই জান্‌তেন না?"

সুবীর বলিল, "এক-রকম তাই বটে। ঘরে মা আর ভবানীদিদি, বাইরে দেওয়ানজী মিলে আমার সব অভাব এমন ক'রে মিটিয়ে রেখেছিলেন যে কিছু খোঁজ নেবার দরকারই হয়নি, কিন্তু এবার নানা কারণেই মনে হচ্ছে যে নিজের ভার নিজে নিতে হবে।"

হঠাৎ ভেজানো দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। সুবীর বলিল, "কে? ভিতরে এস।"

তাহাদের একজন কর্ম্মচারী প্রবেশ করিয়া একখানা টেলিগ্রাম তাহার হাতে দিয়া বলিল, "দেওয়ানজী লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

টেলিগ্রামের হল্‌দে খামটা চোখে পড়িবামাত্র সুবীরের মনের ভিতরটা

আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠিল। মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে করিতে সে খামটা খুলিয়া কাগজখানা টানিয়া বাহির করিল।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুবীরবাবু, কি খবর?"

সুবীর বলিল, "এই দেখ প'ড়ে। নিজের ভার নিজে নেবার ব্যবস্থাটা খুব ভালো ক'রেই হচ্ছে।"

ইন্দ্র টেলিগ্রাম পড়িয়া দেখিল। ভবানী মারা গিয়াছে, ভানুমতীর অবস্থাও ভালো নয়।

সুবীর উঠিয়া পড়িল। বলিল, "চল, এবারকার মতো বেড়ানো এই পর্য্যন্ত। দেরি করলে বিকালের ট্রেণটা ধরতে পারব না।"

কাহারও কাছে বিদায় লইবার অপেক্ষা না করিয়া সুবীর আর ইন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল। জমিদার-বাড়ীতে পৌছিয়া দেখিল ট্রেণ ছাড়িতে আর আধঘণ্টাও নাই। নিজেদের সুট্যকেস ও ব্যাগ লইয়া কেবলমাত্র দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহারা ট্রেণ ধরিতে চলিল।

হাবড়া ষ্টেশনে নামিয়া ইন্দ্র বলিল, "বিকেলেই দাদাকে নিয়ে আমি আস্‌ব। দরকার থাকে ত বলুন, বাড়ী না গিয়ে আপনার সঙ্গেই যাই।"

সুবীর বলিল, "না না, এত-কিছু দরকার নেই। বাড়ী যাও, বিকেলে এলেই হবে। তোমাকে শুধু শুধু যাওয়া-আসার কষ্টটা দিলাম, বেড়ানো ত কিছুই হল না।"

ইন্দ্র বলিল, "আমার সঙ্গে ভদ্রতা সুরু করলেন শেষকালে? ঐ যে আপনার ড্রাইভার আপনাকে খুঁজছে।"

ড্রাইভার কাছে আসিয়া সেলাম করিতেই সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন?"

ড্রাইভার বলিল, "আগের চেয়ে কিছু ভালো আছেন।"

বাড়ী পৌছিয়া সুবীর এক ছুটে মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সামনা-সামনি ভবানীর ঘরের দরজাটা তালা দিয়া বন্ধ। দৃশ্যটা যেন কাঁটার মতো তাহার চোখে বিঁধিয়া গেল। জোর করিয়া সেদিক্ হইতে সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

ভানুমতীর অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল, জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল, এইটুকুমাত্র তফাৎ। ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই সুবীরের প্রথম চোখে পড়িল একটি নার্স। ভবানী বাঁচিয়া থাকিতে রোগ যতই কঠিন হউক, কখনও বাড়ীতে কাহারও জন্য নার্স ডাকিতে হয় নাই। সে নিজে অধিকাংশ নার্স্ অপেক্ষা রোগীর সেবাশুশ্রূষা ভালোই করিতে পারিত। সে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার বিদায় হওয়ার অর্থ যে কতখানি তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

সুবীরের অপেক্ষায় ডাক্তার ঘরের ভিতর বসিয়াই ছিলেন। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিলেন, "একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, এখন ডাক্‌বেন না চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি।"

সুবীর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভানুমতীর দিকে তাকাইয়া রহিল। যেন শ্বেতপ্রস্তরে গড়া নারী-মূর্ত্তি। কোথাও রক্তের লেশ নাই, কোথাও প্রাণের স্পন্দন নাই। তিন দিন আগে সুবীর তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছে, ইহারই ভিতর এমন শীর্ণ, এমন প্রাণহীন মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?

বাহিরে আসিয়া সে ডাক্তার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে আপনি কি তখন থেকেই আছেন ? মাসীমার বাড়ীর কেউ বুঝি আস্‌তে পারেননি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, কেউ আস্‌তে পারেননি। কাল তাঁদের বাড়ী বিয়ে গেছে, আজ বৌ আসবে, কি ক'রেই আস্‌বেন ? আমি আর সরকার-মশাই বাড়ী আগলে আছি।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "ভবানী-দিদি গেল কখন ? খুব কি কষ্ট পেয়েছিল ?"

ডাক্তার বলিলেন, "পরশু রাত্রে আটটার সময়। না, শেষের দিকে বিশেষ-কিছুই কষ্ট পায়নি। আপনার মাকে এখনও আমরা জানাইনি।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের অসুখ কি আগেই হয়েছিল ? আমি ত ভাবতে ভাবতে আস্‌ছি যে, ঐ খবর শুনেই বোধহয় এমন হয়েছে। হঠাৎ তাহ'লে এমন হ'ল কেন ?"

ডাক্তার বলিলেন, "সেটা ত এখন অবধি ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না। ভবানী দিদির অবস্থা খুব খারাপ দে'খে সরকার-মশাই তাঁকে আপনার মাসীমার বাড়ী থেকে ডেকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন। এসে তিনি ঘরে ঢুকলেন, তখন আর কেউ ঘরের ভিতর ছিল না। মিনিট-দশ পরে হঠাৎ তাঁর চীৎকার শুনে ঝিরা ছুটে এসে দেখল, তিনি মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছেন। আমি এসে ভবানী-দিদিরও আর জ্ঞান দেখিনি। আপনার মাকে তাড়াতাড়ি ও ঘর থেকে সরিয়ে আনা হ'ল। জ্ঞান হতে খুব বেশী দেরি হয়নি। তবে হার্ট্‌ বড় দুর্ব্বল ব'লে ওঁকে আমি কিছু জানাইনি, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বল্‌তে দিইনি। আপনাকে ক্রমাগত খুঁজছেন। খুব বড় একটা shock পেয়েছেন বোঝাই যাচ্ছে। আপনি জান্‌তেই পার্‌বেন, কিন্তু নিজে থেকে যদি না বলেন, এখন কোনো কথা জিজ্ঞেস করবেন না। কোনোরকম excitement যেন একেবারে না হয়।"

সুবীর বলিল, "কিন্তু কি এমন ঘটতে পারে আমি ত আকাশ-পাতাল খুঁজে কিছু পাচ্ছি না। ভবানী-দিদি কিছু আজকের মানুষ নয়, চিরকালই এ বাড়ীতে ছিল। তার এমন কি লুকানো কথা থাক্‌তে পারে? আমার মনে হচ্ছে, সে-সব কিছু নয়, ভবানী-দিদি চোখের সামনে চ'লে যাচ্ছে দে'খেই হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "তা হ'তেও পারে, কিন্তু আমার ঠিক তা মনে হচ্ছে না। Sudden shock-এর ফলেই এরকম হয়েছে ব'লে মনে হয়। যাই হোক, দুচার ঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে। আপনি স্নান-টান করুন গিয়ে, খুব বেশী ব্যস্ত হবার কারণ নেই। অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন ভালোর দিকেই যাচ্ছে। কাল না-হয় আর কাউকে ডাকা যাবে, আপনি যদি বলেন।"

সুবীর বলিল, "আপনি যদি দরকার মনে না করেন তাহ'লে আমি কাউকে ডাক্‌তে চাই না। মা এত অল্পে ভয় পান যে, নতুন ডাক্তার দেখলেই

তাঁর মনে হবে যে, ভয়ানক একটা-কিছু হয়েছে। আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি স্নানটা সেরে আস্‌ছি।"

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে বাড়ীর থেকে একটু হয়ে আসি। তিনচার-দিন আর ওমুখো হইনি। আজ আপনি এসেছেন, এখন নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারব। এ ক'দিন একেবারে কেউ ছিল না। ভুবনবাবু রোজ এসে খবর নিয়েছেন, কিন্তু থাক্‌তে পারেননি।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা যান; বেশী দরকার হ'লে গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

ডাক্তারবাবু সিঁড়ি নামিতে নামিতে বলিলেন, "হঠাৎ কোনো change এখন হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা হ'লে কি আর আমি যাবার নাম করি?"

ডাক্তার চলিয়া যাইতেই সুবীর নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। মায়ের হঠাৎ এমন অসুখে তাহার মনটা বড় মুষ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। দুঃখের সঙ্গে বিস্ময়ও বেশ খানিকটা মিশ্রিত ছিল। কেন এমন হইল? ভবানী-দিদি নিজে ত গেলই, সে-ই যথেষ্ট দুঃখের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতীকেও এমন সঙ্গে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল কেন?

জামা জুতা ছাড়িয়া, প্রথমেই কাপড়ের আল্‌মারী খুলিয়া সে কৃষ্ণার ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। ইহার মুখের হাসি তাহার বিষণ্ণ মনে যেন একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়া গেল। সুবীর ভাবিল, ছবি না হইয়া মানুষটিই যদি এত কাছে থাকিত, তাহা হইলে জগতে কোনো-কিছুই কি তাহাকে দুঃখ দিতে পারিত? কোনো দুঃখের ভয়ই কি তাহাকে পরাজিত করিতে পারিত?

স্নান করিয়া, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে আবার মায়ের ঘরের দিকে চলিল। নূতন নার্স্‌টি দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি উঠেছেন?"

নার্স্‌ বলিল, "হ্যাঁ, এই এখুনি উঠলেন।"

সুবীর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের পাশে গিয়া বসিল। ভানুমতী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুবীর তাড়াতাড়ি তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেন মা অত অস্থির হচ্ছ? আমি ত এসেই পড়েছি।"

সুবীরের কথায় ভানুমতীর কান্না না থামিয়া বরং আরো বাড়িয়াই চলিল। সুবীর বলিল, "মা, তুমি যদি আমাকে দেখে অমন কর, তাহ'লে আমি আর তোমার ঘরে আস্‌বই না। দুঃখ কর্‌বার কিছু যদি কারণ ঘ'টেও থাকে, তাহ'লেও অসুখের মধ্যে চুপ ক'রে থাকা উচিত। অসুখ বাড়িয়ে ত লাভ নেই কিছু?"

ভানুমতী অনেক চেষ্টা করিয়া নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইলেন। সুবীরের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "বাবা, আমার দুঃখ যে কত বড়, সহ্যের সীমার কতখানি উপরে, তা তুই কি জান্‌বি। তবু তোর কথায় চুপ কর্‌ছি। দেখ্‌, বল্‌তে পারিস্‌ ভবানী এখনও আছে কি না? ওদের জিজ্ঞেস কর্‌লে ওরা বলে, 'আছে, ভালো আছে।' কিন্তু ওদের মুখ দে'খেই বুঝি যে, মিথ্যে কথা বল্‌ছে। সে নেই রে, না? আমার মনই বলছে, সে নেই।"

সুবীর বলিল, "মা, তুমি ত ছেলেমানুষ নও, তোমাকে মিথ্যে কথা ব'লে ভুলিয়ে লাভ কি? ভবানী-দিদি নেই, পরশু রাত্রেই মারা গিয়েছে। তার মারা যাওয়ার জন্যে ত প্রস্তুতই ছিলে, এত বেশী অস্থির হয়ো না।"

ভানুমতী বলিলেন, "যাবে তা ত জানতামই। তবে আর ক'টা দিন যদি বিধাতা তাকে রাখতেন! এ ত নিজে গেল না, আমাকে সুদ্ধ নিয়ে গেল। হতভাগীর লোকলজ্জাই বড় হ'ল, দয়ামায়ার চেয়ে। যাক্‌, ওপারে গিয়ে যেন শান্তি পায়, এখানে বড় জ্বালা পেয়ে গিয়েছে। তার কাছে আমি যেতে পার্‌লে, আমার হাড়-ক'খানা জুড়োত। কতকাল এই জ্বালা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকব, ভগবান্‌ই জানেন।"

সুবীর অবাক্ হইয়া তাহার মায়ের কথা শুনিতেছিল। এই তিন দিনের ভিতর কি এমন ঘটিয়া বসিল, যাহাতে তাহার মায়ের মুখে এমন কথা শোনা যায়? ভবানীর মৃত্যুতে তাঁহার শোক পাইবার কথা বটে, কিন্তু সেও কি এতখানি হওয়া সঙ্গত? সুবীরকে সুদ্ধ ছাড়িয়া মা ভবানীর কাছে চলিয়া যাইতে চান? তা ছাড়া লোক-লজ্জা, দয়ামায়া, এসবের কথা কোথা হইতে আসিল? ভবানী দুদিন পরে মরিলেই বা ভানুমতীর কি এমন উপকার হইত?

ভানুমতীকে বলিল, "মা একটু স্থির হও, ভবানী-দিদি তোমার খুব আপনার ছিল বটে, কিন্তু মা-বাপও মানুষের চ'লে যায়, জগতের নিয়মই এই। দুঃখ পেলেও, এ দুঃখ স'য়ে যেতেই হয়। কিন্তু তার জন্যে নিজের ছেলে সুদ্ধ তুমি ফে'লে চ'লে যেতে চাও, এটা কি উচিত?"

ভানুমতী সবলে সুবীরের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে, সে যে তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে রে! আমার বুক একেবারে খালি ক'রে দিয়ে গেছে রে!"

সুবীর বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহায় মায়ের কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে? তিনি বলিতেছেন কি? কিন্তু এতক্ষণ ত মোটেই সেরূপ কিছু মনে হয় নাই? ডাক্তারবাবু ত তাঁহাকে আগাগোড়া দেখিতেছেন, তিনিও এমন-কিছু যে ঘটিয়াছে বা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা সুবীরকে বলেন নাই।

ভানুমতীর কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুবীর বলিল, "মা, কি পাগলের মতো কথা বলছ? আমাকে কেউ কি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে? এক ভগবান্ নিতে পারেন, কিন্তু তার সম্ভাবনা এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

ভানুমতী খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "না বাবা, পাগল আমি হইনি, পাগল হ'লে বেঁচে যেতাম। তোকে সব আমি বলছি, তারপর তুই-ই বল্, কি আমার করা উচিত।

নিজের ভাবনা সুদ্ধ নিজে কখনও ভাবিনি, আজ এত বড় বোঝা আমার উপর সে দিয়ে গেল।"

সুবীর বলিল, "সেই ভালো মা, আমার উপরেই ভার দাও তুমি। অন্যায় না হয়, তা আমি যথাসাধ্য দেখব।"

ভানুমতী বলিলেন, "জানি বাবা, তোকে দিয়ে অন্যায় কখনও হবে না। অন্য ছেলেদের মতন হ'লে, তোকে বলতেই আমার সাহস হ'ত না। এতবড আঘাত তোকে দেবেন ব'লেই ভগবান্ গোড়ার থেকে তোকে সন্ন্যাসী ক'রেই গড়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখিস্ বাবা, লোকের চোখে আমি দোষী হব, কিন্তু ভগবান্ জানেন আমার কোনও দোষ নেই। ধন-সম্পত্তির লোভ আমারও না ছিল তা বলি না, কিন্তু যা পেয়েছি, তার দু-গুণ পেলেও এ কাজ আমি করতাম না।"

সুবীর নীরবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সম্মুখেই যে একটা নিদারুণ রহস্যের যবনিকা উঠিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছিল। মনে মনে নিজেকে কেবল দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিলেন, "আট লাখ টাকা রেখে যান, আমার জ্যেঠশ্বশুর। তাঁর উইল ছিল, বংশে ছেলে যার হবে, সেই ও-টাকা পাবে। ঐ টাকার জন্যে তোর কাকা কম করেনি, আমাদের খুন করতেও তার আটকাত না। তখন তার বয়স ছিল অল্প, ছেলে হবার আশাও ছিল। যাহোক, উনি মারা গেলেন, তখন তার প্রাণটা জুড়োল। কিন্তু তখন আমার ছেলে পেটে, সেও তার এক জ্বালা হ'ল। ভবানী বাঘিনীর মত দরজা আগলে থাকৃত, পাছে কোথা দিয়ে আমার কিছু অনিষ্ট হয়। তার যত রাগ ছিল উদয়ের ওপর, এতটা আর কারো ছিল না।"

ভানুমতী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। সুবীর নীরবেই তাঁহার হাত ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ভানুমতী আবার বলিতে লাগিলেন, "ছেলে হবার জন্যে আমি কলকাতায় আসি। আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন, ভবানীপুরে বাসা করে ছিলেন।

তার কাছেই ছিলাম। তখন নিজের দেওয়া ডাক্তার-ধাত্রী এনে কিছু-একটা গোলমাল করবার ঢের চেষ্টা উদয় করেছিল। কিন্তু ভবানীকে হার মানাতে পারেনি। উদয়কে জব্দ করবার তার এক রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল। কাছেই এক ধাত্রী ছিলেন, মিসেস্ মিত্র ব'লে, তাঁকে সে ঠিক করল, কাউকে আর ঘরে ঢুক্‌তেই দিল না। মেজদি এসেছিল; যেমন অদৃষ্ট, তার স্বামীর অসুখ ব'লে সেও ঠিক সেদিন চ'লে গেল। ভবানী আর ধাত্রী রইল কেবল।

"আমি ত অজ্ঞান হয়ে ছিলাম; যখন জ্ঞান হ'ল, তোকে কোলে দিয়ে ভবানী বল্‌লে, 'এই নাও ছেলে।' বাবা, তার হাত থেকেই তোকে বুকে নিয়েছিলাম, বুকের রক্ত দিয়ে পালন করেছি, ভগবানের চোখে তুই আমারই ছেলে চিরদিন থাকবি। কিন্তু মানুষ এ-সম্বন্ধ স্বীকার করবে না।"

সুবীর বাধা দিয়া বলিল, "মা, এক রকম সবই বুঝলাম। কেবল জানতে চাই, কোথা থেকে তারা আমায় অমন সময়মতো নিয়ে এল। আর তোমার সন্তান যেটি হয়েছিল, তার কি হ'ল ?"

ভানুমতী বলিলেন, "মেয়ে হয়েছিল। টাকাটা উদয়ের হাতে চ'লে যাবে, এই ভয়ে ভবানী তাকে তখনি ধাত্রীর কাছে দিয়ে দেয়। ধাত্রীর ঘরে দু-তিন দিন আগে একটি গরীব মেয়েমানুষ প্রসব হ'তে এসে মারা যায়, ছেলেটি মিসেস্ মিত্রের কাছেই ছিল। আর কিছু ভবানী ব'লে যেতে পারেনি।"

সুবীরের চোখের সম্মুখে বিশ্বের মূর্ত্তি যেন অন্যরকম হইয়া গেল। এই কয় মিনিট আগে সে ধনীর বংশের একমাত্র দুলাল, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিল। এখন সে নামধাম-পরিচয়হীন পথের ভিখারী। তাহার জগতে কেহ আপনার বলিতে নাই, তাহার নাম বংশ-পরিচয় পর্য্যন্ত নাই।

ভানুমতীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা মা, আমার যা শোন্‌বার ছিল শুন্‌লাম। যতটুকু প্রতিকার এখন করা যায়, তা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। তুমি দুঃখ ক'রো না, সেরে উঠতে চেষ্টা কর। তোমার সাহায্যও আমার দরকার হবে।"

ভানুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "চ'লে যাস্‌নে, বাবা। তুই বল্‌, এখনও আমাকে মা-ই বলবি। আমার ওপর কোনো রাগ রাখিসনে।"

সুবীর আবার বসিল, ভানুমতীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মা, তুমিই আমার মা, চিরদিন তাইই থাকবে। কিন্তু তোমার ছেলে হ'লেও, এ বংশের ছেলে আমি নই। এদের ধনসম্পত্তি ভোগ করবার কোনো অধিকার আমার নেই। তাঁদের নাম ব'য়ে বেড়াবার কোনো অধিকার আমার নেই। এ-সব আমায় ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে। স্নেহের ওপর আইনের দাবী নেই মা, সেইটুকু কেবল আমার থাকবে। আর যার ওপর অন্যায় হয়েছে সবচেয়ে বেশী, সেই মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে। তার প্রাপ্য তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। টাকাও যেটা কাকার প্রাপ্য তা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তুমি মন শক্ত ক'রে সেরে ওঠ মা, এত কাজ প'ড়ে রয়েছে। আমার ঘরে ব'সে থাকলে চলবে না, কত দেশে, কত জায়গায় ঘুরতে হবে।"

ভানুমতী বলিলেন, "বাবা, অমন ক'রে বলিস্‌নে। তোকে আমি অমন ক'রে ভাসিয়ে দিতে পারব না। এদের কিছু তুই নাই নিলি, আমার নিজেরও টাকা আছে, সম্পত্তি আছে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা আছে। সব আমি তোকে লিখে দেব। তোর টাকার জন্যে কোনো কষ্ট হবে না।"

সুবীর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, সে পরের কথা পরে হবে। গহনাগাঁটি নিয়ে আমি কি করব? সে-সব তোমার মেয়ের জন্যে রাখ।"

ভানুমতী বলিলেন, "সে কি আর বেঁচে আছে? মিসেস্ মিত্রও ত আমরা ওখানে থাকতে থাকতে কল্‌কাতা ছেড়ে চ'লে যান, কার কাছে কোথায় খবর পাবে?"

সুবীর বলিল, "হারানো খবর বার করবারও উপায় আছে মা, সেইসব দিকেই মন দিতে হবে। তুমি উঠলেই কাজ আরম্ভ করব। আচ্ছা, তুমি একটু ঘুমোও, আমি ঘণ্টাখানেক পরে আবার আস্‌ব।"

সুবীরের মাথাটা তখন বেদনায় টন্‌টন্‌ করিতেছিল, একলা হইবার জন্ত তাহার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কোনোরকমে নিজের ঘরে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল।

২৭

কৃষ্ণার আজ হঠাৎ ছুটি মিলিয়া গিয়াছিল। কর্ত্তা অনেকদিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন, তাই মহা ধুমধাম সুরু হইয়াছে, আজ আর পড়াশুনা করিবার অবসর কাহারও নাই। সবচেয়ে খুসী হইয়াছেন অবশ্য গৃহিণী, কিন্তু তিনি এতবড় সংসারের কর্ত্রী, এতগুলি ছেলে-মেয়ের মা, আজ বাদে কাল ঠাকুরমা হইবেন, তিনি ত আর বহুদিন পরে স্বামী আসিয়াছেন বলিয়া ছ্যাবলার মত আনন্দে নাচিতে পারেন না? কাজেই তিনি যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়াই আছেন। তবে মনটা যে যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া আছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। চাকর-বাকর তাড়া খাইতেছে অন্যদিনের চেয়ে বেশী, বৌ-ঝির সব কাজেই গণ্ডা-গণ্ডা খুঁৎ বাহির হইতেছে। বৌরা বিরক্ত হইলেও হাসিমুখ করিয়া আছে, কারণ এতদিন পরে শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন, এখন তোলা হাঁড়ির মত মুখ করিয়া থাকিলে ভালো দেখায় না। তড়িতের সে বালাই নাই, যতটা না বিরক্ত সে হইয়াছে, তাহারও চারগুণ বিরক্তি মুখে ফুটাইয়া সে বাড়ীময় ঘুরিতেছে। বিছানায় কাদা-মাখা পায়ে উঠিয়াছিল বলিয়া খুকী মায়ের হাতের এক চড় খাইয়া বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া তারস্বরে কান্না জুড়িয়াছে। বিপিন ও নবীন কিছুক্ষণ বাড়ীতে ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের সামনে বেশীক্ষণ থাকা নানা কারণেই সুবিধার নয় বুঝিয়া তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণার ছাত্রীরা আজ পলাতকা। শ্বশুর-মহাশয় বৌমাদের হাতের রান্না খাইতে চাহিয়াছেন, কাজেই তাহারা বইখাতা ফেলিয়া ভাঁড়ার-ঘরে এবং রান্না-ঘরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ভালো মাছ-তরকারী আনিবার জন্ত

দুইটা চাকরকে বড়বাজারে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহারা আসিলেই কাজ আরম্ভ হয়। প্রতিভা বসিয়া পোলাও-এর চাল বাছিতেছে, অমিয়া তরকারী কুটিতেছে। তাহাদের শাশুড়ী বড় একখানা পিঁড়া টানিয়া বসিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাইতেছেন। বৌদের বয়সে একহাতে কত কাজ করিয়াছেন এবং কিরূপ নিখুঁতভাবে, তাহাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার বিষয়। তবু ত বৌদের উপর মা-ষষ্ঠীর কোনো কৃপা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার তখন একটি ছেলে হইয়াছে, আর-একটিও আগতপ্রায়। তড়িৎকে তাহার মা মাঝে মাঝে বক্তৃতায় ভঙ্গ দিয়া উঁচু গলায় ডাকিতেছেন। আসিয়া ত পান-ক'টা ভালো করিয়া সাজিয়া রাখিতে পারে? এতবড় ধিঙ্গী মেয়ে, একটা কাজ কি তাহাকে দিয়া হইবার জো আছে? লেখাপড়া শিখিতেছে, না মাথামুণ্ড শিখিতেছে! এ মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে কি গতি হইবে তাহার ঠিকানা নাই। তড়িতের কানে সব কথাই যাইতেছে, কিন্তু মায়ের উপর ক্রোধে তখন সে ফুলিতেছে, পান সাজা তাহাকে দিয়া হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা সেদিন নাই।

কৃষ্ণা ঘরে বসিয়া একখানা ইংরেজী উপন্যাস পড়িবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। বইখানি Michael Arlen প্রণীত The Green Hat; খানিকটা পড়িয়া সে বইখানা ছুঁড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। নিজের মনেই বলিল, "কেন যে এ-সব বইয়ের এত নাম তা যদি ছাই কিছু বুঝি। আমিও এমন বই লিখতে পারি।"

তাহার লিখিবার টেবিলটির উপর অনেকগুলি ইংরেজী বাংলা মাসিকপত্র এবং উপন্যাস সাজানো রহিয়াছে। রেঙ্গুনে আসিয়া তাহার আর যে জিনিষেরই অভাব ঘটুক, বইয়ের অভাব হয় নাই। বিপিন ছিল তাহার সহায়। অল্প কয়েকদিনের ভিতরই এই যুবকটি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কৃষ্ণাকে এই দিক্ দিয়া হয়ত খানিকটা কৃতজ্ঞ করা যাইতেও পারে। কৃষ্ণাকে কিছু উপহার দিবার মতো সাহসও তাহার ছিল না, এবং তাহা দেওয়া চলে কি না সে-বিষয়েও তাহার সন্দেহ ছিল। কাজেই সে বইগুলি কিনিয়া

আনিয়া, কৃষ্ণাকে পড়িতে দিয়া আসিত। নিজে সে কোনো বইয়ের এক-আধ পাতা উল্টাইত, কোনোটা একেবারে ছুঁইতও না। মাসিকপত্রগুলি মাঝে মাঝে পড়িত। কৃষ্ণাকে বই ধার দিয়া, তাহা ফিরাইয়া লইবার তাহার কোনোই উৎসাহ দেখা যাইত না; হাজার বার বলিলেও যেখানকার বই সেইখানেই থাকিয়া যাইত। টেবিলের উপরের বই যখন সিলিংএ ঠেকিবার উপক্রম করিত, তখন কৃষ্ণা বাধ্য হইয়া হয় তড়িৎ নয়ত কোনো চাকরকে ডাকিয়া যাহার সম্পত্তি তাহার ঘরে চালান করিয়া দিত। তড়িৎও দুই-চারবার গিয়া আর যাইতে চাহিত না। তাহাকে বইয়ের গাদা হাতে ঘরে ঢুকিতে দেখিলেই বিপিন তাড়া দিয়া উঠিত, "আমার ঘরটা কি গুদাম পেয়েছিস্? দেখ্ ত তাকিয়ে, এখানে অত বই রাখবার জায়গা আছে?"

তড়িৎ বলিত, "আমি কি জানি? তুমি কৃষ্ণাদিকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে! তোমার ঘরে জায়গা না থাকে, তুমি বই না কিন্‌লেই পারো?"

বিপিন বলিল, "আহা, কিনেছি ত চোরের দায়ে ধরা পড়েছি! আমার মাথার উপরেই ওগুলো থাক্‌তে হবে, এমন কোনো আইন হয়েছে নাকি? তোমার কৃষ্ণাদির অতবড় ঘরে এগুলোর আর জায়গা হ'ল না?"

তাহার পর হইতে, লইয়া যাইবার লোকের অভাবে অনেক বই কৃষ্ণার ঘরে থাকিয়া যাইত। জিনিষের অযত্ন করা বা ঘর আগোছালো করিয়া রাখা কৃষ্ণার স্বভাব ছিল না, কাজেই বইগুলি খুব যত্নেই থাকিত। বিপিন একদিন তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "মিস্ রায়, যে জিনিষ যেখানে ভালো থাকে তাকে সেইখানেই থাকতে দেওয়া উচিত নয় কি? এই বইগুলোর চেহারা দেখুন, আর আমার ঘরে যেগুলো আছে সেগুলোর চেহারা দেখুন। সেগুলোকে সের-দরে বিক্রি কর্‌লেও কেউ নেবে কি না সন্দেহ। সুতরাং আপনি যখন বই ভালোবাসেন তখন তাদের এ-রকম অযত্ন হ'তে দেওয়া উচিত নয়।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে যত্নে থাকে বটে, কিন্তু বইয়ের দোকানে তার চেয়েও যত্নে থাকে। আপনি যখন অর্দ্ধেকের বেশী না প'ড়েই ফে'লে রাখেন তখন অত বই কিন্‌বারই বা কি দরকার?"

বিপিন বলিল, "কি জানেন, আমার একটা স্বভাব, ভালো বই দেখলে না কিনে আমি থাক্‌তেই পারি না। তারপর সুবিধামতো পড়ি। অনেক বই কিন্‌বার দুবছর তিন বছর পরেও পড়েছি।"

বিপিনের সৌভাগ্যক্রমে তড়িৎ সেখানে উপস্থিত ছিল না, তাহা হইলে সে তখনই বলিয়া বসিত যে, কৃষ্ণা এ-বাড়ীতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বিপিনকে বিলাতী মাসিক পত্র ভিন্ন আর-কোনোপ্রকারের বই কেহ কোনোদিনও কিনিতে দেখে নাই। কৃষ্ণাও যে তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইল তাহা নহে, তবে এ-বিষয়ে আর কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকায় সে তখনকার মতো চুপ করিয়াই গেল। নূতন বই এবং মাসিক পত্র ইহার পর অবাধে তাহার ঘরে জমিতে লাগিল।

আজও কৃষ্ণা সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল, কোনোখানা পড়িতে ইচ্ছা হয় কিনা। বাড়ীর আনন্দস্রোতে তাহার যোগ দিবার কোনোই উপায় ছিল না, কারণ গৃহস্বামীকে সে একেবারেই চিনে না। সুতরাং একলা ঘরে বসিয়া থাকা ভিন্ন তাহার উপায় ছিল না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে পরিচয় তাহার করিতেই হইবে, কিন্তু কেহই এ-পর্য্যন্ত সেদিকে খেয়াল করে নাই।

মাসিকপত্রগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একটা পোষ্টকার্ড মেঝের উপর পড়িয়া গেল। কৃষ্ণা সেটা উঠাইয়া লইতে যাওয়ায় লেখকের নামটা তাহার চোখে পড়িল। তাহার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর রক্তের গতি হয়ত বা একটু দ্রুততর বহিয়া চলিল। এ নামটি তাহার অতি পরিচিত অথচ মানুষটিকে সে চেনে না।

সামান্য দুতিন লাইন লেখা, অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্ন ও দু-একটা অন্য কথা। অথচ কৃষ্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, কার্ডখানি সে লুকাইয়া রাখে।

এই অমূল্য সম্পদ্ হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। বিপিনের কাছে এ চিঠির কোনোই মূল্য নাই; এখানা হারাইলে তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। অথচ ইহা তাহারই ইহা অপহরণ করা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিসঙ্গত মোটেই হইবে না। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া পোষ্টকার্ডখানা আবার যথাস্থানে ঢুকাইয়া রাখিয়া দিল।

কয়েকমাস আগে যদি কেহ কৃষ্ণাকে বলিত যে, কোনো যুবককে না চিনিয়া, না জানিয়া, তাহার সহিত একটা কথা সুদ্ধ না বলিয়া কোনো যুবতী তাহার প্রতি অনুরক্তা হইতে পারে, তাহা হইলে সে কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। নভেল, নাটক এবং উপকথায় এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় বলিয়াই সে মনে করিত। কিন্তু এখন তাহার মত পরিবর্ত্তন করার সময় আসিয়াছিল।

সুবীরকে সে ভালোবাসে বলিলে হয়ত একটু বাড়াইয়া বলা হইত। কিন্তু সুবীর সম্বন্ধে তাহার যে একেবারেই কোনো মানসিক চাঞ্চল্য ছিল না তাহাও বলা যায় না। জগতের আর সব মানুষ হইতে এই মানুষটিকে সে বেশ কিছু পৃথক্ চক্ষে দেখিত। সুবীরের ভালোবাসার যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছিল তাহাতেই পৃথিবীর মূর্ত্তি তাহার কাছে রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণী নারীর মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা সর্ব্বদাই প্রায় লাগিয়া থাকে। এই অচির ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের সাথীরূপে কৃষ্ণা যাহাকে মানস-চক্ষে দেখিত, সে আর কেহ নয়, সে সুবীর। কেন যে ইহাকে সে হঠাৎ এত আপনার, এত প্রিয় বলিয়া অনুভব করিল তাহার কোনো সদুত্তর ছিল না। একমাত্র প্রেমের বিশ্ববিজয়ী দেবতা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন।

বিপিনের অনুরাগ দিন দিন যে প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল তাহা কৃষ্ণার কাছে অগোচর ছিল না। তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত, না এ-সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত থাকা উচিত, কৃষ্ণা ভাবিয়া পাইত না। উৎসাহ অবশ্য সে কিছুই দিত না, কিন্তু মানুষের মনের এ অবস্থায় সাধারণ ভদ্র ব্যবহার-

কেও উৎসাহ বলিয়া ভ্রম করা কিছু বিচিত্র নয়। বিপিন হয়ত এই ভুল করিতেছে বলিয়াই কৃষ্ণার সন্দেহ হইত। আজকাল তাহার প্রসন্নতার, হাসি-ঠাট্টা আমোদের আর অন্ত নাই। এমন কি জ্যাঠাইমার সমালোচনা করা, তড়িতের পিছনে লাগা পর্য্যন্ত সে ছাড়িয়া দিয়াছে। কৃষ্ণার ভয় হইত এই ব্যাপারটা শেষে এমন স্থানে না গড়ায় যেখানে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা ভিন্ন আর উপায় থাকিবে না। সোজাসুজি একটা এতবড় আঘাত দিতে তাহার মন কুণ্ঠিত হইত, অথচ না দিয়াই বা চলিবে কি-প্রকারে? বিপিনকে বিবাহ করিতে কোনো কালেই যে সে পারিবে না এ বিষয়ে তাহার নিজের কোনোই সন্দেহ ছিল না।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া তড়িৎ ডাকিল, "কৃষ্ণাদি।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া বলিল, "কি তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "বাবা আপনাকে ডাকছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, চল।"

তড়িতের সঙ্গে সঙ্গে সে গৃহিণীর শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তা একখানা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান-ভাবে বিশ্রাম করিতেছিলেন, কৃষ্ণাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলেন।

কৃষ্ণা দেখিল, ভদ্রলোক হাতে-বহরে গৃহিণীর স্বামী হইবার উপযুক্ত বটে। তবে গৃহিণী গৌরবর্ণা, ইনি বেশ কিছু শ্যামবর্ণ। মুখের ভাবটা তিনি সম্প্রতি খুব অমায়িক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা হইলেও স্বভাবতঃ যে তিনি বিশেষ ধীরপ্রকৃতির নয়, তাহার যথেষ্ট পরিচয় তাঁহার মুখে ছিল।

কৃষ্ণা তাঁহাকে নত হইয়া নমস্কার করিল। প্রণাম করিবে মনে করিয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু ইঁহাকে দেখিয়া শেষ অবধি তাহার আর প্রণাম করিবার ইচ্ছা রহিল না।

গৃহকর্ত্তা বোধহয় কি-ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করিবেন তাহা আগে হইতে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত?"

কৃষ্ণা বলিল, "না, অসুবিধা হবে কিসের জন্যে ?"

ভদ্রলোক অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "তড়িতের মায়ের কাছে শুন্‌লাম, বৌমারা লেখা-পড়ায় অনেক উন্নতি করেছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, কিছু কিছু শিখেছে।"

তাহার এই লোকটির সামনে বসিয়া থাকিতে অত্যন্তই অস্বস্তিবোধ হইতেছিল। তাঁহার দৃষ্টিটা যেন কেমন। এ বাড়ীর সকলকে সে আত্মীয়ের মতো দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তিটি মোটেই যেন সে-রাজ্যের নয়। ইহাকে কোনো মানুষ প্রথমে সন্দেহের চোখে না দেখিয়াই পারিবে না। আর কতক্ষণ যে তাহাকে এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহার ঠিকানা নাই।

এমন সময় গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমার পাত্রমিত্র সব হাজির হয়েছে এসে। নাওয়াখাওয়া সব ঘুরে যাবে বোধহয়।"

কর্ত্তা উঠিয়া বলিলেন, "না, না, ওরা এখনই চ'লে যাবে। একটু দেখা কর্‌তে এসেছে বই ত নয় ? তোমার রান্না হতেও ঢের দেরি।" এই বলিয়া তিনি চটি পায়ে দিয়া বাহিরের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিজের ঘরে আসিয়া ভাবিল, ভাগ্যে বাড়ীর কর্ত্তাটি দূরে-দূরেই থাকেন, তাহা না হইলে এ বাড়ীতে কৃষ্ণাকে একমাসও কাটাইতে হইত না। সে একটা সেলাই টানিয়া লইয়া বসিয়া গেল।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিতে দেরি হইল ঢের। কৃষ্ণার দেরিতে খাওয়া অভ্যাস নাই, অথচ বাবু এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবের খাওয়া না হইলে, মেয়েরা খাইবে না। কাজেই প্রতিভা দয়া করিয়া আগেভাগে থালা সাজাইয়া খাবার আনিয়া তাহার ঘরে হাজির করিল ; বলিল, "কৃষ্ণাদি, আপনি খেয়ে নিন, নইলে আবার মাথা ধরবে। আমাদের এখনও ঘণ্টা-চার দেরি আছে। শ্বশুরমশায় ত এখনও স্নান করতেই ওঠেননি।"

কৃষ্ণা খাইতে বসিয়া বলিল, "খুব ভালো রান্না হয়েছে। কে কি রেঁধেছে ?"

প্রতিভা বলিল, "পোলাও আর মাংস আমি রেঁধেছি, আর চাটনীটা। বাকি সব দিদি করেছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "সবই বেশ ভালো হয়েছে। আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "আপনি ত দিলেন, কিন্তু কর্ত্তা-মশায়ের সার্টিফিকেট না পেলে আজ মায়ের বকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যাবে।"

এমন সময় ডাক পড়ায় প্রতিভা চলিয়া গেল। কৃষ্ণাও খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। পাশের বাড়ী একঘর বাঙালী বাস করিত। তাহাদের একটি বৌ মাঝে মাঝে জানলা খুলিয়া কৃষ্ণার সহিত আলাপ করিত। কৃষ্ণাকে প্রায়ই সে যাইতে বলিত, এতদিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণা তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারে নাই। আজ ঘরে আর কিছুতেই তাহার মন টিকিতেছিল না, কাজও কিছু ছিল না। সে জুতা পায়ে দিয়া কাপড়-চোপড় একটু ঠিক করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু এখানেও তাহার বিশেষ সুবিধা হইল না। কৃষ্ণা এক রাজ্যের মানুষ, ইহারা আর এক রাজ্যের। দুইচারিটি বিষয়ে মাত্র এমন স্থলে গল্প করা চলে, এবং তাহা শেষ হইতেও বেশী সময় লাগে না। কাজেই ঘণ্টা-খানিকের মধ্যেই কৃষ্ণা উঠিবার জোগাড় করিতে লাগিল।

খুকী আসিয়া তাহার বিদায়-গ্রহণটা সোজা করিয়া দিল। বলিল, "কৃষ্ণাদি, মা আপনাকে একটু ডাকছেন।"

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল। যদিও এত ব্যস্ততার মধ্যে গৃহিণী কেন যে তাহাকে ডাকিতেছেন, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, গৃহিণী তখন স্নানের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমাদের সকলের ত রাত্রে ওঁর এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন হয়েছে। তুমি কি যাবে, না বাড়ীতেই খাবে? ঠাকুরকে তাহ'লে ব'লে দিই।"

কৃষ্ণা বলিল, "এ বেলা যা খাওয়া হয়েছে, ও বেলা কিছু না খেলেও ক্ষতি

নেই। কিন্তু আপনি ত তা হ'তে দেবেন না। ঠাকুরকে ব'লে দেবেন, দুটো ভাতে ভাত সেদ্ধ ক'রে দিতে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, ভাতে ভাত খেতে যাবে কিসের দুঃখে? কত মাছ-তরকারি বলে জমা হয়ে রয়েছে, এ বেলা সব খরচ হয়নি। আমি ঠাকুরকে বলে যাব এখন, তোমার কিছু কষ্ট হবে না।"

কৃষ্ণা যেন মাছ-তরকারি না খাইতে পাইবার আশঙ্কায় মরিতে বসিয়াছিল আর-কি? কিন্তু ভালো করিয়া খাইতে না পাওয়া গৃহিণীর কাছে একটা মহা দুঃখের বিষয়। কাজেই কৃষ্ণা আর কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহার ডাইরি লেখার অভ্যাস ছিল। আজ অনেকদিন পরে খাতাখানা দেরাজ হইতে বাহির করিয়া লিখিতে বসিল।

পাশের ঘরে অমিয়া প্রতিভা তড়িৎ, মহা কোলাহল সহকারে সাজ করিতেছিল। রেঙ্গুনের বাড়ীতে দুইটা ঘরের মধ্যে কখনও পুরা দেওয়াল থাকে না, সব কাঠের বা ইঁটের আধা পার্টিশন, কোনো কথাই পাশের ঘর হইতে কাহারও শুনিতে বাকি থাকে না। কাজেই নিজের সম্বন্ধে অনেক প্রকার কথাই মাঝে মাঝে কৃষ্ণার কানে আসিতে লাগিল। গৃহিণী মাঝে আসিয়া একবার বলিলেন, "দেখ গো বৌমারা, আজ যার যত গহনা আছে সব প'রে যাবে। ওসব মেমসাহেবী পোষাক তোমাদের থিয়েটার বায়োস্কোপের জন্যে রাখো, আমাদে বাঙালীর মধ্যে ওসব ভালো দেখায় না। এ-রকম ক'রে গেলে ওরা মনে করবে, শ্বশুর-শাশুড়ী এদের কিছু দেয়নি বুঝি।"

খানিক পরে শাশুড়ীর আদেশ মতো সাজসজ্জা সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণার ঘরের সম্মুখ দিয়া সকলে চলিয়া গেল। কৃষ্ণাকে লেখায় ব্যস্ত দেখিয়া আর কেহ তাহার কাজে ব্যাঘাত করিল না।

আধঘণ্টা-খানিক পরে দরজার সামনে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বিপিন দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন না বড়!"

'বিপিন বলিল, "খাওয়া ত রাত্রে, এত আগে গিয়ে কি কর্‌ব? জ্যাঠামশায় তাস খেল্‌বেন, জ্যাঠাইমা নিজের বড়মানুষীর পরিচয় দেবেন, বৌদিরা গহনা দেখবেন এবং দেখাবেন। আমার ত কিছুই করবার নেই, কাজেই গেলাম না; তাছাড়া বাড়ীতে একটু দরকারও ছিল।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দরকারটা আপনার সঙ্গে।"

কৃষ্ণা কিছুই বলে না দেখিয়া বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "খুব কি ব্যস্ত আছেন? আপনার মিনিট-দশবারোর বেশী লাগবে না।"

কৃষ্ণার বুকের ভিতর তখন ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন না শুনিয়া উপায় কি?

যাক, একেবারে চুকাইয়া ফেলা যাক, মনে করিয়া কৃষ্ণা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। দরজার বাহিরে আসিয়া বলিল, "না, এমন-কিছু কাজ নয়। আজ না হয়, কাল লিখলেও ক্ষতি নেই।"

সিঁড়ির মুখে যে জায়গাটাতে কৃষ্ণারা চা খাইত, বিপিন সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "বসুন।"

কৃষ্ণা বসিয়া বলিল, "আপনি দাঁড়িয়েই রইলেন!"

বিপিন একটা চেয়ারের পিঠে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বস্‌লে যেটুকু সাহস কোনোরকমে জোগাড় করেছি, তাও জল হয়ে যাবে। দাঁড়িয়েই থাকি। কি ক'রে যে কথা আরম্ভ করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

উপায় থাকিলে কৃষ্ণা তাহার কথার অপেক্ষা না করিয়া, তখনই পলায়ন করিত। কি কথা যে বিপিন বলিতে চায়, তাহা জানিতে তাহার বাকি ছিল না। এ ধরণের কথা যে তাহাকে শুনিতে হইবে, তাহার জবাব দিতে হইবে, তাহা কৃষ্ণা কিছুদিন হইতে নিশ্চয় করিয়া জানিত। তবু ব্যাপারটা একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়ায় তাহার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মাথা নীচু করিয়া সে চুপচাপ বসিয়াই রহিল।

বিপিন বলিল, "কি বলতে চাই, হয়ত আপনি জানেনেই। তবু আমার

পরিষ্কার ক'রে বলা উচিত। জ্যাঠামশায় এবার ফিরে যাবার সময় সঙ্গে ক'রে আমাদের এক ভাইকে নিয়ে যেতে চান। যদি আমাকে নিয়ে যান তাহ'লে অনেক দিনের মতো আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, কাজেই যে-কথাটা আরো কিছুদিন পরে বললে হয়ত ভালো হ'ত, আজই আমায় তা বলতে হচ্ছে। আপনি হয়ত বুঝতে পেরেছেন, আপনাকে আমি কি চোখে দেখি। আপনাকে স্ত্রীরূপে পাবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই, তা আমি খুব ভালো ক'রে জানি। তবু ভালোবাসাই একমাত্র যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করে না, সেই আশায় আপনার সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারছি। আমার কি কোনো আশা আছে?"

বিপিনকে এ ধরণের কোনো আশা দেওয়া কৃষ্ণার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহার হৃদয়ের সিংহাসন যদি আর-একটি মানুষ প্রায়-দখল করিয়া নাও রাখিত, তাহা হইলেও বিপিনকে সে-স্থলে কৃষ্ণা অভিষিক্ত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইহাকে ব্যথা দিতে তাহার সমস্ত মন পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তবু না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহার পর তাহারও এখানকার বাস উঠিল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল।

বিপিনের দিকে চাহিতে সে পারিল না। মাথা তেমনই নীচু করিয়াই বলিল, "আপনাকে চিরকাল বন্ধু ব'লেই জানব, তার বেশী-কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

বিপিনের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কয়েক মিনিট সে চুপ করিয়াই রহিল, কেবল বেতের চেয়ারখানা তাহার বলিষ্ঠ মুষ্টির পীড়নে মড়মড় করিয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ সে সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কেন যে এই অশ্রুপাত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। আর-একজনকে ব্যথা দেওয়ার ব্যথাও ত কম নয়? তাহার উপর নিজের নিঃসঙ্গ

স্নেহপ্রেমহীন জীবনের দুঃখও আজ যেন পথ পাইয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে সে এইরকম ভাবে পড়িয়া ছিল, তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ বাহিরের দরজায় করাঘাতের শব্দে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, কেহ নাই কেবল একটা চিঠি পড়িয়া আছে। সিঁড়িতে তখনও পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছিল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িল। কোনো সম্বোধন নাই, কেবল কয়েক লাইন লেখা।—"আমার মনে হয়েছিল, আমার আশা আছে, তাই অতটা সাহস করেছিলাম। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, ক্ষমা করবেন। আমি আর দু-তিনদিন মাত্র এখানে আছি; সুতরাং আপনার বেশী অসুবিধা কিছু হবে না। এ কথা আর-কেউ না জানলে ভালো। দুঃখ সহ্য করতে পারি, কিন্তু দুঃখের অপমান সহ্য করতে পারব না।—বিপিন।"

কৃষ্ণার চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

২৮

ভানুমতী আস্তে আস্তে সারিয়া উঠিতেছিলেন। তবে ডাক্তার তাঁহাকে এখনও হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইবার অনুমতি দেন নাই। ঘরের ভিতরেই সোফা বা ঈজি চেয়ারে মাঝে মাঝে তিনি উঠিয়া বসিতেন, কথাবার্ত্তা বেশী-কিছু বলা বারণ ছিল এবং কথা বলিবার লোকও বিশেষ কেহ ছিল না। সুবীর অবশ্য প্রায় সমস্তদিনই মায়ের কাছে কাটাইত, কিন্তু সেও কথাবার্ত্তা বেশী বলিত না। বলিতে গেলেই কোন্ কথা উঠিয়া পড়িবে তাহা তাহার জানা ছিল, এবং ইহাতে ভানুমতীর খানিকটা উত্তেজনা হওয়া অনিবার্য্য। তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ওঠা এখন একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে এই অপরিসীম জটিলতার অবসান ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

সুবীরের দিনগুলি কাটিতেছিল অদ্ভুতভাবে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব-

টাই যেন স্বপ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে সুবীর, অথচ সে সুবীর নয়। 'সে যাহা-কিছুর সঙ্গে নিজের জীবনকে এতদিন একত্রে গাঁথিয়া চলিয়াছে, সে-সকলই হঠাৎ তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। জন্মের সম্পর্কে যাহাদের সে আত্মীয় বলিয়া জানিত, এখন তাহারা তাহার কেহ নয়; নিজেকে যে-ভবিষ্যতের ভিতর চিরদিন সে কল্পনা করিয়াছে, সেটা হঠাৎ আকাশ-কুসুমের মত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

মহা ধনবান্ ভূস্বামী হইতে একেবারে নাম-বংশ-পরিচয়হীন দরিদ্রের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মনেও অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার কোনো অপরাধ ইহার ভিতর নাই, কিন্তু দৈবের চক্রান্তে সে এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা অনেকের কাছেই হাস্যকর মনে হইবে। ইন্দ্র কয়েকদিন পূর্ব্বে একরাত্রির জন্য আবুহোসেনের মতো সম্রাট্ হইতে চাহিয়াছিল, তখন সে জানিত না যে তাহার নিজের অবস্থাই আবুহোসেনের মতো। এক রজনীর পরিবর্ত্তে ভাগ্য তাহাকে বেশী কিছুদিন রাজত্ব করিতে দিয়া হঠাৎ চরম রিক্ততার মধ্যে ফেলিয়া নিজের নিষ্ঠুর পরিহাসবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। যাহা-কিছু পরিচিত, সমস্তকে জীবন হইতে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে হয়ত তাহার মনে একটু শান্তি আসিত। কিন্তু যে-বংশের উপর আইনতঃ তাহার আর-কোনো দাবী নাই, সেইখান হইতে অদ্ভুত এক স্নেহের বন্ধন তাহাকে নাগপাশের মতো বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহার জন্মদাত্রী জননী কে ছিলেন সে জানে না, সন্তানকে এই পৃথিবীর নির্ম্মম কবলে ফেলিয়া তিনি বহুদিনই জগৎ-সংসার হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মা তাহার ছিল না বা নাই, একথা সে মুখেও আনিতে বা মনে ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার সমস্তই গিয়াছে, পৃথিবীর চক্ষে সে ভিখারী, কিন্তু স্নেহের সম্পদে সে সম্রাট্ হইতেও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া রহিয়াছে।

ভবানীর কথা ভানুমতী কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন নাই। তিনি জানিতেন সুবীর তাঁহার সন্তান নয়। হয়ত বা পৃথিবীর কোথায় কোন্ কোণে তিনি যে হতভাগিনী কন্যাকে জন্মদান করিয়াছেন, সে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহার

প্রতি স্নেহের পরিবর্ত্তে, বিদ্বেষই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে পথের ভিখারী করিয়া এ কোন্ রাক্ষসী তাহার স্থানে আসিয়া বসিতে চায়? দৈব যদি তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তাহাকে কি তিনি সন্তান বলিয়া বুকে টানিয়া লইতে পারিবেন? হয়ত পারিবেন না।

সুবীরের বিপদ্ হইয়াছিল ভানুমতীকে লইয়া। সে যদি একেবারে ইহাদের সহিত সব সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভানুমতী যে বাঁচিবেন না তাহা সে নিশ্চিত করিয়া জানিত। কিন্তু এতকাল যেখানে সে রাজত্ব করিয়াছে, সেখানে অন্য লোক আসিয়া বসিবে, এ দৃশ্য দূরে দাঁড়াইয়া দেখাও যে কত কঠিন হইবে, তাহা সে বুঝিত। কি যে করিবে, কিছু ভাবিয়া পাইত না। এমন মানুষ কেহ ছিল না যে তাহাকে একটু পরামর্শ দেয়, কারণ কাহারও কাছে এ কথা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই। যেমনভাবে সব চলিত, তেমনিই চলিতেছিল। বাড়ীর লোক, বাহিরের লোক সকলে ভাবিত, সম্প্রতি বাড়ীতে একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার উপর ভানুমতীও এমন পীড়িতা, সেইজন্য বুঝি সুবীর এত বিষণ্ণ, এত অন্যমনা। ভানুমতীও মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কোনো উপলক্ষ্যই ছিল না।

আজও সকালে সুবীর নিজের ঘরে একলা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ভানুমতী এখনও উঠেন নাই। তিনি উঠিয়া, মুখ ধুইয়া, ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করার পর সুবীর তাঁহার ঘরে যাইত। তাহার সামনে অনেক চিঠিপত্র কাগজ ইত্যাদি জমা করা। যেগুলি তাহার ব্যক্তিগত চিঠি সেইগুলি কেবল খোলা এবং পড়া হইয়াছে, জমিদারী সংক্রান্ত চিঠিপত্র কাগজ ইত্যাদি সে আর স্পর্শ করে নাই, সেগুলি যেমন আসিয়াছে তেমনি পড়িয়া আছে। এসবের ব্যবস্থা করিবার তাহার আর অধিকার নাই।

সিঁড়ি দিয়া হঠাৎ অনেক মানুষ ওঠার শব্দ শোনা গেল। সুবীর ভাবিয়াই পাইল না, কোথা হইতে কে এত সকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু

মিনিট-দুইয়ের মধ্যেই কণ্ঠস্বর, অলঙ্কারের সিঞ্জন, শাড়ীর খস্‌খস্‌, শিশুর কান্না, সব মিলিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে শোভাবতী সপরিবারে আসিতেছেন। সুবীর দরজার কাছে আসিয়া একবার সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল। শোভাবতী, তাঁহার কন্যা, নাত্‌নী ও নববধূ সহ বহু কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতেছেন। রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিয়া সুবীর মনে মনে বলিল, "ভগবান্‌ তোমায় বাঁচিয়েছেন, তোমার মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে। রাজার রাণী হতে যাচ্ছ মনে ক'রে এতক্ষণে পথের কাঙালিনী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ত।"

দুর্গা তাহাকে দেখিতে পাইয়া নীচ হইতে বলিল, "উঁকি মেরে দেখা হচ্ছে কি শুনি? তুমি এখন ভাসুর তা যেন মনে থাকে।"

সুবীর হাসিয়া সরিয়া গেল। শোভাবতী মেয়েকে বকিয়া উঠিলেন, "দেখেছে ত কি হয়েছে? নূতন বৌ সবাই দেখতে পারে। খোকা, আমরা ভানুর ঘরে বস্‌ছি গিয়ে, তুইও আয়। তোদের বৌ দেখাতেই নিয়ে এসেছি। যেমন আমার কপাল, না রইলি বৌভাতে, না রইলি বিয়েতে।"

সুবীর ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "যাচ্ছি মাসীমা, আপনারা যান।"

ভানুমতীকে নার্স তখন মুখ ধোয়াইয়া, সোফার উপর উঠাইয়া বসাইয়া বিছানাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল। শোভাবতীকে দেখিয়া ভানুমতীর মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। বলিলেন, "এস দিদি, এস। নূতন বৌকে নিয়ে এসেছ বুঝি? কই, ঘোমটা খোল, দেখি কেমন সুন্দর বৌ।"

বোনকে সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া শোভাবতী খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "যাক্‌, বাঁচলুম, বাবা। তোর অসুখের জন্যে আমার আর মনে শান্তি ছিল না। সারাক্ষণ বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করে, কখন কি হয়। এই যে দুর্গা, বৌকে নিয়ে আয় এদিকে, ঘোমটাটা অতখানি টেনে দিয়েছিস্‌ কেন? উঠিয়ে দে, তোর মাসীমা ভালো ক'রে দেখুক।"

দুর্গা বলিল, "ওমা, নতুন বৌ, ঘোমটা দেবে না ত কি? সব সাহেব-মেমের পাল্লায় প'ড়ে মাও দেখছি মেম হয়ে উঠছ। এই নিয়ে বলে আমার শ্বশুরবাড়ী কত ঘোঁট হয়।"

শোভাবতী একেবারে ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "আরে বাবা, ঘোঁট হয়! কি সব সাত কুলীনের এক কুলীন কুটুম করেছি গো, তাঁরা আবার ঘোঁট করেন আমায় নিয়ে। কেন লা, কিসের ঘোঁট? আমি কি গোরু খাই, না বল্ নাচি যে, আমায় নিয়ে ঘোঁট করে? মা, মা, মা! কত দেখব কালেকালে। করুক্, করুক্, একশ'বার করুক্। কারো খাইও না, কারো পরিও না। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ত দশ হাজার টাকা খরচ ক'রে। এ কথা কোনো ব্যাটা-বেটী বল্‌তে পার্‌বে না যে, খয়রাৎ ক'রে মেয়ে নিয়েছে।"

মায়ের প্রচণ্ড গর্জ্জনে ভড়কাইয়া গিয়া দুর্গা একেবারে চুপ করিয়া গেল। ভানুমতী বলিলেন, "যাক্‌গে দিদি, যাক্‌গে, ছেলেমানুষ একটা কথা ব'লে ফেলেছে, তাই নিয়ে অত রাগ করে না। থাম্, থাম্, এখনি ঘোমটা খুলিস্ না। লক্ষ্মীকে খালি হাতে দেখব না। ও বাছা, সুরবালা, যাও ত, কোনো দাসী কি চাকরকে দিয়ে আমার ছেলের কাছ থেকে আমার আলমারীর চাবিটা নিয়ে এস।"

নার্স্ বাহির হইয়া গেল ও কয়েক-মিনিট পরে চাবি লইয়া ফিরিয়া আসিল। ভানুমতী তাহাকে আলমারী খুলিতে বলিলেন। তারপর বলিলেন, "ঐ যে কোণার দিকে ঐ চন্দন-কাঠের বাক্সটা রয়েছে, ঐটা বার ক'রে আন ত।"

নার্স্ বাক্স আনিয়া তাঁহার পাশে রাখিল। সেটি খুলিয়া তিনি একছড় মুক্তার মালা বাহির করিয়া লইলেন। দুর্গাকে বলিলেন, "এইবার নিয়ে আয় বৌ, দুর্গা, দেখি।"

দুর্গা নূতন বধূকে সাম্‌নে আনিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া দিল। বৌ নত হইয়া প্রণাম করিতেই, ভানুমতী তাহার গলায় মুক্তার মালাটি পরাইয়া দিয়

আশীর্ব্বাদ করিলেন। দিদিকে বলিলেন, "সত্যি দিদি, ঠিক যেন লক্ষ্মী! দেখো এখন এ বৌয়ের ভাগ্যে সুশীলের কত বাড়বাড়ন্ত হয়।"

শোভাবতী বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ কর্। কিন্তু নিজের এত দামী গহনাটা দিয়ে দিলি যে? না-হয় পরে একটা কিছু গড়িয়ে দিতিস্, এত তাড়া ত কিছু ছিল না। এ-সব তোর বৌ এসে পর্‌লেই ঠিক হ'ত।"

ভানুমতীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। কোনো রকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "বৌয়ের গহনার অভাব কি দিদি? সবই ত তার জন্যে রইল। এটা দিলাম, ইচ্ছে হ'ল তাই। গড়িয়েই দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তারপর যা-সব আরম্ভ হ'ল, আর কোনো কথা মনে ছিল না।"

এমন সময় সুবীর আসিয়া প্রবেশ করিল। নতুন বৌ ঘোমটা আবার লম্বা করিয়া টানিয়া দিল। শোভাবতী বলিলেন, "আয় খোকা, সুশীলের বৌ দেখাতে নিয়ে এলাম। তোর ত দেখা মানুষই, তবু আর একবার দেখ্।"

সুবীরকেও বৌ ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। তবে সে ভাসুর হয় বলিয়া পা ছুঁইল না। দুর্গা সুবীরকে হাসিতে দেখিয়া, কি একটা বলিবার উপক্রম করিয়া থামিয়া গেল। মায়ের বকুনিটা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল।

ভানুমতী বলিলেন, "খোকা, আমি ত উঠতে পারি না। নীচে দাসীদের ব'লে দে, সব জোগাড় ক'রে আনুক। নূতন বৌ এসেছে, মিষ্টিমুখ করাতে হবে ত?"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা, আমি সব ব'লে দিচ্ছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

সে বাহির হইতে-না-হইতেই শোভাবতী বলিলেন, "ভবানী যে গিয়েছে, তা যেন প্রতি পদে টের পাওয়া যাচ্ছে। সে থাক্‌তে কি কর্‌তে হবে-না-হবে, তা তোকে কোনোদিন মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে হয়নি।"

ভানুমতী চুপ করিয়াই রহিলেন। কথাগুলা সুবীরেরও কানে গিয়াছিল। সে ভাবিল, কবে যে এই-সব লুকোচুরির অবসান হইবে। নকল রাজা হইবার দুঃখ বোধহয় ভিখারী হওয়ার চেয়ে বেশী।

ঘণ্টাখানিক পরে শোভাবতী সকলকে লইয়া চলিয়া গেলেন। সুবীর তখন ভানুমতীর ঘরে গিয়া বলিল, "মা, আজ ত মনে হচ্ছে তুমি অনেকটা ভালো আছ। আমাদের কাজ এখন আরম্ভ করতে হবে; দেরি ক'রে লাভ কি?"

ভানুমতীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করতে চাস্ বাবা? তোকে ছেড়ে আমি একদিনও বাঁচব না তা ব'লে দিচ্ছি। এ সব ধন-দৌলতে আমার কাজ নেই, আমি তোকে নিয়ে কাশী চ'লে যাব। আমার নিজের যা আছে তাতেই আমাদের মায়ের ছেলের বেশ চ'লে যাবে।"

সুবীর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মা, কি পাগলের মতো কথা বলছ? যার বিরুদ্ধে সকলে মিলে অবিচার অন্যায় করেছে, তাকেই তুমি শেষ অবধি দোষী করতে চাও? সে মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে টাকাকড়ি, জমিদারী ফিরিয়ে দিলেই কি তার সব ক্ষতিপূরণ হবে? তোমার মত মায়ের সন্তান হয়েও যে তোমাকে জানল না, তোমার স্নেহ এককণা পেল না, তার সেই ক্ষতি কি কোনো আর্থিক ক্ষতির চেয়ে কম? তাকে শেষ অবধি তুমি বঞ্চিতই রাখতে চাও?"

ভানুমতীর দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ তিনি কথাই বলিতে পারিলেন না। তাহার পর বলিলেন, "বাবা, তোকে আমি সব শাস্তি নিতে দেব না। আমার যতদূর সাধ্য আছে আট্‌কাব। তুই কোনো দোষে দোষী নস্, তোর উপরেই সব চাপ পড়বে? এই কি উচিত?"

সুবীর বলিল, "মা, উচিত-অনুচিত জানি না। দোষী আসলে যারা, তারা কেউ বেঁচে নেই, সুতরাং শাস্তি তারা নিতে আস্‌বে না। ইচ্ছায়

হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাদের অপরাধের ফলে সুবিধাটা আমারই হয়েছিল, আমিই এতদিন যাতে আমার অধিকার নেই তা ভোগ করছি, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত খানিকটা আমায় করতেই হবে। দুটি মানুষকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, একটি তোমার মেয়ে, আর-একটি তোমার দেবর। দুজনকে তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতেই হবে, তাতে অন্যদের যা অসুবিধা হয় হবে, উপায় নেই।"

ভানুমতী বলিলেন, "সে মেয়ের খোঁজ পাবি কি ক'রে? তাদের খবর ত কেউই জানে না।"

সুবীর বলিল, "খোঁজ ক'রে বার করতে হবে। সেই জন্যেই ত আর দেরি করতে চাইছি না। তুমি অনুমতি দিলে এখনই কাজ সুরু করতে পারি।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা তোর খুসি কর্ বাবা। বেশী লোক-জানাজানি এখনই করিস্নে। এই নিয়ে বেশী সোরগোল হ'লে আমার জ্বালা আরো বাড়বে।"

সুবীর বলিল, "সোরগোল যাতে একেবারে না হয়, তারই ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, আমি তাহ'লে একবার বেরোচ্ছি।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবি?"

সুবীর বলিল, "দুজন লোকের কাছে। তার একজন উকীল নিত্যরঞ্জনবাবু, তাঁকে ত তুমি জানই, আর একজন আমার চেনা এক ছোকরা, C. I. D-তে কাজ করে।"

ভানুমতী নীরবই রহিলেন। সুবীর বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা তিন-চার পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সঙ্গে আর-একজন যুবক। ভানুমতীর ঘরের সম্মুখেই ভবানীর ঘর। ভবানী মারা যাইবার পর হইতে ইহা তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে, কেহ আর ইহা খোলে নাই।

চাবি আনাইয়া সুবীর দরজাটা খুলিয়া দিল। দুজনে ভিতরে প্রবেশ

করিলে পর সুবীর বলিল, "এই ঘরেই সে বরাবর ছিল, আমার যতদূর মনে পড়ে। তার জিনিষপত্র যা-কিছু সব এখানেই আছে, কেউ নাড়ে-চাড়েনি।"

ঘরে জিনিষ বড় বেশী ছিল না। একখানা তক্তপোষ, একটা বড় ষ্টীলট্রাঙ্ক, একটা কাঠের বাক্স। একটা ছোট চেয়ার এবং টেবিলও শেষাশেষি ডাক্তারের আদেশে এ ঘরে আনীত হইয়াছিল। এক কোণে একটা পুরাতন ভাঙা আলমারী, দেওয়ালের গায়ে ভানুমতীর একখানি এবং সুবীরের একখানি ফোটোগ্রাফ। ইহাই ঘরের আস্‌বাব।

যুবক বলিল, "বাক্স-দুটো আর আলমারীটা একটু দেখতে হবে।"

আলমারীটা প্রথম খোলা হইল। তাহার ভিতর ভবানীর লেপ-কম্বল এবং বাড়ীর যত পুরানো ছেঁড়া কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি গাদা করা। দু-তিনখানা কাঁথাও অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় এক কোণে গোঁজা রহিয়াছে।

যুবক বলিল, "বাক্সটা খুলুন। এর ভিতর ত দরকারী কিছু নেই দেখছি।"

কাঠের বাক্সের ভিতর পানের সরঞ্জাম, মাথার তেল, চিরুণী, দুই-চারিটা পেটেণ্ট্ ওষুধ। বাকি রহিল শুধু ষ্টীলট্রাঙ্কটা। সেটাও খোলা হইল।

উপরে অনেকগুলি থানধুতি, সেমিজ এবং লংক্লথের হাত-কাটা জামা পরিপাটি করিয়া সাজানো। দুখানা গরদের থান, দুখানা মট্‌কার থান এবং দুখানা কাশীর তসরের চাদরও রহিয়াছে। সেগুলি উঠাইয়া ফেলার পর অনেকগুলি চিঠি ফিতা দিয়া বাঁধা, দুতিনখানা মোটা মোটা মলাট- দেওয়া খাতা ও ছোট একটা আবলুস্ কাঠের বাক্স দেখা গেল।

যুবক বলিল, "এইবার কাজের জিনিষ পাওয়া যাবে। ছোট কালো বাক্সটা খুলুন ত?"

সুবীর খুলিয়া দেখিল, একগাছি সরু সোনার হার, এক জোড়া বালা, আর কালো সুতায় বাঁধা মাদুলি। আর কিছু নাই।

আবলুস কাঠের বাক্সটি যেখানে ছিল, সেখানেই রাখিয়া দেওয়া হইল। খাতাগুলি এবং চিঠির তাড়াটা লইয়া যুবক বলিল, "আমি এগুলো নিয়ে

চললুম। কাল বিকেলে এসে আপনাকে রিপোর্ট দেব। এ বাড়ীতে খুব পুরোনো ঝি কি চাকর কেউ আছে কি?"

সুবীর বলিল, "না, তেমন পুরোনো কেউ নেই। সবচেয়ে পুরোনো যারা, তারাও আট দশ বছর আগে এসেছে।"

যুবক চলিয়া গেল। সুবীরের মনটা যেন আজ অন্য দিনের চেয়েও ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছিল। বাড়ী-ঘর সব যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিতেছিল। সে মোটরটা আনাইয়া চড়িয়া বসিল, ড্রাইভারকে বলিল, "পেট্রল আছে কি না দে'খে নাও, একবার ব্যারাকপুর ঘুরে আসা যাক।"

২৯

মাইল-ত্রিশ-চল্লিশ ঘুরিয়া আসিয়া সুবীরের মনটা একটু হাল্‌কা বোধ হইতেছিল। অদৃষ্টের পরিহাসটা তাহার তত নিদারুণ আর মনে হইতেছিল না। হাজার হউক সে পুরুষ, শিক্ষা-দীক্ষাও তাহার একরকম সমাপ্ত হইয়াছে, অন্ততঃ বাংলাদেশের অতি অল্প ছেলেরই ইহার বেশী হয়। তাহার কোনো গলগ্রহ নাই, বায়ুর মতোই সে মুক্ত স্বাধীন। আজ যদি হঠাৎ তাহাকে রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইতেই হয়, তাহাতেই বা কি? জগতে ইহার অপেক্ষা নিদারুণ দৈববিড়ম্বনার ইতিহাস কিছুমাত্র বিরল নয়। প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর রুষিয়ার জারের পরিবার যদি তুষার-হিম পথে দিয়াশলাই বিক্রয় করিয়া ফিরিতে পারে, একমাত্র পরিধেয় ভিন্ন তাহাদের যদি দ্বিতীয় বস্ত্রও না থাকে, তবে সুবীরের অবস্থাটা এমনই কি শোচনীয়? তাহাকে অন্ততঃ প্রাণভয়ে মূষিকের মত গর্ত্তে লুকাইয়া বেড়াইতে হইবে না। তাহার স্বাস্থ্য ভালো, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষও সংসারে যে একেবারে নাই তাহা নহে। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যে-কোনো পথে যাইতে সে চায়, ভানুমতীর সাহায্য সে পাইবে। উহা লইতেও কুণ্ঠিত হইবার তাহার কোনো কারণ নাই, খানিকটা

ক্ষতিপূরণ সে দাবীই করিতে পারে। কাহাকেও সে বঞ্চিত করিবে না, কারণ ভানুমতীর একান্ত নিজস্ব টাকারও অভাব নাই।

ভানুমতীর ঘরে যাইতে তাহার তখন আর ইচ্ছা করিল না। নিজের ঘরে বসিয়া সে আলমারীর সব-ক'টা দেরাজ টানিয়া খুলিয়া তাহার ভিতরের রাশীকৃত জিনিষ গোছাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এ ঘর ছাড়িবার দিন ত আসিয়া পড়িল, এখন একবার ভালো করিয়া সব-কিছুর হিসাব করিতে হইবে। একেবারে একবস্ত্রে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে না, তাহা নিশ্চয়; করিতে চাহিলেও ভানুমতী তাহাকে করিতে দিবেন না, এবং অতখানি বিয়োগান্ত নাটকের মতো ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তবু যাহা কিছু সে এতদিন ব্যবহার করিয়াছে সবই লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না। ভানুমতীর এক সন্তান সাজিয়া, সে এতদিনে কম হীরা-জহরৎ সংগ্রহ করে নাই। পাঞ্জাবীর সোনার এবং হীরার বোতাম, মুক্তার studs, নানারকম বহুমূল্য টাইপিন্, দশ-বারোটা হীরা, পান্না এবং নীলার আংটি, খাইবার এবং চায়ের রূপার বাসন, ফুলদানী, গৃহসজ্জাতে তাহার আলমারী ঠাসা হইয়া আছে। এগুলি লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, উচিতও হইবে না। অধিকাংশই জমিদারীর আয় হইতে ক্রীত, উহার উপর ভানুমতীর বা সুবীরের কোনো অধিকার নাই। ভানুমতীর কন্যারই উহা প্রাপ্য। এই জিনিষগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, সুবীর আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

তাহার পর তাহার কাপড়-চোপড়। একটা মানুষ সারা জীবন ধরিয়া দিনে তিনচারখানা কাপড় পরিলেও, এগুলির অবসান হইবার সম্ভাবনা অল্প। ভানুমতীর এক রোগ কাপড় কেনা, প্রয়োজন থাক বা নাই থাক। নিজের জন্য কিনিবার উপায় নাই, ভগবান্ সে পথে বহুদিন হইল কাঁটা দিয়া রাখিয়াছেন। নিজের ঘরে কন্যা বা বধূ নাই, সুতরাং সুবীরের জন্য প্রয়োজনের দশগুণ অধিক কাপড়-চোপড় করাইয়াই তিনি মনের খেদ মিটাইতেন। দামী শালই বোধহয় ছিল তাহার দশ কি পনেরো জোড়া। তাহার ভিতর বেশী জমকালো গুলি, একদিন করিয়া বড়জোর সে গায়ে

দিয়াছে। সাহেব সাজিতে স্বীর অত্যন্তই আপত্তি অনুভব করিত, কারণ তাহার গায়ের রংটা ছিল কালো। তবু জমিদার হইয়া জন্মানোর অপরাধে তাহাকে মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া সাহেব-সুবার সঙ্গে দেখা করিতে হইত। তখন সাহেব না সাজিলে, দেওয়ানজী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝাড়ুদার মেথর পর্য্যন্ত এমন মর্ম্মাহত হইয়া উঠিত যে, তাহার সাহেব না সাজিয়া উপায় ছিল না। অতএব বৎসরে একবার করিয়া পরিবার জন্য বিলাতী দোকানে প্রস্তুত কুড়ি-পঁচিশটা স্যুট্ তাহার wardrobe আলমারী ভরিয়া বিরাজ করিতেছিল। আনুষঙ্গিক কলার, কফ্, নেক্‌টাই, রেশমী রুমাল যে কত ছিল, তাহা গুণিবার চেষ্টাও সে কোনোদিন করে নাই। বিলাতী ড্রেসিং গাউন, এবং জাপানী কিমোনো, আন্‌কোরা নূতন অবস্থায় কাগজের বাক্সের মধ্যে গুটি-পাঁচসাত বিরাজ করিতেছে দেখা গেল। কোনো এক জমিদার-বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইয়া ভানুমতী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, যে, জমিদারের ছেলেরা ঘরের ভিতর ড্রেসিং গাউন পরে। ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বীরের জন্য একসঙ্গে এতগুলি পরিচ্ছদের অর্ডার দিয়া দেন। বলা বাহুল্য তাহার ভিতর একটিও স্বীরের অঙ্গে উঠে নাই।

এগুলি লইয়া যাইলে কোনো ক্ষতি নাই। কারণ জমিদারীর নূতন অধিকারিণীকে যদি পাওয়াও যায়, তাহা হইলেও এগুলি তাহার কোনো কাজে লাগিবে না। স্বীরেরও যে সবগুলি লাগিবে তাহা বলা যায় না, তবে লাগিলেও লাগিতে পারে।

তাহার পর তাহার বইগুলি ; এগুলি তাহার নিজের সম্পত্তি। এতকাল ধরিয়া যে সে জমিদারীর পাহারাওয়ালার কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু মাহিনা তাহার প্রাপ্য। সত্য বটে উপরি উপরি চোখ বুলাইয়া দেখা এবং নাম সহি করা ভিন্ন সে বড় বেশী-কিছু করে নাই, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের বড় বড় বিভাগের কর্ত্তারাই বা তাহার চেয়ে বেশী কি করেন ? সুতরাং এগুলি সে নিজের বলিয়া দাবী করিলে সম্ভবতঃ কেহই আপত্তি উত্থাপন করিবে না।

'তাহার পর বাহির হইল তাহার ডাইরি, কৃষ্ণাকে লেখা চিঠির গোছা, তাহার নিজের আঁকা কৃষ্ণার অসমাপ্ত রেখাচিত্রগুলি এবং কৃষ্ণার সম্পূর্ণীকৃত তৈলচিত্রটি। যাক, এগুলিতে পৃথিবীর আর কাহারও কোনো প্রয়োজন নাই। এ তাহারই, কেবলমাত্র তাহারই।

কৃষ্ণার ছবির দিকে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মনে মনে বলিল, "তুমি দূরে ছিলে, আরো দূরে চ'লে গেলে। কেবল একটা সাগর নয়, আরো দুর্লঙ্ঘ্য একটা সাগর আমাদের মাঝে এসে পড়েছে। নিতান্ত দেবতার কৃপা ছাড়া তোমায় পাবার আর কোনো উপায় নেই আমার। তোমার ছবিই আমার চিরদিনের প্রেয়সী হয়ে রইল। একমাত্র তুমি স্বয়ং পারবে ওকে সে জায়গা থেকে টলাতে।"

ভানুমতীর ঘরে সেদিন আর সে গেলই না। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া নিজের জিনিষ-পত্র গোছানো ও তাহার সব ব্যবস্থা করিতে লাগিল। দেশের বাড়ীতেও কিছু কিছু জিনিষ তাহার ছিল। একদিন সুবিধামতো গিয়া সেগুলির বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে ঠিক করিল।

C. I. D.র সেই ছেলেটি বিকালে আসিয়া নিজের অনুসন্ধানের ফলাফল জানাইবে বলিয়াছিল। সকাল হইতে তাহার জন্য সুবীরের মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কখন সে আসিবে, কি না-জানি সে বলিবে? যেমন করিয়া হোক, এ'ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গেও নহে, মর্ত্ত্যেও নহে, এমন ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলিয়া মানুষ কতদিন আর থাকিতে পারে?

ভানুমতীর কন্যাকে যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে যে কি করা হইবে, তাহাও সে ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই পায় নাই। ভানুমতী দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও তাঁহার শ্বশুরকুলের অনুমতি-সাপেক্ষ। নিজের স্বামীর নিকট হইতে দত্তক গ্রহণের কোনো অনুমতি তিনি লইয়া রাখেন নাই। শ্বশুরকুলের মধ্যে উদয় অন্ততঃ যে বাধা দিবে, অনুমতি

দিবে না, সে বিষয়ে সুবীরের কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ বিষয়-সম্পত্তি এ ক্ষেত্রে তাহারই প্রাপ্য।

কিন্তু ভানুমতীর কন্যা যে বাঁচিয়া নাই, একথা কিছুতেই, কেন জানি না, সে মনে করিতে পারিল না। সে আছে, বাঁচিয়া আছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কিছুই শক্ত হইবে না। কেবলমাত্র তাহার ঠিকানাটা জানিবার জন্য যেন সে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহা হইলেই, ছুটিয়া গিয়া ঐ দৈব-নির্ব্বাসিতাকে সে তাহার নিজস্ব স্থানে ফিরাইয়া আনে।

সকালটা এবং দুপুরটা কোনোরকম করিয়া তাহার কাটিয়া গেল। নিজের মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া আছে বলিয়া, ভানুমতীর কাছে যাইয়াও সে বেশীক্ষণ বসে নাই। যাইবার ইচ্ছাই তাহার ছিল না, কিন্তু মা ডাকিয়া পাঠানোতে একবার গিয়া তাহাকে হাজিরা দিয়া আসিতে হইল।

ভানুমতী বলিলেন, "ওরে, ভবানীর দেশে খবর দেওয়া হয়েছিল না? তার এক ভাইপো চিঠি লিখেছে। অনেক দুঃখটুঃখ ক'রে শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। কি দেওয়া যায়?"

সুবীর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যা তোমার খুসি, মা। আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে কি লাভ? পাঠাতে ব'লে দাও দুচার শ'। ভবানীর আত্মার শান্তি একান্ত দরকার। বেঁচে থাক্‌তে বেচারীর যে-পরিমাণ অশান্তি ছিল, মর্‌বার পরেও যদি তাই থেকে যায়, তাহলে খুবই শোচনীয় অবস্থা বল্‌তে হবে। তার তবু একটা উপায় আছে এখন। আমাদের যে ছাই এখন শ্রাদ্ধ কর্‌লেও কোনো উপকার হবে না।"

ভানুমতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "ছিঃ বাবা, ও কি বল্‌ছিস্? মায়ের সাম্‌নে ও কথা মুখে আনিস্ না। তুই চিরজীবি হ। শ্রাদ্ধ শত্রুর হোক। কিসের তোর দুঃখ? আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না।"

সুবীর হাসিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হায় রে স্নেহের

অহঙ্কার! কতটুকু শক্তি তাহার? অথচ কি প্রচণ্ড আগ্রহ আর বিশ্বাস তাহার!

বিকাল হইতেই সব চাকরবাকরকে সে বলিয়া রাখিল, একজন ছোক্‌রা বাবু বিশেষ প্রয়োজনে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। তাঁহাকে যেন সোজা দোতলায় তাহার ঘরে লইয়া আসা হয়।

ছেলেটি আসিতে বিশেষ দেরী করিল না। চারটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইবামাত্রই সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবীর তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। চাকরকেও বলিয়া দিল, ঘণ্টাখানেক যেন তাহাকে ডাকা না হয়।

তাহার পর যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এখন আপনার রিপোর্ট কি বলুন। কিছু খোঁজ পেলেন?"

যুবক বলিল, "খোঁজ ত প্রায় সবই পাওয়া গেছে, এখন আর গোটা তিনচার টেলিগ্রাম এধার-ওধার ঝাড়লেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়।"

সুবীর ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তাই নাকি? কতদূর আপনি জেনেছেন তাই বলুন আগে। টেলিগ্রামের ব্যবস্থা তারপর করা যাবে।"

যুবক পকেট হইতে ভবানীর চিঠির তাড়া, হিসাবের খাতা প্রভৃতি সব বাহির করিল। বলিল, "এগুলি ঘেঁটে যা বুঝলাম, সেই খ্রীষ্টান ধাত্রী মিসেস্ মিত্র, আপনার মায়ের প্রসবের কেস্ হ'য়ে যাবার পর, বেশীদিন আর কলকাতায় ছিলেন না। গিরিধিতে গিয়ে বাড়ী নিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর ঠিকানা এ খাতায় রয়েছে। মাসে তাঁকে একশ টাকা ক'রে পাঠানোর হিসাবও রয়েছে। আপনি বল্‌ছেন, ভবানী বাড়ীর ঝি ছিল। এত টাকা কাউকে না জানিয়ে সে দিত কি ক'রে?"

সুবীর বলিল, "ঝি সে নামেই, কার্য্যতঃ বাড়ীর কর্ত্রী সে-ই ছিল। এক শ ছেড়ে হাজার টাকাও সে দিতে পারত। গিরিধিতে তাঁরা এখনও আছেন ব'লে মনে হয়?"

ছেলেটি বলিল, "না। মেয়েটির বছর পনেরো-ষোলো বয়স পর্য্যন্ত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর আর ঐ ঠিকানায় টাকাকড়ি পাঠানো হয়নি। খোঁজ করতে হবে গিরিধিতে, সে মেয়ে আর সে লেডী ডাক্তার বেঁচে আছেন কি না।"

সুবীর বলিল, "তা বেশ। আপনার যদি ছুটি পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে ছুটি নিন। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

যুবক বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে। আমি যদি ছুটি নাও পাই, তাতেও দুঃখ নেই। কেস কিছুই শক্ত নয়, আপনি একলাই পারবেন। দরকার হয় ত ভালো লোকও আমি জোগাড় ক'রে দিতে পারব, আপনার সঙ্গে যাবার জন্যে।"

সুবীর বলিল, "ব্যাপারটা এখনি আমি বেশী ছড়াতে চাই না। আপনি ছুটি পান ভালোই; না-হয় আমি একলাই যাব। অবশ্য আপনার আর্থিক ক্ষতি যাতে কিছু না হয় তা আমি দেখব।"

যুবক হাসিয়া চলিয়া গেল। ভবানীর চিঠি-পত্র খাতা ইত্যাদি সুবীর নিজেরই একটা দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

কিন্তু গিরিধি যাওয়া সুবীরের অদৃষ্টে ছিল না। সেদিনই রাত্রে ভানুমতীর অবস্থা আবার একটু খারাপ হইল। ডাক্তার ডাকাডাকি, ওষুধ আনা, নার্স ডাকার হাঙ্গামা আবার পুরাদস্তর সুরু হইল। সুবীর বুঝিতে পারিল, এখন দিন-দশের মতো তাহার কোথাও যাওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নাই।

তাহার গুপ্তচরটি সৌভাগ্যক্রমে ছুটি পাইল। সুবীর বলিল, "আমার ত নড়বার উপায় নেই, কয়েক দিনের মতো। আপনি একলাই যান, তাতেই হয়ত আপনার কাজের সুবিধা হবে। যতটুকু যা জানতে পারেন, আমাকে রেজিষ্ট্রি ক'রে চিঠি লিখে জানাবেন।"

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "খরচপত্র বেশ কিছু হবে।"

সুবীর বলিল, "না হ'লেই আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ত। তার জন্যে আমি

প্রস্তুত হয়েই আছি।" সে দেরাজ খুলিয়া দুইশত টাকা বাহির করিয়া যুবকের হাতে দিল। বলিল, "এখনকার মত এই নিয়েই আরম্ভ করুন। টেলিগ্রাম করলেই আরো পাঠাব। টাকার জন্যে কিছু আটকাবে না।" যুবক নমস্কার করিয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

কাজ খানিকটা অগ্রসর হওয়ায় সুবীরের মন একটু শান্ত হইল। অনেক দিন পরে সে আবার খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, মায়ের তত্ত্বাবধান করিয়া, গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ইচ্ছা ছিল, বন্ধুবান্ধবদের একটু খোঁজ-খবর লইবে।

দুইটা দিন কোনোমতে কাটিয়া গেল। ভানুমতী খানিকটা আবার সাম্‌লাইয়া উঠিলেন। বিবাহের হাঙ্গাম চুকিয়া যাওয়ায় শোভাবতীরও কিছু অবসর হইয়াছিল। তিনি রোজই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এ-বাড়ী আসিয়া হাজির হইতেন। সমস্ত দিনটা থাকিয়া, সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেন। কাজেই ভানুমতীর খোঁজ-খবর সারাক্ষণ করার প্রয়োজনটা সুবীরের অনেকটাই কমিয়া গেল।

তিনদিন পরে গিরিধি হইতে খবর পাওয়া গেল। চিঠিখানা হাতে করিয়া সুবীর মিনিট-খানেক চুপ করিয়া রহিল। তাহার জীবনের একটা অংশের উপর এইবার যবনিকা পড়িতে চলিল।

চিঠিখানা সে টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। প্রথম দুই-চারিটা অপ্রয়োজনীয় কথা, তাহার পর আসল খবর। যুবক লিখিয়াছে,—"যথাসম্ভব খোঁজ করিয়াছি। বিশেষ কিছু কষ্ট পাইতে হয় নাই। মিসেস্ মিত্রকে এখানকার পুরাতন বাসিন্দারা অনেকেই চেনেন। তিনি বছর-আট আগে মারা গিয়াছেন। তাঁহার একটি পালিতা কন্যার কথাও সকলে জানে। তিনি কলিকাতায় স্কুল ও কলেজে শিক্ষিতা হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতার এক খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে কাজ করিতেন। সম্প্রতি গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ লইয়া রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছেন। নাম মিস্ কৃষ্ণা রায়। খুব সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি আছে। ইহার পিতামাতার কথা কেহই অবগত নহেন।

অতি শিশুকাল হইতে মিসেস্ মিত্রের গৃহেই ইহাকে প্রতিপালিত হইতে দেখা গিয়াছে।”

সুবীরের হাত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। ইহাই সে এতদিন জানিয়াও জানিতে চাহিতেছিল না, আজ আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

৩০

আজ বিপিন এবং তাহার জ্যাঠামহাশয় কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইবেন। কয়দিন আগে বাড়ীতে যেমন আনন্দের হাওয়া বহিতেছিল, আজ ঠিক তাহার বিপরীত। কর্ত্তা অবশ্য কোনোদিনই বাড়ী থাকেন না, কাজেই তাঁহার আসা-যাওয়ায় গৃহিণী ভিন্ন আর কাহারও মনে বিশেষ কোনো সুখদুঃখের উদয় হয় না। কিন্তু বিপিন চিরকাল ইহাদের সঙ্গে আছে, নিজের মা ত তাহার নাই-ই, বাপ থাকিলেও বিপিনের সঙ্গে তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। বিপিন, নবীন, গৃহিণীর নিজের সন্তানদের দলে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে নিতান্ত চেষ্টা না করিলে, তাহারা যে তাহাদের আপন ভাই নয়, তাহা তড়িৎ প্রভৃতি কেহই অনুভব করিতে পারে না। প্রতিভা, অমিয়াও তাহাদের নিজের দেবরের চেয়ে কিছুমাত্র পর জ্ঞান করে না।

সুতরাং বিপিন চলিয়া যাওয়ায় সবাই দুঃখিত। প্রথমে কর্ত্তা ঠিক করিয়াছিলেন যে নবীনকেই লইয়া যাইবেন, কারণ বিপিন রেঙ্গুনে থাকিয়াই মন্দ কাজ করিতেছিল না। কিন্তু বিপিনই বলিয়া-কহিয়া তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হঠাৎ রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইবার উৎসাহ কেন যে তাহার এত বেশী হইল, তাহা কেহই ভাবিয়া পাইল না, কেবল একজন ছাড়া। কৃষ্ণা বুঝিতেই পারিল, তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইবার জন্যই বিপিন পলায়ন করিতেছে।

ট্রেণ বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। বিপিন সকাল হইতে জিনিষ গোছানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার ঘরটি ছোট একটি গুদাম-বিশেষ।

এতদিনে, অল্পে অল্পে, কতরকমের কত জিনিষ যে ইহার ভিতর জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কি লইয়া যাইবে, কি ফেলিয়া যাইবে তাহা বাছিয়া ঠিক করাই এক ব্যাপার। তবু করিতেই যখন হইবে এবং সময়ও আর নাই, তখন সে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করিয়া মাথা নীচু করিয়া একমনে কাজই করিয়া যাইতেছিল।

তড়িৎ ক্রমাগত তাহার ঘরে ঢুকিতেছিল এবং বাহির হইতেছিল। বিপিন-দাদা যতই তাহার পিছনে লাগুক এবং সে যতই বিপিনের নামে সকলের কাছে নালিশ করুক না কেন, তাহাকে তড়িৎ নিজের সহোদর ভাইদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ভালোবাসিত না। সুতরাং আজ তাহার কেবলই গলার কাছটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিতেছে, চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িতেছে।

একবার ঘরে ঢুকিয়া তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বিপিনদা, এতগুলো বই কি করবে?"

বিপিন বলিল, "দু'চারখানা নিয়ে যাব, বাকি এইখানেই থাকবে।"

তড়িৎ বড় চোখ-দুইটা আরো খানিক বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, এতগুলো বই, এইখানে ফে'লে রেখে যাবে? কে দেখবে?"

বিপিন বলিল, "তুই দেখিস্‌।"

তড়িৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওরে বাবা, আমি কিছুর ভার নিতে পার্‌ব না, আমার যা ভোলা মন! শেষে সব পোকায় কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। তুমি বরং ওগুলো কৃষ্ণাদির কাছে দিয়ে যাও।"

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "যা যা, তোকে বই দেখতেও হবে না, পরামর্শও দিতে হবে না। ওগুলো এখানে যেমন আছে, তেমনি থাক্‌। কারুকে ওগুলোর জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।"

বিপিনের কাছে তাড়া খাইয়া তড়িৎ আসিয়া কৃষ্ণার ঘরে ঢুকিল। কৃষ্ণা তখন বসিয়া অমিয়া প্রতিভার খাতা দেখিতেছিল। সে একবার মাত্র মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "কিছু না, এমনি একটু এলাম।"

খানিক এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কৃষ্ণাদি, এক জায়গায় অনেক দিন থাক্‌বার পর চ'লে যেতে ভয়ানক বিশ্রী লাগে, না? আপনার কল্‌কাতা থেকে আস্‌তে খারাপ লাগেনি?"

কৃষ্ণা বলিল, "তা লেগেছিল বই কি একটু। কিন্তু বোর্ডিং আর বাড়ী ত এক জায়গা নয়। বাড়ীতে থাকা যদি অভ্যাস হ'ত তাহলে আরো বেশী খারাপ লাগত বোধ হয়।"

তড়িৎ খুব বিজ্ঞভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল, "ছেলেদের বোধ হয় মেয়েদের মতো মায়া হয় না, যতদিনই যেখানে থাকুক না কেন। দেখুন না, বিপিনদাটা যাবার জন্যে যেন নাচ্‌ছে। এতদিন যে আমাদের সঙ্গে রইল সে-কথা ওর মনেও হচ্ছে না।"

কৃষ্ণা চাহিয়া দেখিল, বিপিনের মায়া হোক বা না হোক, তড়িতের ত চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সান্ত্বনা দেওয়ার বিদ্যা তাহার জানা ছিল না, সুতরাং সে আবার খাতা দেখায় মন দিল। তড়িৎ মিনিট দুই-চার উস্‌খুস্‌ করিয়া অমিয়াদের ঘরে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণের সময় আসিয়া পড়িল। গাড়ী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল, জিনিষপত্রের জন্য আসিল একটা ঘোড়ার গাড়ী। কন্যা বধূ সকলে কর্ত্তাকে প্রণাম করিল, গৃহিণীর মুখখানা একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল। বিপিন গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, অমিয়া প্রতিভাকে প্রণাম করিতে গেল। অমিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রতিভা একেবারে পলায়ন করিল। তড়িৎ এবং খুকী হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

কৃষ্ণার এই বিদায়পর্ব্বে উপস্থিত থাকিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়াই সেও সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা না হইলে অত্যন্তই খারাপ দেখাইবে। বিপিন দূর হইতে শুধু একটা নমস্কার করিল, কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না। কর্ত্তা বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে

লক্ষ্যই করেন নাই, কারণ তাহাকে কোনোরকম বিদায়-সম্ভাষণ না করিয়াই তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

গাড়ীটা চোখের আড়াল হইয়া গেল। সকলে চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। খুকী এবং তড়িতের কান্না তখনও থামে নাই, প্রতিভা-অমিয়ারও চোখ সজলই ছিল। কৃষ্ণার মনটা অত্যন্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিপিনকে সে ভালোবাসিতে পারে নাই, কিন্তু এই যুবকটি যে এবাড়ীর কতখানি ছিল, তাহা সে যাইবামাত্রই বোঝা গেল; এখানকার হাস্যালাপ, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ সব-কিছুর উৎসই যেন ছিল বিপিন। নবীন সারাদিন বাহিরে ঘুরিতেই ভালোবাসিত, বাড়ীর সঙ্গে খাওয়া এবং শোওয়ার বেশী তাহার কিছু সম্পর্ক ছিল না, কাজেই সে যে বিপিনের স্থান পুর্ণ করিবে এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ীটা যেন অনেকখানি অন্ধকার এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল। সকলে কেবল নিয়মমতো আপন আপন কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সমস্ত দিন একটা দারুণ অবসাদ পাথরের মতো তাহার মনের উপর চাপিয়া থাকিত। কোনো-কিছুতে তাহার মন লাগিত না, কিছুর দিকে তাহার তাকাইতে ইচ্ছা করিত না। যন্ত্রের মতো কোনোমতে সে কাজ করিত, কিন্তু পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গিনীর মতো তাহার মনটা কেবলই এই কারাগারের লৌহ-শলাকায় মাথা কুটিয়া মরিত।

এতদিন পর্য্যন্ত নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ সে ভাল করিয়া অনুভব করে নাই। দুইটি মানুষ তাহার জীবনে প্রবেশ করিয়া তাহার এতদিনকার এই নিশ্চিন্ততার অবসান করিয়া দিয়া গেল। একজন তাহাকে ভালোবাসিল, আর একজনকে সে ভালোবাসিল। প্রেমের দূত আসিল, চলিয়াও গেল। পিছনে রাখিয়া গেল কেবল একটা নিদারুণ শূন্যতা। কৃষ্ণার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বিশ্ব যেন হঠাৎ কোনো পিশাচ-মন্ত্রে একেবারে ফাঁকা হইয়া

গিয়াছে। বিরাট অন্ধকার গহ্বরের মতো, মহাকায় দানবের করাল মুখব্যাদানের মতো তাহার মূর্ত্তি। তাহার ভিতর ধরিবার ছুঁইবার কোথাও কিছু নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া উপহাসের অট্টহাসি শোনা যায়।

তাহার আরাম-বিরামের আয়োজনের অভাব ছিল না, ইহা তাহাকে আরো যেন পীড়া দিত। কি করিবে সে অবসর লইয়া? নিজের মনের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইলেই তাহার অস্থিরতা বাড়িয়া উঠিত। ভাবিবার অবকাশ না পাইলেই সে থাকিত ভালো। কয়েদীর মতো সমস্ত দিনরাত যদি কেহ তাহাকে খাটাইয়া মারিত, তাহা হইলে সে একরকম বাঁচিয়া যাইত।

দিন-কয়েক পরে প্রতিভা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আপনার শরীর কি খারাপ যাচ্ছে?"

কৃষ্ণা তখন বইখাতা লইয়া তাহাদের পড়াইতে বসিবার জোগাড় করিতেছিল। বলিল, "না ত। কেন?"

প্রতিভা বলিল, "আপনার চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে। চোখের তলায় কালি পড়ে গিয়েছে, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। অমন যে আগুনের মতো রং আপনার, তাও একটু কালো দেখাচ্ছে।"

কৃষ্ণা কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বলিল, "বুড়ো ত হচ্ছি, কাজেই চেহারা এখন খারাপ হবে বৈ কি? অসুখ-বিসুখ আমার কিছুই করেনি।"

প্রতিভা বলিল, "আহা, কি না বয়েস আপনার? বিয়ে সুদ্ধ হয়নি, এর মধ্যে অত বুড়ী সাজতে গেলেই বুঝি লোকে তা বিশ্বাস করবে? মাও সেদিন বলেছেন, আপনার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, তা যাক। এখন এস, ঢের কাজ আছে।" গৃহিণী অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে দুইচারদিন ছুটি লইতে রাজি হইল না। শরীর মন যত ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, ততই কাজের উৎসাহ তাহার বাড়িয়া চলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথাও সে বিবেচনা করিতেছিল। রেঙ্গুন আসিয়াছিল সে বেশী অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায়। ইচ্ছা ছিল, টাকা জমাইয়া বিলাত যাইবার চেষ্টা করিবে। অল্প বেতনের কাজ করিয়া জীবন শেষ করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

এখন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র মনের মধ্যে একেবারে বদ্‌লাইয়া যাওয়ায়, রেঙ্গুনে থাকার আর প্রয়োজন ছিল না। তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, মানসিক শান্তি ত নষ্ট হইয়াছিলই; গৃহিণীকে অন্য শিক্ষয়িত্রী দেখিতে বলা উচিত কি না সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সামান্য একটা ঘটনায় সে মনস্থির করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা তড়িৎ হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "জানেন কৃষ্ণাদি, আপনার ছাত্রী আরো একজন বাড়ল?

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কে সেটি?"

তড়িৎ বলিল, "আমি।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার স্কুল কি অপরাধ করল?"

তড়িৎ উত্তর দিবার আগেই প্রতিভা ঘরে ঢুকিল। বলিল, "স্কুলের শিক্ষায় আর কুলোবে না। শ্বশুর-মশায় লিখেছেন, ঘরকন্নার কাজ সব ভালো করে শেখাতে। আমাদের শীগ্‌গিরই একটি ঠাকুর জামাই জুটবে কিনা! সামনের মাসে শ্বশুর-মশায় মাস তিন-চারের মতো এসে থাকবেন। একেবারে শুভকর্ম্ম শেষ ক'রে তবে ফিরবেন।"

তড়িৎ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। কৃষ্ণা বলিল, "ছেলেমানুষ, এরই মধ্যে ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন?"

প্রতিভা বলিল, "শাশুড়ী ঠাকরুণ যে বড় জেদ করছেন। মেয়ে দেখতে ভালো নয়, বেশী দেরি করলে বিয়ে দিতে কষ্ট পেতে হবে। তা না হ'লে কর্ত্তা এত অল্প বয়সে বিয়ের পক্ষপাতী নন।"

প্রতিভা চলিয়া যাইবার পর কৃষ্ণা বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবনাই ভাবিল। অবশেষে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল। কর্ত্তাটিকে তাহার মোটেই

ভালো লাগে নাই। তিনি আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার এখানকার বাস উঠাইলেই ভালো। রেঙ্গুন তাহার এমনিতেই যথেষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন ছাত্রীদের লইয়া বসিবার পুর্ব্বেই সে গৃহিণীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখন চাকরকে বাজারের পয়সা দিতেছিলেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি গো মা লক্ষ্মী?"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনাকে একটা কথা বলবার আছে। আমার শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছে না।"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তোমরা ত কথা শুনবে না বাছা, নিজের ইচ্ছা মতো চলো। এত খাটুনী খাটো, একটু ভালো ক'রে দুধ-ঘি না খেলে কি চলে? তা দুধ এক ফোঁটা তুমি মুখে দেবে না। বল, কাল থেকে তোমার জন্যে আধা বিশা ক'রে দুধ রাখি।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "না, তার দরকার নেই। জায়গাটাই আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি কলকাতায়ই ফিরে যাব ভাবছি। অমিয়াদের জন্যে আর একটি লোক যদি ঠিক ক'রে নেন—"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, এই কথা? আমি বলে কত আশা ক'রে ব'সে আছি যে তুমি তড়িৎকে সুদ্ধ পড়াবে। এখন লোক আবার কোথা পাই? লোক কি আর হুট করতেই পাওয়া যায়?"

কৃষ্ণা বলিল, "এক মাসের মধ্যে লোক পাওয়া কিছুই শক্ত হবে না। আপনারা যা মাইনে দেন তাতে অনেক মেয়েই আসতে রাজী হবে। আমার চেনা-শোনা যারা আছে, আমিও তাদের ব'লে দেখব।"

গৃহিণী অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাও আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইল না, কাজেই সেও চলিয়া আসিল।

গৃহিণী অবশ্য কথাটা নিজের পেটেই রাখিলেন না। কৃষ্ণার ছাত্রীরা যেরকম পরম গম্ভীর মুখে পড়িতে আসিল, তাহাতে কৃষ্ণার বুঝিতে বাকি রহিল না, যে, খবরটা ইতিমধ্যেই রটিয়া গিয়াছে। পড়ানো শেষ

হইয়া যাইতেই অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছেন কেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "শরীর ভালো থাকছে না। দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো।"

প্রতিভা বলিল, "আমরা আশা করেছিলাম লালশাড়ী সিঁদুর পরবার আগে পর্য্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "লালশাড়ী পরবই যে তার ত ঠিকানা নেই কিছু? কিন্তু তা পরতে হ'লেও প্রাণটা আগে বাঁচানো দরকার। তারই ব্যবস্থা আগে করতে হচ্ছে।"

অমিয়া বলিল, "আবার কিরকম কে আসবে জানি না। আপনি বেশ নিজের বোনের মতো হয়ে গিয়েছিলেন!"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "অত ভাবছ কেন? যে নূতন লোকটি আসবে তাকেও নিজের বোনের মতো ক'রে নিও। আমিও ত আগে অচেনাই ছিলাম।"

প্রতিভা বলিল, "আপনার মতো মেয়ে পথে-ঘাটে প'ড়ে আছে কিনা?"

কৃষ্ণা দেখিল এখন কথা বাড়িতেই থাকিবে, অতএব সে চুপ করিয়া গেল।

দিন একটা একটা করিয়া কাটিয়া চলিল। নূতন শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কৃষ্ণাও লাবণ্য বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে চিঠি লিখিল। বিদ্যুৎ কিছুদিন হইল বেশী মাহিনার চাকরী খুঁজিতেছিল। তাহার বড় ভাই মারা যাওয়ায় তাহাদের সাংসারিক অবস্থা বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ভাই-বোনদের মধ্যে এখনও অনেকগুলি বালকবালিকা আছে, তাহাদের মানুষ করার জন্য অর্থ প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যুৎ বেশী বেতনের কাজ খুঁজিতেছে। অবশ্য এতদূরে সে আসিতে রাজী হইবে কি না তাহা কৃষ্ণা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

অমিয়া, প্রতিভা, তড়িৎ প্রভৃতির দুঃখের অবধি ছিল না। তাহারা পড়াশুনা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। গৃহিণী সারাক্ষণই মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিতেন। কৃষ্ণার উপর তিনি চটিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার এমন ভালো

বাড়ী, এত ভালো খাওয়া, এখানে থাকিয়া নাকি কাহারও শরীর খারাপ হয়? মেয়ে যেন কি? কলিকাতায় সে এমন খাওয়া-দাওয়া পাইবে?

কৃষ্ণা জিনিষপত্র অল্পে অল্পে গুছাইতে সুরু করিল। এখানে তাহার হাতে টাকার অভাব ছিল না, কাজেই বন্ধুবান্ধব সকলের জন্য উপহার কিনিতে ত্রুটি করিল না। গাড়ী পাইলেই সে একবার করিয়া বাজার ঘুরিয়া আসিত।

বেলা বারোটার সময় সে একরাশ চন্দনকাঠের জিনিষ কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার গাড়ী গলির একদিক্ দিয়া প্রবেশ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই গলির অপর দিক্ দিয়া একটা ভাড়াটে গাড়ী ঢুকিল এবং দুইখানা গাড়ী প্রায় একই সঙ্গে বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণা মুখ বাহির করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, গাড়ীর আরোহীটি কে। তাহাকে চিনিবামাত্রই কিন্তু তাহার মন বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া গেল। সে সুবীর।

সুবীরও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল সম্ভবতঃ। কিন্তু দুজনে দুজনের যতই পরিচিত হোক, মৌখিক আলাপ তাহাদের নাই। সুতরাং কৃষ্ণা নামিয়া পড়িয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল। সুবীর দারোয়ানের কাছে গিয়া নিজের একখানা কার্ড দিয়া বলিল, "উপর লে যাও।"

দারোয়ান বলিল, "বাবুলোগ কোই নহি হ্যায়, বাবু—"

সুবীর কার্ডখানা চাহিয়া লইয়া তাহাতে লিখিয়া দিল, To see Miss Roy, on urgent business (জরুরী কাজে মিস্ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য)। দারোয়ানকে বলিল, কার্ডখানা যাহাকে হউক দেখাইতে, তাহা হইলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। বিপিনের সাহায্য পাইবে আশা করিয়া সে আসিয়াছিল; সে যখন নাই তখন নিজেই যেমন করিয়া হউক কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।

দারোয়ান তাহাকে একখানা চেয়ার দিয়া বসাইয়া, কার্ড লইয়া উপরে চলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া সুবীরের হাসি পাইতেছিল। আশ্চর্য্য অদৃষ্টের পরিহাস! এখানে আসিবার তাহার ঠিকই ছিল, আসা হইল বটে।

কৃষ্ণাকে লইয়া যাইবার জন্যই সে আসিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু সে নিজের জীবনের অধীশ্বরীরূপে। কৃষ্ণাকে লইতেই সে আসিল, কিন্তু সে নিজে কৃষ্ণার জীবনে আর এখন কোনো স্থান পাইবার আশা রাখে না। সে দৈবক্রমে যে কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, সেইখানেই এই জ্যোতির্ম্ময়ী তারকাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবে। এইটুকুমাত্র কৃষ্ণার জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ। দারোয়ান আসিয়া বলিল, "উপর চলিয়ে, বাবু।"

সুবীর দারোয়ানের পিছনে পিছনে উপরে আসিয়া বসিল।

এইবার নাটকের শেষ অঙ্ক। তাহার পর এই রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহার চিরদিনের বিদায়।

৩১

কৃষ্ণার চিঠির উত্তরে বিদ্যুৎ লিখিয়াছিল, সে রেঙ্গুনে আসিতে রাজী আছে কারণ অর্থের তাহার একান্ত দরকার। কৃষ্ণা যে-বাড়ীতে থাকিতে পারিয়াছে, সেখানে থাকিতে তাহার কোনোই আপত্তি হইতে পারে না। তবে সে ত কৃষ্ণার মতো নামে-মাত্র খ্রীষ্টান নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মে সে বিশ্বাস করে, এবং গির্জ্জায় যায়, বাইবেল পড়ে, বড়দিনে এবং ঈষ্টারে উৎসব করে। এ সকলে যদি গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণী কোনো আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সে এখানকার কাজে নোটিশ দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

কৃষ্ণাকে অবশ্য তাহার পালিকা-মাতা রীতিমতো খ্রীষ্টান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বছর-ষোলো বয়স হইবার পর তাহাকে আর তিনি কিছুতেই বাগ মানাইতে পারেন নাই, সে আপন ইচ্ছামতোই চলিয়াছে। অবশ্য পরিচয় দিবার সময় সে নিজেকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বলিয়াই বলিত, কারণ আর কোনো ধর্ম্মে সে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া চিনিবার কোনো উপায়ই ছিল না। গৃহিণী এজন্য তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন।

রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছাটা কৃষ্ণার মনে ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কাজেই বিদ্যুতের চিঠি পাইয়া তাহার মনের উপর হইতে একটা যেন বোঝা নামিয়া গেল। এখন গৃহিণী রাজী হইলেই হয়। তাহা হইলেই কৃষ্ণা নিশ্চিন্তমনে নিজের পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে বসিতে পারে। সুতরাং সে আর দেরী না করিয়া ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য গৃহিণীর সন্ধানে চলিল।

তিনি তখন চশমা পরিয়া উলের বুনানী লইয়া বসিয়াছিলেন। শেলাইয়ের ভিতর এই কাজটি মাত্র তাঁহার পছন্দ এবং অভ্যস্ত ছিল। কাজেই উলের মোজা, ও বেনিয়ান পরিবার মতো ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতিনী ঘরে না থাকা সত্ত্বেও তিনি মাসে অন্ততঃ দশবারো জোড়া মোজা এবং গুটিপাঁচছয় বেনিয়ান বুনিয়া ফেলিতেন। এগুলি কাজে লাগিত দেশের যত দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্বের ছেলেমেয়ের এবং এখানকার যত বন্ধুবান্ধবদের শিশুবাহিনীর।

কৃষ্ণাকে চিঠি হাতে করিয়া ঢুকিতে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি মনে ক'রে মা?

কৃষ্ণা বলিল, "আমার যে বন্ধুটির কথা আপনাকে বলেছিলাম, সে চিঠি লিখেছে। সে আস্‌তে রাজী আছে, যদি খ্রীষ্টান ব'লে আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সে আবার নূতন ক'রে বলতে হবে না কি? তোমার বেলায় যখন কোনো আপত্তি করিনি, তখন তার বেলাই বা কর্‌তে যাব কেন? আজকালকার দিনে কি আর অত গোঁড়ামী করলে চলে?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমি নামে খ্রীষ্টান হ'লেও, কাজে ত আমার কোনোই বালাই নেই। সে কিন্তু গির্জ্জায় যাবে, বাইবেল পড়বে, এ-সব আপনাদের কেমন লাগবে তা ত জানি না, তাই আগের থেকে জেনে নেওয়া ভালো।"

গৃহিণী মিনিট-খানিক ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "তা নিজের ঘরে ব'সে পড়ে তাতে আপত্তি কেন, করব? তবে আমার বৌমাদের সঙ্গে ও-সব

বিষয়ে কথাবার্ত্তা না বলে যেন, তাহলেই হ'ল। গির্জ্জায় যেতে চায় যাবে। শূয়োর-গোরু খায় না ত? শাড়ী পরে, না গাউন?"

কৃষ্ণা বলিল, "শূয়োর-গোরু কখনোই খায়নি, এ কথা বলতে পারব না। তবে আপনার বাড়ীতে নিশ্চয়ই খেতে চাইবে না। শাড়ীই পরে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, তা আসতেই লিখে দাও। এর চেয়ে ভালো আর পাচ্ছি কই? এতদূর ত আর হিন্দুর মেয়ে আসতে চাইবে না? কাজেই এই-সবই রাখতে হবে।"

গৃহিণীর কথায় কৃষ্ণার হাসি পাইলেও, সে গম্ভীরভাবেই তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। যেন হিন্দুর মেয়ে গভর্নেস হইবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় দেশে বসিয়া আছে। এবং তাহারা কৃষ্ণা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জীব হইতে সর্ব্বাংশেই অতি উৎকৃষ্ট, নিতান্ত এতদূরে তাহারা আসিবে না বলিয়াই গৃহিণী কোনোমতে কৃষ্ণাদের অনাচার সহ্য করিতেছেন।

কৃষ্ণার হাতে তখন বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। তাহার সকালের পড়ানোর পালা চুকিয়া গিয়াছিল, বিকালেরটা আরম্ভ হইতে তখনও ঢের দেরি। সুতরাং সে গাড়ী লইয়া বাজার করিতে যাত্রা করিল। এখন ইহাই ছিল তাহার একমাত্র চিত্তবিনোদনের উপায়। নিজের এবং বন্ধু-বান্ধবের জন্য দরকারী অদরকারী নানাপ্রকার জিনিষ কিনিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দরজার সামনে গাড়ীতে সুবীরকে দেখিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। আবার এখানে সে ইহাকে দেখিবার প্রত্যাশা কোনোদিনই করে নাই। কোথা হইতে সে আসিল? কেনই বা সে আসিল?

কিন্তু দরজায় দাঁড়াইয়া এ ভাবনা ভাবা চলে না। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া জুতামোজা খুলিয়া চুল খুলিতে সুরু করিল। তখনও তাহার স্নান হয় নাই।

সবেমাত্র সে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কাছ হইতে দারোয়ান ডাকিল, "দিদিমণি।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া বলিল, "কি চাও?"

দারোয়ান বলিল, "একজন বাবু এই কাগজ দিলেন।"

এখানে আসিবার পর বাবু বা বিবি, কোনো মানুষের সঙ্গেই কৃষ্ণার সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই একটু অবাক্ হইয়া সে উঠিয়া পড়িল। পরদা তুলিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "কোথায় কাগজ, দাও।"

দারোয়ান তাহার হাতে একটা কার্ড ধরিয়া দিল। কৃষ্ণা উহা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাহার শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। এ কি! হঠাৎ ভাগ্যবিধাতা তাহাকে লইয়া কোন্ খেলা খেলিতে বসিলেন? যে মানুষটি ভিতরে তাহার অন্তরতম, বাহিরের জগতে যে অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত, আজ হঠাৎ কি করিয়া সে কৃষ্ণারই দ্বারে অতিথিরূপে আসিয়া দাঁড়াইল? সে তাহার নাম জানিল কি করিয়া? কি চায় সে কৃষ্ণার কাছে?

দারোয়ান কৃষ্ণাকে এতখানি সময় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুকে কি চ'লে যেতে বলব?"

কৃষ্ণা বলিল, "না, উপরে নিয়ে এস।" দারোয়ান নীচে চলিয়া গেল। উপরে আসিতে বলিয়াই কৃষ্ণার ভাবনা হইল, সুবীরকে সে বসাইবে কোথায়? এ বাড়ীতে কর্ত্তা সচরাচর বাস না করায় পুরুষ অতিথি-অভ্যাগতকে বসাইবার বিশেষ কোনোই ব্যবস্থা নাই। বিপিন-নবীনের বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায়ই বাড়ীতে আসিত না, আসিলেও তাহাদের ঘরেই বসিত। মেয়েরা আসিলে গৃহিণীর ঘরে, না-হয় বৌদের ঘরে আড্ডা করিত।

সৌভাগ্যক্রমে বিপিনের ঘরটা খালি পড়িয়া ছিল। কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি একটা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ঐ ঘরের দরজাটা খুলে চেয়ারগুলো একটু ঝেড়ে দাও। দারোয়ান একজন বাবুকে নিয়ে আসছে, তাঁকে ঐখানে বসিও।"

বলিতে বলিতেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কৃষ্ণা উর্দ্ধশ্বাসে নিজের ঘরে পলায়ন করিল।

ভিতরে ঢুকিয়াই সে তাড়াতাড়ি চুলটা ভালো করিয়া আঁচড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিল। তাহার দুই পা তখন ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, বুকের ভিতরটা প্রচণ্ড দোলায় দুলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ সাহসিনী, সপ্রতিভ কৃষ্ণা, নিজের অবস্থায় নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। এ তাহার হইল কি? তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে আসিয়া জমা হইয়াছে, চোখ দুইটা অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত। সুবীর তাহাকে দেখিয়া মনে করিবে কি? কথা বলিতে গেলে তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইবে ত? আয়নার ভিতর নিজের ছায়াকে সে নিজেই যেন চিনিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু অত ভাবিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিয়া সে একটা শাদা রেশমের ব্লাউজ এবং জরির পাড়ের ফিকা নীল রঙের মান্দ্রাজী শাড়ী বাহির করিয়া লইল। সুবীর কেন আসিয়াছে সে জানে না। তবু তাহার সামনে সে শ্রীহীন সাজে যাইতে পারিল না। হয়ত ইহার সঙ্গে কৃষ্ণার আর ইহজগতে সাক্ষাৎ হইবে না, তবু সে কৃষ্ণার যে মূর্ত্তি স্মৃতিমন্দিরে বহন করিয়া লইয়া যাইবে, তাহা যেন মলিনা ত্রস্তা রমণীমূর্ত্তি মাত্র না হয়, উল্কার মত জ্যোতির্ম্ময়ী রূপেই সে যেন এই মানুষটির জীবনাকাশে দেখা দিয়া মিলাইয়া যায়।

সুবীর দরজার দিকে মুখ করিয়াই বসিয়াছিল। কৃষ্ণাকে চোখে দেখা যাইবার আগেই তাহার লঘু দ্রুত পদধ্বনি তাহার বক্ষের ভিতর শোণিত-স্রোতকে উদ্দাম করিয়া তুলিল। তাহার প্রিয়তমাকে আজ সে নিকটে পাইবে, কিন্তু চিরদিনের মতো তাহাকে হারাইবেও হয়ত আজই। যে আসিতেছে, সে কৃষ্ণা মাত্র, তাহারই মতো সাধারণ মানুষ, কিন্তু এক ঘণ্টা পরে এই রমণী হইবে অতুল সম্পদের অধীশ্বরী, সুবীর তাহার কাছে পথের ভিখারী মাত্র। যাক! জগতে সব মানুষের জীবন-নাট্য সেকালের উপকথার মতো হয় না, ইহা বড় কঠিন সত্য। এখানে রাজকন্যার সঙ্গে কাঠকুড়ানীর ছেলের প্রেম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে-প্রেম দুইটি জীবনকে একত্রে

গাঁথিয়া তোলে না, একটিকে চির-নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াই অদৃশ্য নাট্যকার নিজের রচনা শেষ করেন।

কৃষ্ণাকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহাকে এত সুন্দর সে আগেও যেন দেখে নাই। না, হারাইতে বসিয়াছে বলিয়াই ইহাকে আজ এত অপূর্ব্ব সুন্দর লাগিতেছে? কিন্তু কেন সে কৃষ্ণাকে পূর্ব্বে চেনে নাই? এ যে ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি বলিলেই হয়। কেবল ভানুমতী যেখানে শান্ত, এ সেখানে দীপ্ত; তাঁহার মুখ স্নেহ-করুণায় বিগলিত, ইহার মুখ বুদ্ধির প্রাখর্য্যে উজ্জ্বল।

কৃষ্ণা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। কি বলিয়া তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিবে তাহা কম হইলেও কুড়ি-পঁচিশবার সুবীর মনে মনে বলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে সব গোলমাল হইয়া গেল। কি বলিবে যে, সে কিছু ভাবিয়া পাইল না। নমস্কার করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই দুইটি মানুষের মধ্যে কৃষ্ণাই বিচলিত হইয়াছিল যথেষ্ট বেশী, তবু কথা বলিল সে-ই প্রথমে। নিজে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

সুবীর বসিল। অনেকখানি চেষ্টা করিয়া নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া বলিল, "আমার পরিচয় খানিকটা আমার কার্ড থেকেই পেয়ে থাক্‌বেন। কিন্তু আমি কি জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি, সেটা বুঝতে পারেননি।"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনাকে একবার বিপিনবাবুর সঙ্গে এবাড়ীতে দেখেছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন কি? তিনি এখন আর রেঙ্গুনে থাকেন না।"

সুবীর বলিল, "ও, তা ত জান্‌তাম না। কিছুদিন আগে তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে রেঙ্গুন ছাড়ার কথা কিছু লেখেননি। যাক; তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসিনি আমি। আপনার কাছেই আমার প্রয়োজন।"

• কৃষ্ণার মুখ হঠাৎ শ্বেত-পদ্মের মতো শুভ্র রক্তহীন হইয়া উঠিল। তাহারই কাছে প্রয়োজন? কি প্রয়োজন? নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সে সুবীরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কৃষ্ণা যে অত্যন্ত বেশী বিচলিত হইয়াছে তাহা সুবীর বুঝিতে পারিল। কারণটা ঠিক বুঝিল না। তবু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "আপনি ভয় পাবেন না। কোনো মন্দ খবর নিয়ে আমি আসিনি। সব কথা আপনাকে খুলে বলছি। ব্যাপারটা এমনি উপন্যাসের মতো যে আপনি প্রথমে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। না করবার যদিও কারণ নেই কিছু। সব ব্যাপারটার ভালো প্রমাণ না পেলে, আমি কখনোই আপনার কাছে আসতাম না।"

কৃষ্ণা বলিল, "আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে?"

সুবীর বলিল, "আপনার জীবন নিয়েই একটা মস্ত বড় জটিলতা গ'ড়ে উঠেছে। কেন জানি না, আমার উপরেই এই জট ছাড়াবার ভার পড়েছে।"

কৃষ্ণা আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার জীবন নিয়ে?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনার তাতে কোন হাত নেই। ব্যাপারটার সূচনা হয়েছিল আপনার জন্মের আগে।"

গভীর অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণা এতক্ষণে যেন একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমার জন্মের আগে? তাহলে কোথায় আমার জন্ম হয়েছিল, কার সন্তান আমি, তা কি কিছু জানা গেছে? আমি নিজে ত কিছু জানি না।"

সুবীর বলিল, "শুধু আপনি কেন, কেউই এতদিন জানত না। যে-দুটি মানুষ এ বিষয়ে সব জানতেন, দুজনেই পরলোকে। যাক, দৈবগতিকে সবই জানা গিয়েছে। আপনাকে আর বেশীক্ষণ সংশয়ের মধ্যে রাখতে চাই না। আপনার মা এখনও জীবিত আছেন। আপনাকে তাঁর কোলে ফিরিয়ে দেবার ভার নিয়ে আমি এসেছি। যত শীঘ্র সম্ভব, আপনাকে এখান থেকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে।"

কৃষ্ণার চোখের সম্মুখে ঘরখানা তার আসবাবপত্র লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, পাছে চেয়ার হইতে পড়িয়া যায় সেই ভয়ে সে চেয়ারের হাতল শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার মাথাটা সামনের দিকে অবনত হইয়া পড়িল।

সুবীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? কাউকে ডাকব কি?" ঘরে একটা ইলেকট্রিক পাখা ছিল, সে তাড়াতাড়ি সেটা চালাইয়া দিল।

কৃষ্ণা অতি কষ্টে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, "না, কিছু দরকার নেই। আমার মা বেঁচে আছেন বললেন, তিনি কে? তাঁর মন কি পাথর দিয়ে গড়া? বেঁচে থাকতে আমাকে অনাথের মতো পরের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি?"

সুবীর বিষণ্ন হাসি হাসিয়া বলিল, "পাথর দিয়ে গড়া তাঁর মন নয়, আমি তাঁকে জানি। মা মাত্রেই স্নেহময়ী, কিন্তু এতখানি ভালোবাসা আর মমতা আর-কোনো মায়ের আছে ব'লে মনে হয় না। সন্তানের মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন।"

কৃষ্ণার মুখে একটুখানি শ্লেষের ভাব দেখা দিল। বলিল, "হ্যাঁ, সেই জন্যেই পরের অন্ন খেয়ে, পরের ঘরে আমি মানুষ হয়েছি।"

সুবীর বলিল, "তাঁর প্রতি অবিচার করবেন না। আপনি তাঁর সন্তান তা তিনি মাত্র কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছেন। যে হতভাগাকে তিনি নিজের ছেলে ব'লে মনে করেছেন এতদিন, সেই একমাত্র সাক্ষ্য দিতে পারে যে তিনি কেমন মা।"

কৃষ্ণা এই বিস্ময়ের সাগরে কোথাও কূল দেখিতে পাইতেছিল না। সে বলিল, "আপনি এ-সব কি বলছেন? আমি ভালো ক'রে বুঝতে পারছি না।"

সুবীর বলিল, "খুলে না বললে বুঝবেনই বা কি ক'রে? সমস্ত ব্যাপারটা এত জটিল, যে, আমিই প্রথমে বুঝতে পারিনি। আপনি কলকাতাতেই

এতদিন ছিলেন যখন, তখন ভবানীপুরের ল্যান্সডাউন রোডের কাছাকাছি একটা বড় বাগানওয়ালা বাড়ী আপনার চোখে প'ড়ে থাকবে। তার পাশের একটা দিক্ বড় রাস্তার উপরেই। হাতার মধ্যে ছোট পুকুর আছে একটা।"

কৃষ্ণা বলিল, "দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে। কোন্ এক জমিদারের বাড়ী না?"

স্ববীর বলিল, "হ্যাঁ। এতদিন সেই জমিদারিটা আমার ব'লেই জানতাম। আগেকার জমিদারের স্ত্রীকে নিজের মা ব'লে জান্তাম। কিন্তু ঘটনাচক্রে কয়েকদিন হ'ল অনেকগুলি গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সব শেষ অবধি অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে, যদিও জমিদার-গৃহিণীর সন্তান হয়েছিল, সে সন্তান আমি নয়। তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল, ধাত্রী এবং বাড়ীর একজন পুরনো ঝি ষড়যন্ত্র ক'রে মেয়েটিকে সরিয়ে ফে'লে একটি নবজাত ছেলেকে সেখানে রেখে দেয়। সেই ছেলে আমি, সেই মেয়ে আপনি।"

কৃষ্ণা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করিল, "এতবড় একটা কাণ্ড বাড়ীর লোকে জান্‌তে পার্‌ল না? মা তাতে রাজী হলেন? তাঁর স্বামী কিছু জান্‌লেন না? কেন এমন ভয়ানক কাজ ঝি বা ধাত্রী করতে গেল?"

স্ববীর বলিল, "একে একে বল্‌ছি। যে ঘরে সন্তান হয়, তার ভিতরে ধাত্রী, ঐ ঝি, এবং ধাত্রীর এক ঝি ছাড়া কেউ ছিল না। মা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, তিনি কিছুই জান্‌তে পারেননি। মাঝরাত্রে সন্তান হওয়ায় বাড়ীর অন্য লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেয়েকে সরিয়ে, ছেলে এনে রেখে, তাদের জাগানো হয়। ধাত্রীর বাড়ী খুবই কাছে ছিল ব'লে সহজেই তারা এই কাণ্ডটা করতে পেরেছিল। আপনার মা ভানুমতী দেবী গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হন। পুত্রসন্তান না হ'লে বংশ থেকে অনেক লাখ টাকা আর-একজন লোকের হাতে চ'লে যেত। সে আত্মীয় হলেও অতিবড় শত্রু। তার হাত থেকে টাকাটা রক্ষা করবার জন্যে খানিক, এবং তার প্রতি অত্যন্ত জাতক্রোধ থাকায় ঝি ভবানী এই কাজ ক'রে থাকবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "ঝি হয়ে সে এতবড় কাজ করতে সাহস পেল?"

সুবীর বলিল, "নামে ঝি হলেও কার্য্যতঃ সে-ই বাড়ীর কর্ত্রী ছিল। ভানুমতী দেবীকে সেই মানুষ করেছিল, তাঁর স্বার্থসম্বন্ধে সে খুবই সজাগ ছিল। আপনাকে যিনি মানুষ করেছিলেন, সেই মিসেস্ মিত্রই যে ধাত্রীর কাজ করেছিলেন তা বুঝতেই পেরেছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, তা ত বুঝতেই পারছি। কি ক'রে এ-সব কথা প্রকাশ হ'ল?"

সুবীর বলিল, "ঝি ভবানী মরবার সময় মাকে সব কথা খুলে ব'লে যায়। তিনি আমায় বলেন। তারপর খোঁজ ক'রে বাকীটুকু বার করতে হয়েছে।"

কৃষ্ণা চুপ করিয়া রহিল। এতক্ষণ যেন সে গল্প শুনিতেছিল। ব্যাপারটা তাহার নিজের জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিবে তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে তাহা সে এখন অনুভব করিতে আরম্ভ করিল।

এতদিনের জীবন তাহার আজ শেষ হইয়া গেল। জীবননাট্যের দুই-তিনটা অঙ্কের পর যবনিকা পড়িল। আবার যখন তাহা উঠিবে, তখন অন্য দৃশ্য। কৃষ্ণা রায়, খ্রীষ্টান ধাত্রীর কুড়ানো পালিতা কন্যা অন্তর্হিতা, তাহার স্থলে অতুল বিভবের অধীশ্বরী, পরাক্রান্ত হিন্দুজমিদারের একমাত্র কন্যা। কিন্তু এই নূতন আবেষ্টনে তাহাকে মানাইবে কি? সে কি পদে পদে আঘাত পাইবে না, আঘাত দিবে না?

কৃষ্ণা একবার সুবীরের দিকে চাহিয়া দেখিল। এই মানুষটি না-জানি মনে মনে তাহাকে কি ভীষণ অভিশাপ দিতেছে। এ আজ পথের ভিখারী হইল কৃষ্ণারই জন্য। কৃষ্ণা যদি বাঁচিয়া না থাকিত, তাহা হইলে সুবীরকে ত নিজের আজন্মের সুখসম্পদের নীড় ছাড়িয়া বাহির হইতে হইত না? এ আঘাত কৃষ্ণার অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু ইহার ফল সমানই মারাত্মক।

কার্ডে সুবীরের নাম দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর যে আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ত এই সম্পদ্ পাইবার আশায় নয়? যে ঐশ্বর্য্য রমণীর হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কামনার ধন, তাহা কি কৃষ্ণা আজ চিরদিনের মতো হারাইল

না? সুবীর তাহাকে আর ভুলিবে না, ইহা সত্য। নিজের অদৃষ্টাকাশে করাল ধূমকেতুর মতোই সে কৃষ্ণাকে মনে রাখিবে, সর্ব্বস্বাপহারিণী পাপিষ্ঠা বলিয়াই স্মৃতিপটে বিদ্বেষের রঙে তাহাকে আঁকিয়া রাখিবে। কিন্তু কৃষ্ণার অপরাধ কোথায়? নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে সে খেলার পুতুলমাত্র।

সুবীরের দিকে ভালো করিয়া চাহিতেও তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। না-জানি কি সে তাহার দৃষ্টির ভিতর দেখিবে! কৃষ্ণা আজ মা ফিরিয়া পাইল; পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আজ তাহার কাছে উন্মুক্ত হইল। সুবীর হইল আজ মাতৃহীন বংশপরিচয়হীন পথের ভিখারী।

সুবীর বলিল, "এখন তবে আমি আসি। এঁদের ব'লে, আপনি যাওয়ার ঠিক করুন। কাল সকালেই আমি আসব। আপনার কাছে খবর পেলেই আমি জাহাজে 'বার্থ' রেজিষ্টার করতে যাব। মায়ের শরীর বড় খারাপ; উদ্বেগ জিনিযটা তাঁর বড় ক্ষতি করে। আপনি শীগগির গিয়ে পড়তে পারলে ভালো।"

সুবীর উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণাকে একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে তখনও হতবুদ্ধির মতো বসিয়া, একটা প্রতিনমস্কার করিতেও তাহার হাত উঠিল না।

সুবীরের পায়ের শব্দ যখন মিলাইয়া গেল, তখন সে উঠিয়া টলিতে টলিতে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহার যেন ভাবিবারও সাধ্য ছিল না, বিছানার উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

৩২

সুবীর এবারেও সেই পাঞ্জাবী হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণার কাছে বিদায় লইয়া সে সোজা সেইখানেই ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণাকে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিয়া তাহার মন হইতে যেন একটা পাষাণভার নামিয়া গেল। যাক, যতই কঠোর হোক, নিজের কর্ত্তব্য সে করিতে ত্রুটি

করে নাই। এখন কলিকাতা পর্য্যন্ত ভানুমতীর মেয়েকে লইয়া গিয়া পৌছাইয়া দিতে পারিলেই তাহার ছুটি। তাহার পর নিজের পথ দেখা ভিন্ন তাহার আর অন্য কাজ থাকিবে না।

কৃষ্ণার মুখ তাহার মনের মধ্যে বড়ই বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব সুন্দর! বুদ্ধির প্রখরতায় কেমন দীপ্ত। ইহাকে যে বিধাতা রাণী হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিলে সে-বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। তাহাকে নিজের হাতে রাণীর কিরীট পরাইবে বলিয়া সুবীর সাধ করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য তাহার হাত হইতে সে ভার কাড়িয়া লইল। যাক, আসিয়া যায় না, কৃষ্ণার অদৃষ্টে সুখ ছিল্ সে তাহা পাইল। সুবীরের কোনো স্থান যদি নাই-ই থাকে এই সুন্দরীর জীবননাট্যের ভিতর, তাহাতে দুঃখ করিবার অধিকার তাহার কোথায়? কিন্তু বাহিরের ধনসম্পদ্ আজ তাহাকে যেমন করিয়া ত্যাগ করিল, ভিতরেও যে তেমনি একটা রিক্ততার সম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা সুবীর না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পর কৃষ্ণাকে আর নিজের প্রিয়তমা বলিয়া ভাবিবার অধিকারও কি তাহার থাকিবে? সে অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত অন্য কোনো ভাগ্যবান্ পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবে। তখন তাহার চিন্তা করাও হইবে পাপ! কিন্তু হায়, যুক্তি যাহা বোঝে, হৃদয় তাহা বুঝিতে চায় কই? হউক সে পথের ভিক্ষুক, হউক কৃষ্ণা অপরের স্ত্রী, সুবীরের সাধ্য নাই তাহার মুখ নিজের অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে। যে নিভৃত লোকে সে কৃষ্ণাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত সে সেখানেই বিরাজ করিবে।

বিকাল বেলাটা যে কেমন করিয়া কাটাইবে তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। অথচ এই জনাকীর্ণ হোটেলের ঘরে বসিয়া থাকাও একান্ত কষ্টকর। অগত্যা সে চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ফুটপাথে নামিয়া একবার রিক্শ চড়িবে, না, হাঁটিয়া যাইবে, তাহা মনে মনে স্থির করিল। তাহার পর সোজা চলিতে আরম্ভ করিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে যে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল তাহার ঠিকানা নাই। সমস্ত পথ সে কি যে দেখিল তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারিত না। যখন রাস্তায় রাস্তায় দুধারের দোকানে বাতি জ্বলিয়া উঠিল, তখন একখানা গাড়ী ডাকিয়া সে তাহার সাহায্যে হোটেলে ফিরিয়া আসিল। পরদিন ভারতবর্ষের ডাক যাইবার দিন। ভানুমতীকে একটা চিঠি লিখিবে কিনা সুবীর ভাবিয়া ঠিক করিতে বসিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কাগজ কলম রাখিয়া দিল। পৌছিয়া টেলিগ্রাম ত সে করিয়াছে, কাজেই ভানুমতী বেশী উদ্বিগ্ন হইবেন না। একেবারে কৃষ্ণাকে লইয়া উপস্থিত হইলেই হইবে। খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে শুইয়া পড়িল।

রাত্রে ঘুম তাহার অনেকক্ষণ আসিলই না। চিন্তার স্রোত তাহাকে কতদিকে যে ভাসাইয়া লইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। কৃষ্ণাকে রাখিয়া আসিয়া এই ব্রহ্মদেশে বসবাস করিবার খেয়ালটাও একবার তাহার মনে উঁকি দিয়া গেল। এখানে অন্ততঃ তাহার পরিচিত কেহই নাই। তাহার উচ্চ দশা হইতে পতনে শ্লেষের হাসি কেহই হাসিবে না। কিন্তু ভানুমতী বাঁচিয়া থাকিতে তাহা কি সম্ভব হইবে?

আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন একসময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিতে তাহার বেশ বেলাই হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। কৃষ্ণা হয়ত তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

আজ তাহাকে দেখিয়া দারোয়ান তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। নীচে বসাইবার প্রস্তাব না করিয়া বলিল, "চলিয়ে বাবু, উপরমে।"

সুবীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের সেই পরিত্যক্ত ঘরে আসিয়া বসিল। ঘরখানার চেহারা একটু ফিরিয়াছে, দেখা গেল। ঝাঁট পড়িয়াছে, জানলাটা খোলা, তাহাতে একটা বিলাতী ছিটের পরদা, চেয়ার-টেবিলগুলিও ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা। তাহার এবং কৃষ্ণার ইতিহাস যে রাড়ীময় প্রচার

হইয়াছে, অন্ততঃ আংশিকতঃ, তাহা বাড়ীর লোকের ব্যবহারেই বোঝা গেল। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বেশ কৌতূহল-সহকারেই তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিল এবং সুবীর তাহাদের দিকে চাহিবামাত্রই তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েও তাহাকে একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া গেল।

মিনিট-পাঁচ বসিবার পর কৃষ্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল। একরাত্রেই তাহার চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। মুখ ফ্যাকাশে, চোখ-দুইটি অস্বাভাবিক দীপ্ত দেখাইতেছে, চোখের নীচে একটু যেন কালি পড়িয়া গিয়াছে। আজ আর সে যত্ন করিয়া সাজিয়া আসে নাই। তাহার গায়ে ভয়েলের একটি সাদা ব্লাউস এবং কালো পাড়ের ফরাসডাঙ্গার শাড়ী, পায়ে সাধারণ চটিজুতা। চুলের রাশ হাতখোঁপা করিয়া বাঁধা। তবু সুবীরের মনে হইল, ইহাকে ভিখারিণীর বেশে দেখিলেও মানুষ বুঝিবে, এ রাণী হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কৃষ্ণা ঢুকিয়া সুবীরকে একটা নমস্কার করিয়া বসিল। প্রতি-নমস্কার করিয়া সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "যাওয়ার বিষয়ে কি রকম স্থির করলেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "এদের প্রায় সব কথাই জানিয়েছি। না বললেও চলত, তবে তাতে এত শীগগির যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম না। আমি যদিও তাঁদের এই মাসের গোড়াতেই নোটিশ দিয়েছি, তবু মাস শেষ হতে এখনও দিন-পনেরো বাকী। আমার কাজে যিনি আসবেন, তাঁকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাব, এইরকম একটা কথা ছিল। তবে সব কথা শোনার পর এঁরা আপত্তি করছেন না। যত শীগগির জাহাজে 'বার্থ' পান, আমি যেতে পারি।"

ইহার পর সুবীরের উঠিয়া পড়িয়া জাহাজ-অফিসের দিকে যাত্রা করা উচিত ছিল। কিন্তু এত চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িতে সে কিছুতেই যেন পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে যাওয়া তাহলে আপনি আগেই ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন নাকি?"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, শরীর ভালো থাকছিল না ব'লে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ঠিক করেছিলাম।"

সুবীর বসিয়া ভাবিতে লাগিল, আর কি বলা যায়। সাধারণভাবে ইহার সঙ্গে আলাপ হইলে বলিবার কথার অন্ত থাকিত না। কিন্তু তাহাদের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কথা বলিতে দুইজনেরই সঙ্কোচ, অথচ মনে মনে দুইজনেরই পরস্পরের কাছে থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চোখ দিয়া ত প্রথমেই মনের ভিতরটা দেখিতে পাওয়া যায় না? সুতরাং সুবীর কেবলই ভাবিতে লাগিল, বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে হয়ত বা কৃষ্ণা বিরক্ত হইবে। কৃষ্ণা ভাবিতে লাগিল, তাহার আর বলিবার আছে কি? সুবীরের সর্ব্বনাশ করিয়া এখন আর কোন্ লজ্জায় সে তাহার সহিত ভদ্রতার ঘটা দেখাইবে? যদি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার কৃষ্ণার সাধ্য থাকিত! যদিও সুবীরের সাংসারিক রিক্ততার মূলে সে, কিন্তু সুবীরও কি তাহাকে ইহার চেয়ে অধিকতর অসহনীয় রিক্ততার মধ্যে ফেলে নাই? এতদিন তাহার ধনসম্পদ্ ছিল না, কিন্তু আনন্দের অভাব ছিল না। আজ পার্থিব ধনে সে ধনী, কিন্তু আনন্দের সম্পদ্ কোথায় হারাইয়া গেল?

অনেক ভাবিয়া সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "ফার্ষ্ট ক্লাসে 'বার্থ' ঠিক করব ত? তাহ'লে পরের মেলেই যাওয়া যেতে পারে।"

কৃষ্ণা বলিল, "না, না, অত সাহেব-মেমের সঙ্গে আমার সুবিধে হবে না। আমি সেকেণ্ড ক্লাশেই বেশ যেতে পারব। না-হয় দুদিন দেরি হবে।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা, তাহ'লে সে চেষ্টাই করি।" এবার উঠিয়া পড়া ছাড়া আর উপায় নাই, তাহা সে বুঝিতেই পারিল। কিন্তু গৃহিণীর কল্যাণে তাহার আরো আধঘণ্টা-খানেক থাকিবার সুযোগ মিলিয়া গেল। তড়িৎ বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "কৃষ্ণাদি, শুনে যান।"

কৃষ্ণা বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "মা বললেন, যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে চা খেয়ে যেতে।"

সুবীর কথাটা বেশ শুনিতেই পাইল। কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এত সকালে আপনার চা খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই ?"

সুবীর অন্য স্থানে অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিত! এখানে কিন্তু সে নিতান্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মতো স্বীকার করিয়া লইল যে, তাহার চা খাওয়া হয় নাই বটে।

কৃষ্ণা বলিল, "এইখানেই খেয়ে যান।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা।"

গৃহিণীর চা খাওয়ানোটা অন্য মানুষের চা খাওয়ানো অপেক্ষা কিছু ভিন্নরকমের ব্যাপার ছিল। দেখিতে দেখিতে লুচি, তরকারি, মিষ্টান্ন, হরেক-রকমের আসিয়া উপস্থিত হইল। অমিয়া-প্রতিভারা কৃষ্ণার কাছে চা দিবার হাল-ফ্যাশানটা শিখিয়া লইয়াছিল, কাজেই পেয়ালায় চা বানাইয়া আর চাকরে লইয়া আসিল না। দামী টী-সেটএর অভাব ছিল না। জয়পুরী পিতলের ট্রেতে করিয়া, চা, দুধ, চিনি, চায়ের পেয়ালা সব আসিল। সুবীর ব্যাপার দেখিয়া বলিল, "এর নাম চা খাওয়া নাকি ?"

কৃষ্ণার মুখে এতক্ষণ পরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। সে বলিল, "এ বাড়ীতে এরই নাম চা খাওয়া। বাড়ীর গিন্নী যিনি, তিনি কম খাওয়া জিনিষটার উপর হাড়ে চটা। ভুলিয়ে ফুসলিয়ে কাউকে বেশী খাইয়ে দিতে পারলে, তিনি সবচেয়ে খুসী হন।"

সুবীর বলিল, "বাঙ্গালীর মেয়ের স্বভাব দেখছি সব জায়গায়ই এক রকম। আপনার একটি মাসীমাকে দেখবেন কলকাতায়, অবিকল এই রকম। মাও অনেকটা এই রকমই, তব অসুস্থ ব'লে এ নিয়ে বেশী জেদাজিদি করতে পারেন না।"

কৃষ্ণা নিজের মা-মাসীর কাহিনী মন দিয়াই শুনিতেছিল। যাহাদের মানুষ জন্মক্ষণ হইতেই চেনে, সে তাহাদের চিনিতেছে পূর্ণ যৌবনে। অদৃষ্টের পরিহাস।

চাকর জিজ্ঞাসা করিল, "মা জিজ্ঞেস করেছেন, ফল কিছু পাঠিয়ে দেবেন ?"

সুবীর আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল, "এর উপর আবার ফল ? তা হ'লেই হয়েছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, ফল না-হয় থাক, কিন্তু আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না ?"

সুবীর অগত্যা খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল কৃষ্ণাকেও খাইতে বলিতে, কিন্তু সে কি মনে করিবে ভাবিয়া তাহা আর বলিল না। চা ঢালিবার সময় কৃষ্ণার সুন্দর হাতের ভঙ্গীর দিকে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহাকে যে জীবনের লক্ষ্মী, গৃহের দীপ্তি রূপে পাইবে, কে না-জানি সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ। কিন্তু সুবীর যেমন করিয়া ভালোবাসিতে পারিতেছে, তাহা আর কেহ কি পারিবে ?

খাওয়া শেষ হইলে সুবীর উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি একবার ষ্টীমারের বার্থের খোঁজ ক'রে আসি। পেলেই আপনাকে জানাব।"

কৃষ্ণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া গেল। এইটুকুই সুবীরের কাছে এখন অমূল্য সম্পদ্। সে যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছে, এইটুকুই যে তাহার কতখানি! চিরদিন এই স্মৃতির টুক্‌রা কয়টিই তাহার থাকিবে ; ইহার বেশী পাইবার উপায় ভাগ্য তাহার রাখে নাই।

জাহাজের খোঁজ করিয়া জানিল, সৌভাগ্যক্রমে গোটা-দুইতিন 'বার্থ' এখনও খালি আছে। সে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া ফিরিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, কৃষ্ণাকে গিয়া খবরটা দিয়া আসে, কিন্তু কৃষ্ণা তাহা হইলে তাহাকে ভাবিবে কি ? একমাত্র ভালোবাসাই এতখানি অভদ্রতা করিবার অধিকার দিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার কাছে তাহার কি দাবী ? কিছুই না। একটুখানি কৃতজ্ঞতার বালাই থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার জোরে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করা চলে না। অগত্যা মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই চাপিয়া সে হোটেলে ফিরিয়া গেল।

বিকালবেলা কৃষ্ণার কাছে যাইবার জন্য সে বাহির হইল। বাড়ীর সামনে আসিয়া সুবীর ইতস্তত: করিতে লাগিল। দিনে দুবার করিয়া আসিয়া জুটিলে কৃষ্ণা তাহাকে মনে করিবে কি? বাড়ীর লোকেই বা কি ভাবিবে? একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেই চলে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় দারোয়ান তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "চলিয়ে বাবু উপর।"

এমন লোভনীয় আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারে, এতটা মনের জোর সুবীরের ছিল না। সে দারোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিয়া জুটিল। খানিক পরে কৃষ্ণাও আসিয়া ঘরে ঢুকিল। চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বার্থ পেলেন?"

সুবীর বলিল, "পাওয়া গেছে বেশ সুবিধা মতো। আপনার কেবিনে আর একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার, তাও ইউরোপীয়ান। কাজেই নোংরামী বা বোকামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে না। বৃহস্পতিবার দশটার মধ্যেই তৈরী থাকবেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা। টিকিট কিনে ফেলেছেন নাকি?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, কিনেই রাখলাম একেবারে। শুধু শুধু আর দেরি ক'রে লাভ কি? এত তাড়াতাড়ি যেতে আপনার কি কিছু অসুবিধা হবে?"

কৃষ্ণা বলিল, "কিছুমাত্র না। আমি একলা মানুষ, জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে বড়জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।"

এবার আর বেশীক্ষণ বসিয়া গল্প করার কোনই উপলক্ষ্য জুটিল না। সুবীর উঠিয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ণার মনের ভিতরটা এই দুদিন কেমন যেন অদ্ভুত হইয়া ছিল। আনন্দ করিবার কারণ যথেষ্টই আছে, তবু আনন্দ তাহার মোটেই হয় না। সম্পূর্ণ অচেনা স্থানে, অজানা আত্মীয়বর্গের মধ্যে সে কেমন করিয়া দিন কাটাইবে? তাহার চালচলন, শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ অহিন্দু, এসকল কি তাহাদের পীড়িত

করিবে না? কৃষ্ণাকে সন্তান-স্নেহে বক্ষে টানিয়া লইতে তাহার মাতাই কি পারিবেন? হিন্দু বিধবার কাছে আচারই প্রায় যথাসর্ব্বস্ব। এই বিদেশী ছাঁচে ঢালা, খ্রীষ্টীয় পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিতা কন্যা কি তাঁহার মনকে বিমুখ করিয়া দিবে না?

সকলের চেয়ে বেশী করিয়া তাহার মনে বাজিত, স্ববীরের আকস্মিক সর্ব্বনাশের কথা। তাহার না রহিল ধনজন, না রহিল বংশপরিচয়, না রহিল আপনার বলিতে একটা মানুষ। কৃষ্ণা যাহাকে সুখী করিবার জন্য সব দিতে পারিত, তাহাকেই একরকম মৃত্যুবাণ হানিয়া বসিল। স্ববীরের মন এককালে তাহার জন্য খুবই ব্যাকুল ছিল, তাহা জানিতে কৃষ্ণার বাকী নাই। সেই অচেনা অজানার ভালোবাসাই, তাহার নিজের হৃদয়কেও আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু এতখানি অমঙ্গল যাহার জন্য কোনো মানুষকে সহ্য করিতে হয়, তাহার প্রতি আর কি মমতা থাকা সম্ভব? কৃষ্ণার ইচ্ছা করিত, স্ববীরকে সব কথা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু রমণীর সে অধিকার কোথায়?

নিজের বিচলিত মনকে একটুখানি ভুলাইবার আশায় সে এখন হইতে জিনিষ-গোছানোর কাজে লাগিয়া গেল। অমিয়া, প্রতিভা, তড়িৎ সকলেই এক-একবার আসিয়া দেখে, আবার ম্লানমুখে চলিয়া যায়। তড়িৎ একবার ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কৃষ্ণাদি, আমাদের ছেড়ে যেতে আপনার একটুও কষ্ট হচ্ছে না?"

কৃষ্ণা কিছু উত্তর দিবার আগে নিজেই বলিল, "কেনই বা হবে? নিজের মায়ের কাছে যাচ্ছেন, তাঁর চেয়ে ত আর আমরা আপন নয়?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "কষ্ট হচ্ছে বই কি, তড়িৎ। মা আপন বটে, কিন্তু সে মাকে ত আমি আজ পর্য্যন্ত চোখেই দেখিনি। দেখবার পর, জানবার পর নিশ্চয়ই তিনি আপন হবেন।"

মাঝের একটা দিন চট করিয়া কাটিয়া গেল। বৃহস্পতিবার সকালে জিনিষপত্র গুছাইয়া বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় লইয়া, সে নিজের সম্পূর্ণ অজানা অকল্পনীয় ভবিষ্যতের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

সুবীর জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বেই ভানুমতীর নামে টেলিগ্রাম করিয়া দিল। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাম এক দিনেই পৌছিবার কথা, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিতে বিশেষ দেখা যায় না। কাজেই শুক্রবার সকালে ভানুমতী যখন স্নান করিয়া পূজার ঘরে ঢুকিতেছেন, তখন দারোয়ান আসিয়া, অবনত হইয়া নমস্কার করিয়া তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল।

স্বামীর কাছে তিনি ইংরেজী চলনসই রকম শিখিয়াছিলেন। তবে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে তাহা তাঁহার মন হইতে একরকম মুছিয়াই গিয়াছিল। তবু টেলিগ্রাম ইত্যাদি পড়িয়া এখনও মোটের উপর বুঝিতে পারিতেন। টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িয়া, তাঁহার বিষণ্ণ মুখে একটু যেন আনন্দের আভাস দেখা দিল। আজ কতদিন হইল তাঁহার ঘর অন্ধকার হইয়া আছে। সুবীর না থাকিলে ঘর-সংসার সবই তাঁহার কাছে শ্মশানের মতো বোধ হয়। সুতরাং আবার সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে দেখিবার আশায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সুবীর আসিতেছে বটে, কিন্তু সে কি আর তাঁহার সেই ছেলে আছে! হৃদয়হীন নিয়তি ত তাহাকে চিরদিনের মতো মায়ের কোল হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। ভানুমতীর কোলের উপর সমাজ, সংসার, প্রভৃতি সকলেই যাহার অলঙ্ঘনীয় অধিকার স্বীকার করিবে, তাহাকে আজ সুবীরই লইয়া আসিতেছে।

জন্মমাত্র মাতৃক্রোড়বিচ্যুতা কৃষ্ণাকে স্মরণ করিয়াও ভানুমতীর হৃদয় মমতায় বিগলিত হইল। সুবীরকে তিনি অন্তরের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেও নিজের গর্ভজাতা কন্যার জন্য কিছুই কি রাখেন নাই? সে ত কম দুঃখিনী নয়! ভিখারীর সন্তানও যাহা জন্মাধিকারে পায়, কৃষ্ণা তাহা

হইতেও বঞ্চিতা। ভানুমতীর যদি দুইটি সন্তান থাকিত, দুইটিকেই কি তিনি সমানভাবে ভালোবাসিতে পারিতেন না? সুবীর তাঁহার যে স্নেহের ধন ছিল তেমনই থাকিবে, কিন্তু কৃষ্ণাকেও বক্ষে টানিয়া লইতে তাঁহার যেন কণামাত্রও না বাধে। এই মেয়েকে বধূরূপে বরণ করিয়া লইতে তিনি ত প্রস্তুত ছিলেন, না-হয় কন্যারূপেই সে তাঁহার ঘর আলো করিবে।

কিন্তু সুবীরের দুঃখের যে অন্ত রহিল না। কৃষ্ণা কি এখন আর ধনহীন বংশপরিচয়হীন যুবককে বিবাহ করিতে চাহিবে? বিধাতা এমন সুন্দর জীবনটাকে এমন সকল দিক্ দিয়াই কি নষ্ট করিয়া দিবেন? ভানুমতীর চোখ দিয়া টশ্ টশ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সুবীর রেঙ্গুন যাত্রা করিবার সময় ভানুমতীর কাছে সেই পুরাতন নার্স্‌টিকে রাখিয়াই গিয়াছিল, যদি কোনো প্রয়োজন হয়। সে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি মা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? কিছু মন্দ খবর এসেছে নাকি?"

ভানুমতী চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না না, ভালো খবরই। আমার মেয়ে আসছে, ছেলে আসছে। রবিবারে তারা পৌছবে।"

সুরবালা যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওমা, তাই নাকি? ঘর এবার ভ'রে উঠবে।"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, ঘর ভরাই যেন এর পর থেকে থাকে। মেয়ের জন্যে ঘরটর সব ঠিক করতে হবে, তুমি সরকার মশায়কে একটু খবর দাও। আমি ততক্ষণ পুজোটা সেরে আসি।" কিন্তু পাষাণের ঠাকুর সেদিন আর তাঁহার মনকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহের পুত্তলীরাই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিল।

দোতলায় গোটা দুইতিন ঘর খালিই পড়িয়া ছিল। যাহার যাহা কিছু আবর্জনা, সব এখানে ঠাশা থাকিত। হঠাৎ তাহাদের কপাল ফিরিয়া গেল। দেওয়ালে চুণকাম পড়িল, জানালা দরজায় রঙ পড়িল, সাহেববাড়ী হইতে বহুমূল্য আসবাব আসিয়া ঘরগুলির মূর্ত্তি একেবারেই পরিবর্ত্তিত করিয়া

ফেলিল। একটি শয়নকক্ষ, একটি বসিবার ঘর, একটি কাপড়-চোপড় পরিবার, এই তিনটি ঘর নবীনা অধিকারিণীর আগমন আশায় উৎসবসজ্জা করিয়া রহিল। ভানুমতী নিজে এখন সব বিলাসিতা ত্যাগ করিলেও, তাঁহার রুচি নষ্ট হয় নাই। ঘর সাজানো তিনি দাঁড়াইয়াই করাইলেন, আর কাহারও কাজ তাঁহার পছন্দ হইল না।

রবিবার সকালেই তাহারা আসিয়া পৌঁছিবে। বাড়ীর গেটে নহবৎ বসিয়া গেল, মঙ্গল-ঘট, দেবদারু-পত্রের সজ্জা, কিছুই বাকি থাকিল না। শোভাবতী সপরিবারে আসিলেন, ভানুমতীর পিসীশাশুড়ী-ঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন না, বিজনবালাই এখন ঘরের কর্ত্রী। সে ছোট জা, ছেলেপিলে সকলকে লইয়া আসিয়া জুটিল। দেওয়ানজীও আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ষ্টীমার ঘাটে ক'খানা মোটর আর কতজন লোক যাইবে তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কলিকাতা এমনই স্থান, যে এখানে গাড়ী-ঘোড়া, হাতী, লোক-লস্কর লইয়া একটা শোভাযাত্রা করিবেন, তাহারও উপায় নাই। জমিদারীতে গিয়া সে-সব করা যাইবে, এই ভাবিয়া কোনো রকমে তিনি মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

যাহার জন্য এত আয়োজন সে তখন জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া গঙ্গা-তীরের ধাবমান্ দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া ছিল। আসিয়া ত পড়িল, আর ঘণ্টা দুই-তিন মাত্র। তাহার পর কেমনভাবে তাহার জীবন চলিবে কে জানে?

সুবীর নিজের কেবিনে স্যুটকেসে তালা লাগানো, বিছানা বাঁধা, প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিল। সে-সব সারিয়া ফেলিয়া উপরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সব হয়ে গেছে নাকি? আর কেবিনে যেতে হবে না?"

কৃষ্ণা বলিল, "হয়েই গেছে সব। কেবল 'বয়'টাকে বকশিস দেওয়া বাকি।"

সুবীর বলিল, "সে-সব আমি ঠিক ক'রে দেব এখন। আপনাকে একটা ডেক্ চেয়ার এনে দিচ্ছি, এইখানেই বসুন।"

• সে চেয়ার লইয়া ফিরিয়া আসিল, কৃষ্ণাকে বসাইয়া খানিকক্ষণ তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "দেখুন, একটা কথা বলি, কিছু যদি মনে না করেন।"

কৃষ্ণা বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বলিল, "বলুন না, আমি আপনার কথায় কিছু মনে করব না। মনে করবার মতো কথা আপনি বল্‌বেনও না।"

সুবীর বলিল, "এ-রকম শাদা কাপড় প'রে নাম্‌বেন না। ওরা ওখানে খুব ঘটা ক'রেই আপনাকে রিসীভ করতে আসবে। এ রকম ক'রে গেলে সেটা বিশেষ মানাবে না।"

কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আচ্ছা, আমি পোষাক বদ্‌লে নিচ্ছি। যদিও রাণী সাজবার উপযুক্ত কিছু আমার ওয়ার্ড্‌রোবে নেই।"

সুবীর অতি কষ্টেই নিজের জিহ্বাকে সংযত করিয়া রাখিল। কৃষ্ণা কাপড় বদ্‌লাইতে নীচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সুবীরের চোখের দৃষ্টিই তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিল। কৃষ্ণাকে প্রথম সে যেদিন প্যাগোডাতে দেখিয়াছিল, সেদিনকার সেই নীল রেশমের পোষাকটি সে পরিয়া আসিয়াছিল। বলিতে আরম্ভ করিলে হয়ত মাত্রা রাখিতে পারিবে না বলিয়া সুবীর কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না। কেবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতার জাহাজঘাট আসিয়া পড়িল। সুবীর কৃষ্ণাকে বলিল, "ঐ যে বুড়ো ভদ্রলোক, ঠিক উপরতলার বারাণ্ডার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে, উনি দেওয়ানজী। তাঁর পাশে যে ছোক্‌রা, ওটি মাসীমার ছেলে সুশীল। বাকী লোকজন বাইরে আছে বোধহয়।"

কৃষ্ণার মুখটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। আজ এসব ঘটা করিবার কিই বা আবশ্যক ছিল? এই উৎসব-কোলাহল কি সুবীরের প্রাণে শেলের মতো বিঁধিবে না? কিন্তু ইহাতে আপত্তি সে কি-প্রকারে প্রকাশ করিবে? হয়ত এ-সব তাহার মায়ের আদেশেই হইতেছে।

জাহাজের সিঁড়ি পড়িবামাত্র, ডেকের যাত্রীরা মরিয়া হইয়া দৌড়িল। সুবীর বলিল, "মিনিট-পাঁচ ওয়েট করুন, তা না হ'লে কোন্ হিন্দুস্থানীর পোঁটলার তলায় চাপা পড়বেন, তার ঠিকানা নেই।"

ভিড়ের জমাট ভাব একটু কমিবার পর সুবীর কৃষ্ণাকে নামাইয়া দিল; বলিল, "আপনাকে নিজেই একটু কষ্ট ক'রে ঐ কাঠগড়াটি পার হয়ে যেতে হবে। আমি লগেজগুলোর ব্যবস্থা না ক'রে যেতে পারছি না।"

কৃষ্ণা ডিবার্কেশুনের কাগজ লইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাঠগড়া পার হইল। দেওয়ানজী নিজের লোকলস্কর লইয়া আসিয়া পড়িলেন; কৃষ্ণার সামনে আসিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, আপনি আমায় চিন্‌বেন না, আমি আপনাদের এষ্টেটে কাজ ক'রেই চুল পাকিয়েছি। খোকাবাবুর কাছে আমার কথা শুনে থাক্‌বেন।"

কৃষ্ণা তাঁহাকে প্রণাম করিতে অবনত হইতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। তাহার পর সুশীল আসিয়া লজ্জিত ভাবে তাহাকে একটা প্রণাম করিল, লোকজন সব তাহার চারিপাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে নমস্কার আর সেলামের চোটে কৃষ্ণা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

জাহাজের লোকজন সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, এ আবার কোথা হইতে কে আসিল? এত আসাসোটাধারী বরকন্দাজের আবির্ভাব ঘাটে সচরাচর হয় না।

সুশীল বলিল, "দেওয়ানজী, বেরিয়ে গিয়ে দিদিকে গাড়ীতে বসালে হ'ত না? কতক্ষণ এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?"

কৃষ্ণা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই ভিড়ের ভিতর চাপরাশ-আঁটা অনুচরে পরিবেষ্টিত হইয়া সঙের মতো দাঁড়াইয়া থাকিতে সত্যই তাহার কষ্ট হইতেছিল। সুবীরের তখনও দেখা নাই, কাজেই সে সকলের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড একখানা মোটরকার, আগাগোড়া ফুলের মালায় সজ্জিত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার দরজা খুলিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, "এইটাতে উঠুন আপনি।"

কৃষ্ণা গাড়ীতে বসিয়া জনস্রোতের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুবীরকে এখনও দেখা যায় না। এই এতগুলা লোকের মধ্যে সে-ই একমাত্র তাহার পরিচিত। এ যেন তাহার এক জীবনের মধ্যেই পুনর্জ্জন্মলাভ হইল। অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে? মনের ভিতরটা তাহার ক্রমেই যেন আঁধার হইয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ সুশীল বলিয়া উঠিল, "যাক, এতক্ষণ পরে দাদার দেখা পাওয়া গেল।" এবং মিনিট-দুইতিন পরেই একদল কুলির সঙ্গে সুবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণাকে বলিল, "একলা ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে উঠেছেন, না? আচ্ছা, আর দেরি হবে না। জ্যাঠামশায়, আপনি এঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, আমরা জিনিষপত্র নিয়ে পিছনে আছি।"

কৃষ্ণা হঠাৎ গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনি এই গাড়ীতে আসুন, জিনিষ ওঁরা আনবেন না-হয়।"

সুবীর গাড়ীর পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। কি সে তাহার মুখে দেখিল, সে-ই জানে। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় গভীর হইয়া উঠিল। নিজেকে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, জ্যাঠামশায়, আপনারা তা হ'লে জিনিষ-গুলো নিয়ে আসুন।" দরজা খুলিয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া কৃষ্ণার পাশে বসিয়া পড়িল। গাড়ীও তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল।

কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "সব অচেনা লোকের ভিড়ে আপনার ভালো লাগছে না, না?"

কৃষ্ণা বলিল, "চিরদিন আমি সবদিক্ দিয়ে এত একলা থেকেছি, যে, আমাকে নিয়ে এতগুলো লোক হৈ চৈ করছে মনে ক'রেই আমার অসোয়াস্তি লাগছে।"

সুবীর বলিল, "এখন কয়েকদিন এ উৎপাত সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। ক্রমে সয়ে যাবে। সকল অবস্থারই একটা ক'রে ডার্ক সাইড আছে ত? বড়মানুষ হ'লে খানিকটা পাব্লিসিটির জন্যে প্রস্তুতই থাকতে হয়।"

কৃষ্ণা বলিল, "এটা আমার পক্ষে একেবারে নূতন। লোকের চোখে পড়ার এক্সপীরিয়েন্স কখনও হয়নি।"

সুবীর বলিয়া ফেলিল, "এটা বোধহয় পুরোপুরি সত্যি কথা নয়। লোকের চোখে না প'ড়েই আপনি থাকতে পারেন না।"

কৃষ্ণার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সুবীর কথাটা বলিয়া একটু বোধহয় অপ্রস্তুত হইয়াছিল, তাড়াতাড়ি কথা ফিরাইবার জন্য বলিল, "খুব ক্লান্ত আছেন, না? আজ এরা যদি দয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করতে দেয় ত ভালো। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের কাণ্ড ত? সারাদিনই হয়ত হৈ চৈ করবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনি এ-সব করতে বারণ করলেন না কেন? আমার ভালো লাগছে না।"

সুবীর বলিল, "আমি বারণ করবই বা কেন, আর বারণ করলে তারা শুনবেই বা কেন? শুভদিনে উৎসব করাই ত নিয়ম। আপনার ভালো লাগবে না, তা অবশ্য ওরা মনে করেনি।"

কৃষ্ণার মনের যে-কথাটা বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বলিবার কোনো উপায় নাই। আজ সুবীরের নির্ব্বাসনদণ্ড সম্পূর্ণ হইল; তাই এসব কৃষ্ণার কাছে বিষের মতো ঠেকিতেছে। কিন্তু একথা সুবীরকে যে সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছে না।

ঘাট হইতে বাড়ী পৌছিতে বেশী সময় লাগে না। হঠাৎ সুবীর বলিয়া উঠিল, "ঐ গেট দেখা যাচ্ছে।"

কৃষ্ণা চাহিয়া দেখিল। এখানেও সেই উৎসবসজ্জা।

নহবতের বাজনা বিপুল উৎসাহে বাজিয়া উঠিল। শুভ শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। গাড়ী গেটের ভিতর ঢুকিয়া গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বধীর উল্টাদিকের দরজা খুলিয়া টপ করিয়া নামিয়া গেল। সিঁড়ির উপর কৃষ্ণার আত্মীয়ের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া। কাহাকেও কৃষ্ণা চেনে না, স্নেহের বন্ধনে কাহারও হৃদয়ের সহিত তাহার হৃদয় বাঁধা নাই। তাহার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। জমকালো পোষাকপরা দারোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। এখন না নামিলেই নয়। অগত্যা রুমাল এবং হ্যাণ্ডব্যাগ পাশ হইতে তুলিয়া লইয়া কৃষ্ণা নামিয়া পড়িল।

মর্ম্মর দেবীমূর্ত্তির মত কে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল? এই কি তাহার মা? এত সুন্দর? ইহার চক্ষে স্নেহের স্নিগ্ধতা ভিন্ন আর কিছু নাই। স্ববীরের নির্ব্বাসনের জন্য মা তাহা হইলে কৃষ্ণাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

কৃষ্ণা অবনত হইয়া ভানুমতীকে প্রণাম করিতেই, তিনি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া মেয়ের চুলের উপর পড়িতে লাগিল।

শোভাবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওমা, ওমা, আজকের দিনে কি করিস? চোখের জল ফেলিসনে, মেয়ের অকল্যাণ হবে।"

ভানুমতী মেয়েকে ঘরের ভিতর লইয়া আসিয়া বলিলেন, "মা, এই তিনটা ঘর তোমার জন্যে ঠিক ক'রে রেখেছি। অনেকটা পথ আসতে খুব ক্লান্ত আছ। কাপড়চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধোও, আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি।"

সাধারণতঃ মা মেয়ের সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলে না। কিন্তু কৃষ্ণাকে নিজের মেয়ে বলিয়া অনুভব করিতে পুরোপুরি ভাবে এখনও ভানুমতীর বাধিতেছিল। ইহার শিশুকালের কোনো স্মৃতি তাঁহার নাই, বাল্য এবং কৈশোরের ভিতর দিয়া দিনের পর দিন অক্লান্ত যত্নে স্নেহে তিনি ইহাকে মানুষ করিয়া তোলেন নাই। একেবারে পরিপূর্ণ যৌবনে সে হঠাৎ তাঁহার বাহু-বন্ধনের মধ্যে আসিয়া ধরা দিল। ইহার শিক্ষাদীক্ষা ভিন্ন, ইহার ধর্ম্ম ভিন্ন, এ চিরকাল অন্য মানুষকে নিজের আত্মীয় বলিয়া জানিয়া

আসিয়াছে। নিজের মায়ের প্রতি তাহার ভালোবাসা কোনো দিনই কি ধাবিত হইবে? ইহার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া ভানুমতীর চিত্ত স্নেহে বিগলিত হইতেছে বটে, কিন্তু নিজের সন্তানের প্রতি যতখানি মমতা মনে থাকা উচিত ততটা কি তিনি অনুভব করিতেছেন? অর্দ্ধেকের বেশী হৃদয় কি তাঁহার সুবীরকে হারানোর জন্য হাহাকার করিতেছে না?

সুবীরের কাছে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণাকে হঠাৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও তিনি পারিতেছিলেন না। সে তাহা হইলে মনে করিবে কি? তাহার মন কি একেবারে বিমুখ হইয়া যাইবে না? একে ত ভাগ্যের চক্রান্তে সে এতদিন নিজের জন্মাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কাটাইয়াছে। এখনও যদি মায়ের অখণ্ড মনোযোগ সে না পায়, তাহা হইলে মাকে সে অপরাধিনী ত করিবেই, সুবীরের প্রতিও প্রসন্ন থাকিবে না। সুবীরকে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যতখানি সুখ-সুবিধা করিয়া দিতে ভানুমতী সংকল্প করিতেছেন, কৃষ্ণা বাধা দিলে সবটা করিয়া তোলা বড়ই কঠিন হইবে।

সুতরাং মনের ব্যাকুলতা মনেই চাপিয়া তিনি কৃষ্ণাকে যথাযোগ্য আদর-যত্নে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে ঘরে বসাইয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, দিদিমণির জলটল সব ঠিক ক'রে দে। ওর বাক্স-তোরঙ্গ সব এই দিকে নিয়ে আস্‌তে বল্‌। আমি একটু আসছি, চায়ের জোগাড় করতে ব'লে।"

ভানুমতী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। নার্স সুরবালাকে সামনে দেখিয়া বলিলেন, "যাও ত বাছা, নীচে চায়ের সব জোগাড় ক'রে উপরে পাঠিয়ে দিতে বল।"

সুবীরের ঘরগুলি সিঁড়ির এক পাশে—অন্য পাশে মেয়েদের মহল। ভানুমতী সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সুবীরের বসিবার ঘরের দরজাটা ভেজানো। ভিতর হইতে খিল বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইল না;

তিনি কপাটের উপর মৃদু করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ভিতরে আসব, বাবা ?"

ভিতর হইতে সুবীর বলিল, "এস, মা।"

কৃষ্ণাকে মোটরে করিয়া বাড়ীর সদর দরজার সামনে পৌঁছাইয়া দিয়াই সুবীর পলায়ন করিয়াছিল। চারিদিকের উৎসবসজ্জা তাহার চোখে যেন সুচ ফুটাইতেছে, নহবতের বাজনা তাহার কানে পিশাচের অট্টহাসির মতো লাগিতেছিল। আজ তাহার চিরদিনের মতো নির্বাসন, আর আজই তাহার চিরদিনের ঘরে এত আনন্দের আয়োজন? শুধু ধনরত্ন হারাইলেও এতটা দারুণ নিরাশা আর অবসাদ তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে আজ কৃষ্ণাকেও হারাইতে বসিয়াছে। কৃষ্ণাই তাহার তরুণ মনের প্রথমা প্রেয়সী, ইহারই পায়ে হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করিয়া সে ঢালিয়া দিয়াছিল। সামান্য একটু মুখের হাসি, দুইটা সাধারণ কথা, এইমাত্র এখন পর্য্যন্ত কৃষ্ণার নিকট হইতে পাইয়াছে। কিন্তু ভালোবাসা দেয় যতখানি প্রতিদানে ততখানিই না পাইলে তাহার শান্তি কোথায়? কিন্তু হতভাগ্য সুবীরের নিকট স্বর্গপুরীর দ্বার রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। ইহার পর কৃষ্ণাকে একটুখানি চোখের দেখা দেখিবার অধিকারও তাহার থাকিবে না। তাই আজ দুর্ভাগ্যের পাষাণভার তাহাকে যেন পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিতেছিল। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হত-চেতনের মতো সে পড়িয়া ছিল। উঠিয়া জাহাজের কাপড়-চোপড় ছাড়িবে সেটুকু ক্ষমতাও যেন তাহার ছিল না। ভানুমতীর ডাকে সে তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। কোনোক্রমে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এস, মা।"

ভানুমতী ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা আমার, এমন ক'রে ব'সে আছিস কেন? আমার কাছে যেতেও তোর অভিমান? আমি কি আর তোর মা নেই?"

সুবীর কোনো উত্তর দিল না। তাহার হৃদয়ের আগুন এই স্নেহের বারি-সিঞ্চনে একটু যেন জুড়াইয়া গেল। মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া সে বালকের মতো পড়িয়া রহিল, তাহার চোখের জলে ভানুমতীর অঞ্চল ভিজিয়া উঠিল।

মিনিট-কয়েক এই অবস্থায় থাকিয়া পরে মাথা তুলিয়া সুবীর বলিল, "মা, এইবার তবে আমায় ছেড়ে দাও। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এরপর সংসারে নিজের জায়গা আমায় ক'রে নিতে হবে ত?"

ভানুমতী তাহার চুলের ভিতর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "না বাবা, তোকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না এমন ক'রে। আমি মনে মনে সব ঠিক ক'রে রেখেছি, তোর কোনও অসুবিধা হবে না। সব ব্যবস্থা আমি পাকাপাকি ক'রে দিই, তারপর তোর যেতে ইচ্ছে হয় যাস্। পেটের ছেলে হ'লেও চিরকাল কোলে বসিয়ে রাখতে পারতাম না। সব মাকেই এ দুঃখ সইতে হয়, আমিও সইব, তা ব'লে এইরকম ভিখিরীর মতো চ'লে যেতে তোকে আমি কিছুতেই দেব না। তা যদি যাস্, আমিও তোর পেছন পেছন যাব। আমায় লুকিয়ে যদি যাস্, তোর মাতৃহত্যার পাতক হবে।"

সুবীর বলিল, "মা, এ বাড়ী যার এখন, সে না বললে আমি কি ক'রে থাক্‌ব? আমি ভিখিরী ছাড়া আর কিছুই নয় এখন, তবু তোমার ছেলে সেজে এতদিন বেড়িয়েছি, আর কিছু না শিখতে পেরে থাকি, আত্মসম্মানটা বাঁচিয়ে চল্‌তে শিখেছি।"

ভানুমতী বলিলেন, "কৃষ্ণা কখনও অমত করবে না। তার জন্যে সব ছাড়লি তুই, নিজের হাতে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে তুই বনে যাচ্ছিস, আর সে তোকে দু'দশদিন বাড়ীতে থাকতে দিতে পারবে না? যদি আমার মেয়ে সে সত্যি হয় তাহলে এরকম কিছুতেই করতে পারবে না।"

সুবীর কিছু বলিবার আগেই, বাহির হইতে সুরবালা ডাকিয়া বলিল, "মা, দিদিমণির চা, জল-খাবার, সব উপরে নিয়ে এসেছে, কোন্ ঘরে রাখবে?"

সুবীর বলিল, "মা যাও, ওকে দেখ গিয়ে। নূতন জায়গায় এসে ওর এমনিই বোধ হয় ভালো লাগছে না, তুমিও দূরে স'রে স'রে থাকলে ওর মন ভেঙে যাবে। বাড়ীতে লোক-সমাগম আজ নিতান্ত কম হয়নি, সকলের আদর-অভ্যর্থনা কর গিয়ে। না পার ত মাসীমাকে প্রতিনিধি ক'রে এস, তিনিই ওসব তোমার চেয়ে ভালো পারবেন। তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে না ব'লে পালাব না।"

ভানুমতী একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শোভাবতীর বাড়ীর সকলে এবং অন্যান্য আত্মীয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এতক্ষণ ভানুমতীর শোবার ঘর জুড়িয়া সভা জাঁকাইয়া বসিয়া ছিলেন। কৃষ্ণাকে ঠিক নিজেদের দলের বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই। সুতরাং ভানুমতী যখন তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া চলিলেন, তখন সকলে পিছন পিছন উপরে আসিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণার ঘরে না ঢুকিয়া ভানুমতীর ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল।

ভানুমতীকে দরজার সামনে দিয়া যাইতে দেখিয়া শোভাবতী ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ভানু, কোথায় ঘুরছিস্, মেয়েকে জল-টল খাইয়েছিস ?"

ভানুমতী বলিলেন, "এই যে যাচ্ছি, মেজদি! তুমিও এস না ?"

শোভাবতী উঠিয়া পড়িলেন। বৌঝির দল একটু ইতস্ততঃ করিয়া যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিয়া গেল। সুরবালা ও দুইজন দাসী তাহাদের পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেল।

কৃষ্ণাকে ঘরে বসাইয়া ভানুমতী বাহির হইয়া যাইতেই সে উঠিয়া পড়িল। তাহাকে যে-ঘরে আনা হইয়াছিল, সেটা বসিবার ঘর। বেশী বড় নয়, কিন্তু সুসজ্জিত। আস্‌বাবপত্র, দেয়ালের গায়ের ছবি, সবই বহুমূল্য, কিন্তু কিছু সাবেকী ফ্যাশানের। তবু কৃষ্ণা মনে মনে ভানুমতীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পাশেই তাহার শয়নকক্ষ।

একটি নূতন কালো কাঠের পালঙ্কের উপর উপর ধবধবে বিছানা পাতা, সম্প্রতি কাশ্মীরী-কাজ-করা চাদরে ঢাকা রহিয়াছে। জানালার কাছে বড়

একটি ঈজিচেয়ার। মেজেতে দামী কার্পেট পাতা। জয়পুরের পিতলের টেবিল একটি, তাহার উপর ফুলদানীতে এক-গোছা রজনীগন্ধা ফুল। ছোট একটি মেহগনী কাঠের লিখিবার টেবিল ও তাহার সামনে একটি চেয়ার। ঘরে আর কিছু আস্‌বাব নাই। তাহার কাপড় ছাড়িবার ঘরটি ছোট, কিন্তু ইহার ভিতরেই জিনিষ বেশী। বড় একটি আয়না-ওয়ালা আল্‌মারী, দেরাজ সুদ্ধ ড্রেসিং টেবিল, আল্‌না, ময়লা কাপড়ের বাসকেট, মুখ ধুইবার গামলার ষ্ট্যাণ্ড, বড় দুইতিনখানি চেয়ারে ঘরটি বেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। এ-ঘরে আসবাবগুলি নূতন বলিয়া বোধ হইল না। খুব সম্ভব এগুলি ভানুমতীর সম্পত্তি, নিজে ব্যবহার করেন না বলিয়া কৃষ্ণার ঘর সাজাইতে দান করিয়া দিয়াছেন।

তাহার কাছে যে দাসীটিকে ভানুমতী রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, আপনার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, সব এইখানেই কি নিয়ে আস্‌ব ?"

কৃষ্ণা জাহাজের পোষাক ছাড়িয়া স্নান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, "এইখানেই নিয়ে এস।"

দুইজন চাকর আসিয়া তাহার ট্রাঙ্ক্, সুটকেস, বিছানা, সব এই ঘরটাতে রাখিয়া গেল। কৃষ্ণা জুতা-মোজা খুলিয়া ফেলিয়া সুট্‌কেস হইতে প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় বাহির করিতে লাগিল। ঝিটি সব কিছু তাহার হাত হইতে লইয়া গুছাইয়া আল্‌নার উপর রাখিতে লাগিল।

একটু একলা থাকিবার অবসর পাইয়া কৃষ্ণা যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। কয়দিন সে একেবারে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই। জাহাজ হইতে নামিবার পর গোলমালে, লোকের ভিড়ে এবং নিজের নূতন অবস্থায় তাহার একেবারে মাথা ঘুরিতেছিল। এতকাল পরে নিজের মাকে পাইয়া আবার সেইসঙ্গেই সুবীরকে হারাইবার সম্ভাবনায় তাহার চিত্তের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য একেবারে হারাইয়া গিয়াছিল। একটা ঘণ্টা সে কি করিয়া যে কাটাইয়াছে তাহা নিজেও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

• কাপড়-চোপড়, চিরুণী, সাবান, প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিয়া সে ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্নানের ঘর কোথায় বল্‌তে পার? একেবারে স্নান ক'রেই কাপড় ছাড়ব।"

দাসী কিছু বলিবার আগেই ভানুমতী এবং শোভাবতী ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণার কথার উত্তরে শোভাবতী বলিলেন, "ওমা, এখনই চান করবে? আগে একটু চা-টা খেয়ে নাও, সেই সকাল থেকে ত পিত্তি চুঁইয়ে ব'সে আছ।"

তড়িতের মায়ের সঙ্গে এই মহিলার স্বভাবের সাদৃশ্যের কথা সুধীর তাহাকে আগেই বলিয়াছিল, মনে করিয়া কৃষ্ণার হাসি পাইল। সে বলিল, "একেবারে স্নান ক'রে খাব ভাবছিলাম, বড় মাথা ধ'রে উঠেছে।"

ভানুমতী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তা ত ধরতেই পারে। কম পথ ত নয়? আচ্ছা মা, স্নান ক'রেই নাও। কয়েকটা দিন আমার স্নানের ঘর দিয়েই চালাতে হবে, উপরে আর ত নেই? তারপর তোমার ঘর হয়ে যাবে। দেওয়ানজীকে আমি কালই ব'লে রেখেছি,—দুতিন দিনের মধ্যেই মিস্ত্রী লেগে যাবে।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "কেন মা, আপনার ঘরে আমার কি অসুবিধা? আবার আর-একটা ঘরের কিছু দরকার নেই।"

কৃষ্ণার মা সম্বোধনে ভানুমতীর বুকের ভিতর কে যেন সুধার প্রলেপ দিয়া গেল। এই ডাক শুনিবার আকাঙ্ক্ষা কি নারীর মনে কখনও মেটে না? এতদিন ত তাঁহার শূন্য যায় নাই। মা ডাক ত তিনি প্রাণ ভরিয়াই শুনিয়াছেন, তবু কি বাসনা অতৃপ্ত ছিল? না এ নিজের সন্তান বলিয়া এত মিষ্ট লাগিতেছে?

দাসীর সঙ্গে কৃষ্ণা স্নানের ঘরে চলিয়া গেল। শোভাবতী বোনকে বলিলেন, "দিব্যি পদ্মিনীর মতো মেয়ে তোর। ঐ বয়সে তুইও খুবই সুন্দর ছিলি। ভবানী গর্ব্ব করত যে, সাহেবের বাড়ী খুঁজলেও এমন রং মিলবে না

তা মেয়েও তোর রং পেয়েছে। চেহারাও অবিকল তোর মতো, জ্ঞানদার সঙ্গে বিশেষ কিছু সাদৃশ্য নেই। তার মতো ঢ্যাঙা হয়েছে বটে।"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, কোলে ক'রে খুসী হবার মতো মেয়ে বটে। তবে এইসঙ্গে আর-একটিকেও যদি রাখতে পারতাম, তা'হলে এই কপাল নিয়েও মরবার আগের ক'টা দিন সুখে কাটিয়ে যেতাম। কিন্তু কি যে অদৃষ্টে আছে তা ত জানি না।"

এমন সময় চাকর ডাকিয়া বলিল, "মা, চা ত জুড়িয়ে যাচ্ছে। আবার ক'রে আনব কি ?"

শোভাবতী বলিলেন, "চল্, বস্‌বার ঘরটাতেই যাই। এখানটায় গরম বড়। চাকরকে ব'লে দে গরম জল চড়িয়ে রাখতে। মেয়ে বেরোবে, তারপর চা করা যাবে এখন।"

বসিবার ঘরে আসিয়া, পাখা চালাইয়া দিয়া শোভাবতী সোফার উপর বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, খোকার কি ব্যবস্থা করলি ? সে কি চ'লে যেতে চাইছে ?"

ভানুমতী বলিলেন, "তাই ত বলে। কিন্তু মেজদি, ওকে আমি এমন ক'রে ভাসিয়ে দিতে পারব না। আমার স্ত্রীধন যা-কিছু আছে, সব মিলিয়ে অনেক টাকা হবে। সব ওকেই দেব ভাবছি, তারপর যেমন খুসি থাকতে পারবে। কাজ করতে চায় করবে, না করতে চায় করবে না। এখানে একটা বাড়ী দিতে পারলে ভালো হ'ত, কিন্তু কলকাতায় বাড়ী করার খরচ জানো ত ? অবিশ্যি গহনাই আমার হাজার-পঞ্চাশের আছে, তা বিক্রী করলে বাড়ী বেশ ক'রে দিতে পারি। কিন্তু মেয়ে আবার তাতে কিছু মনে না করে। পাওনা হাজার হ'লেও তারই ত ? কিছু রেখে কিছুটা দেব ভাবছি।"

শোভাবতী বলিলেন, "তা ত ঠিক না। না, সব গহনা বেহাত করিস না। অমন চমৎকার জিনিষগুলো নিজে আর ক'টা দিনই বা পরতে পেলি ? তোর মেয়ের গায়ে দিব্যি মানাবে। দে'খে তবু তোর চোখ

জুড়োবে। বিক্রী করলে কোন্ ভূতনী না পেতনীর অঙ্গে উঠবে কে জানে? টাকা যা জমানো আছে তাতেই খোকা খুসী হবে। ওর ত যা সন্ন্যাসীর মতি-গতি!"

ভানুমতী বলিলেন, "খোকা কি কিছু চায় মনে করেছ মেজদি? তেমন ছেলে আমার নয়। ও ত এখনই এক-কাপড়ে বেরিয়ে যেতে রাজী। নিতান্ত মাথার দিব্যি দিয়ে আমি ধ'রে রেখেছি। কৃষ্ণা না বললে ও এবাড়ীতে সুদ্ধ থাকতে রাজী নয়। কত কষ্টে তাকে রেখেছি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ভানুমতী থামিয়া গেলেন। শোভাবতী তাড়াতড়ি রেকাবী টানিয়া খাবার সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, "এস মা, এস। বড় দেরি হয়ে গেল। ওরে, ও মনা, না ধনা, কি তোর নাম ছাই মনে থাকে না। চায়ের জল দিয়ে যা-না?"

মা মাসীতে মিলিয়া কৃষ্ণাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেলেন। মাথা ধরার অজুহাত দিয়া সে কোনোপ্রকারে তুইচারিটা ফল ও মিষ্টান্ন ও এক-পেয়ালা চা খাইয়া উঠিয়া পড়িল। শোভাবতী বলিলেন, "এই হয়ে গেল খাওয়া? ওমা, আজকালকার সবাই একরকম। আচ্ছা, চল এখন ওঘরে একটু। তোমায় দেখবার জন্যে কত লোক ব'সে আছে।"

কৃষ্ণার এভাবে নিজেকে দেখাইয়া বেড়াইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, তবু উপায় যখন নাই, তখন হাসি-মুখেই মা এবং মাসীমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া মেয়ে-মজলিসে প্রবেশ করিল।

৩৪

ভোরবেলা হঠাৎ কৃষ্ণার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া একটু বিস্মিত ভাবে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; পরক্ষণেই কোথায় সে আছে, কেন সে এখানে আসিয়াছে, সব কথাই তাহার মনে পড়িয়া গেল। আবার চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্ক তাহাকে

সামনে একটা বেঞ্চিতে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে ঝি কৃষ্ণাকে বাগানে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিল সে তাহার খোঁজে আসিতেছে দেখা গেল। কিন্তু সুবীরকে কৃষ্ণার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

খানিকক্ষণ পরে কৃষ্ণা বলিল, "আপনার দিক্‌টা না বুঝছি তা নয়। কিন্তু মায়ের দিক্‌টাও দেখতে হবে। আপনি যদি এরকম ক'রে সব সম্পর্ক কাটিয়ে চ'লে যেতে চান, তা হ'লে তিনি বাঁচবেন না। তিনি আপনার জন্যে যে-রকম ব্যবস্থা করতে চাইছেন, তাতে আপনি আপত্তি করবেন না। এবাড়ীতে না থেকেও, কলকাতায় আপনি থাকলে তিনি শান্তিতে থাকবেন।"

সুবীরের পক্ষে অবস্থাটা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। কৃষ্ণাকে যদি সে সব কথা অকপটে বলিতে পারিত! কি করিয়া সে ইহাকে বুঝাইবে তাহার প্রধান বাধা কোথায়? কিসের প্রলোভন, কোন্ বিপুল আকর্ষণ হইতে পলায়ন করিতে সে চাহিতেছে, তাহা কৃষ্ণাকে বলিবার উপায় কোথায়?

অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "কলকাতা থেকে চ'লে যেতে চাইছি নানা কারণে। আর মা আমায় যা দিতে চাইছেন তা নেবার অধিকার আমার নেই, তাঁরও দেবার অধিকার ঠিক আছে কিনা জানি না।"

কৃষ্ণা বলিল, "মায়ের নিজের জিনিষ দেবার অধিকার যথেষ্টই আছে। আপনি যদি মনে করেন যে, তিনি আপনাকে কিছু দিলে আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হব, তাহ'লে আপনি ভুল করবেন। আপনি যদি দয়া ক'রে নেন তাহ'লে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ থাকব তা বলতে পারি না। আপনি এরকম ভাবে চ'লে গেলে আমার নিজেকে ক্ষমা করা শক্ত হবে। ভাগ্য-চক্রে প'ড়ে আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার অপকার করতে হয়েছে, যতটা প্রতিকার এর মানুষের হাতে আছে, তা অন্ততঃ করতে দিন। কল্‌কাতায় কেন থাক্‌তে চাইছেন না, জানি না অবশ্য। কোনো উপায়ে সে বাধাটাকে অতিক্রম করা যায় না?"

সুবীর এমনভাবে কৃষ্ণার দিকে চাহিল যে, তাহার চোখ আপনা হইতেই নত হইয়া গেল। তবে কি সুবীরের মন হইতেই পূর্ব্বের সেই অনুরাগ এখনও দূর হয় নাই? এতবড় অপকার যে তাহার করিল, সুবীর কি সেই অপরাধিনীকে হৃদয় হইতে এখনও নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই?

সুবীর আসিয়া কৃষ্ণার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "তাহলে কতগুলো অসম্ভব কথা শোন্‌বার জন্যে প্রস্তুত হন। এগুলো কোনোদিন মুখে বলব তা মনে করিনি, কিন্তু আপনি আজ আমায় বলতে বাধ্যই কর্‌ছেন। শুনে বিরক্ত হবেন না, এইটুকু আমার প্রার্থনা। ব'লে আমার আর কোনো লাভ নেই, বলতে পেলাম এইটুকুই লাভ। আর্থিক কোনো লাভের প্রত্যাশায় একথা আমি বলছি না, এইটুকু সুবিচার আপনি আমার সম্বন্ধে করবেন তা জানি। আমি আপনাকে ভালোবাসি। বিশ্বাস করবেন না হয়ত, কারণ আপনার সঙ্গে আলাপ আমার অতি অল্পদিনের। শুধু চোখে দেখে ভালোবাসা যায়, এটা আগে আমিও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস না করবার উপায় নেই। রেঙ্গুনে শোয়ে ডাগন প্যাগোডায় বেড়াতে গিয়ে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম। সেদিন থেকে নিজের জীবনের সার্থকতা আমি খুঁজে পেয়েছি। ভবিষ্যতে আমার জন্যে কি আছে জানি না। কিন্তু জন্মেছিলাম ব'লে আমি কখনও দুঃখ করব না।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চোখ তারার মতো দীপ্ত, মুখের উপরও যেন জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবু চ'লে যেতে চাইছেন?"

সুবীর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "এরই জন্যে আমায় চ'লে যেতে হবে, তা কি আপনি বুঝছেন না? আমি মানুষ মাত্র।"

কৃষ্ণা বলিল, "যা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা কি আর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? আমার কি আপনাকে থাকতে বলবার অধিকার নেই?"

সুবীর কৃষ্ণার পায়ের কাছে শানের উপর বসিয়া পড়িল। সজোরে তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমায় ভালোবাসো তুমি? এটা হতভাগ্যের প্রতি করুণা, না আর-কিছু?"

কৃষ্ণার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল, বলিল, "করুণা ক'রে নিজেকেই দিয়ে ফেলব এতখানি করুণাময়ী আমি নই।"

সুবীর তাহাকে টানিয়া নিজের অতি নিকটে আনিয়া ফেলিল। মিনিটকয়েক বন্দিনী থাকিয়া শেষে কৃষ্ণা বলিল, "ছেড়ে দিন। কেউ হঠাৎ এসে পড়বে।"

সুবীর বলিল, "এলই বা? তোমাকে ছাড়তে আমার ভরসা হচ্ছে না। এটা হয়ত সত্য নয়, স্বপ্ন, এখনি জেগে উঠে দেখব, আমি যেমন একলা ছিলাম তাই আছি। তুমি ধ্রুবতারার মতো আমার জীবনাকাশের গায়ে ফুটে আছ, কিন্তু হাত দিয়ে তোমার নাগাল পাবার আমার কোনোই সাধ্য নেই।"

কৃষ্ণা বলিল, "স্বপ্ন এত সুন্দর হয় না।"

সুবীর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে একবার আসবে? তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।"

কৃষ্ণা বলিল, "চলুন। উপহার ত এখন আমার পাওনাই আছে।"

সুবীর তাহাকে ঘুরাইয়া সামনের সিঁড়ি দিয়া উপরে লইয়া গেল। সিঁড়ির মাথায় আসিয়া বলিল, "এইদিকে আমার আড্ডা। ভিতরে তোমার একটি সতীন আছে, দেখবে চল।"

কৃষ্ণা বলিল, "তাই নাকি? সজীব নয় আশা করি।"

সুবীর তাহাকে ঘরের ভিতর আনিয়া বলিল, "দেখলেই বুঝবে।" আলমারী খুলিয়া সে একখানি তৈলচিত্র বাহির করিল। তাহার ব্রাউন কাগজের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া বলিল, "দেখ। এখন ঠিক করতে পারছি না, কোন্‌টি বেশী সুন্দরী।"

বিস্ময়ে কৃষ্ণার মুখে কথা সরিতেছিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? কোথায় পেলেন? কে এঁকেছে এটা?"

সুবীর বলিল, "বুকের মধ্যে ছিল, তাই কাগজের গায়ে কোনোরকমে এঁকে রেখেছিলাম। তারই সাহায্যে একজন আর্টিস্ট এঁকেছে।"

আর-একটা দেরাজ খুলিয়া একতাড়া চিঠি বাহির করিল। বলিল, "এই আমার উপহার। এতদিন ঠিকানা জানলেও পাঠাবার অধিকার ছিল না। আর কোনো উপহার দেবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি ভিখারী ছাড়া আর কিছু নই, তা জানো। কাজেই তোমার সম্পত্তি থেকে তোমায় উপহার দিতে চাই না।"

কৃষ্ণা তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "ওসব কথা আর এক-বারও শুনতে চাই না, কিন্তু মাকে এখন সব কথা বলতে হবে।"

সুবীর বলিল; "বেশ, চল, একসঙ্গে গিয়ে বলছি।"

কৃষ্ণা তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "না না, আমি তাঁর সাম্‌নে আপনার সঙ্গে যেতে পার্‌ব না।"

সুবীর বলিল, "তাহ'লে তাঁকেই এখানে নিয়ে আসি।" কৃষ্ণা বাধা দিবার আগেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভানুমতী তখন সবেমাত্র উঠিয়াছেন। সুবীরকে এমন আনন্দদীপ্ত মুখে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, এত সকালেই যে?"

সুবীর বলিল, "মা, তোমার বৌ দেখবে চল।"

ভানুমতী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আমার বৌ? কে রে সে? যাকে কোলে পেয়েছি, তাকেই ত দেখাবি?"

সুবীর বলিল "হ্যাঁ মা; তাকে বৌ বলবে, না আমাকে জামাই বলবে, ঠিক ক'রে নাও।"

কৃষ্ণা সুবীরের ঘর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পথের মধ্যেই ভানুমতী তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া পথের মাঝখানেই

তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মা, তোকে পেয়ে আমি সব পেলাম। তোরই জন্যে আমি একে এতদিন বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। মা, তোর অনেক সৌভাগ্য, তাই এমন স্বামী পেলি। আমার কথা যে সত্যি তা প্রতিদিন তুই স্বীকার করবি। আমি ম'রেও এরপর শান্তি পাব। তোদের দুজনেরই জন্যে এর বাড়া সৌভাগ্য আমি আর কিছু চাইনি।"

বাড়ীর লোকজন সবাই অবাক্ হইয়া তাকাইতেছে দেখিয়া সুবীর বলিল, "মা, খবরটা সবাইকে জানিয়ে দাও, কি রকম সব হাঁ ক'রে আছে দেখছ না ?"

সারাদিনটা আবার বিষম গোলমালের ভিতর দিয়া কাটিল। সুবীরের অধৈর্য্যের সীমা ছিল না, তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, সব-ক'টা মানুষকে ঠেলিয়া সরাইয়া কৃষ্ণাকে আবার কাছে টানিয়া আনে। অথচ উপায় নাই। মা, মাসী, দিদি, বৌদি, ঝি, রাঁধুনী মিলিয়া কৃষ্ণার চারিদিকে এমনই এক ব্যূহ রচনা করিয়াছে যাহার ভিতর সুবীরের কোনোই প্রবেশ-পথ নাই।

অবশেষে বিকালবেলা আর নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে চাকরের হাতে একটুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "একবার এদিকে পথ ভুলে পাঁচ মিনিটের জন্যে চ'লে আস্তে পার না ?"

খানিক পরে কৃষ্ণা মুখ লাল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "কি চমৎকার শিভালরাস জেণ্টলম্যান! আমাকে কি ব'লে ডেকে পাঠালেন ? নিজে যেতে পারলেন না ?"

সুবীর বলিল, "যা তোমার চারিদিকে নারীবাহিনী, এগোতেই সাহস হয় না।"

কৃষ্ণা বলিল, "আহা, আমার বুঝি আর আসবার কোনো অসুবিধে নেই ? সবাই কিরকম হাঁ ক'রে দেখল, যদি দেখতেন।"

সুবীর বলিল, "আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করবার কোনো দরকার আছে কি ?"

খানিক পরে সুবীর বলিল, "দেখ, যেজন্যে তোমায় ডাকা তাই ভুলে যাচ্ছিলাম। নিজেকে সামলাতে না পেরে কাণ্ড ত বেশ একখানা করলাম। এরপর কি করা যাবে?"

কৃষ্ণা বলিল, "সেটা ত ভেবে ঠিক করা শক্ত নয়। মা ত এখনই নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ করছেন।"

সুবীর বলিল, "ঘরজামাই হয়ে থাক্‌তে আমি পারব না। আমার ইচ্ছে বিলেতে গিয়ে কিছুদিন পড়াশুনো করি, তারপর একটু মানুষের মতো হয়ে এলে তোমার পাশে দাঁড়াতে আমার লজ্জা এতটা করবে না।"

কৃষ্ণার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, আমারও অনেকদিন থেকে প্ল্যান ছিল বিলেত যাবার। আমিও তাহলে একবার ঘুরে আসব।"

সুবীর তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "সেই বেশ হবে।"

ভানুমতী শুনিয়া কিন্তু একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না বাছা, আমি বেঁচে থাকতে ওসব হবে না। যথেষ্ট খ্রীষ্টানী কারখানা হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। এখন ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি। তারপর আমি মরলে তোমরা বিলেত, আমেরিকা, যেদিকে খুসি যেও।"

সুবীর কৃষ্ণাকে বলিল, "মা এত আপত্তি করলে কি ক'রে যাওয়া যায়? তাঁর যা শরীর।"

কৃষ্ণা বলিল, "এখনকার মতো তাঁর কথাতেই চলতে হবে। তুমি মনে ক'রো না যে, তুমি আমার স্বামী মাত্র; তুমি যেমন জমিদার ছিলে, তাই আছ। তাহ'লেই সব আপদ্ চুকে যায়। মাঝের কয়েকটা দিন ভুলে গেলেই হবে।"

সুবীর বলিল, "তা, তুমি যদি বল, আমি বেশ ভুলে যেতে রাজী আছি।"

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA